

সময়ের সাক্ষী

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

জন্ম: মার্চ ১৯৭৪ (সরকারি হিসাব মতে) শিক্ষা: কামিল (হাদীস বিভাগ)।

পিতাঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, মাতা ঃ আনোয়ারা খাতুন।

পৈত্রিক নিবাসঃ গ্রাম : রারাই, ডাক : থানাবাজার-৩১৯০, উপজেলা : জকিগন্জ জেলা : সিলেট।

বর্তমান অবস্থান ঃ লন্ডন, ইউকে, পেশা: শিক্ষকতা (দারুল হাদীস লতিফিয়া, লন্ডন)।

বিভিন্ন সময়ে যে সকল জ্ঞান তাপসদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সনদ ও ইজাযত লাভ করেন তাঁরা হলেন- শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, স্বীয় পিতা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী, ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ (মক্কা শরীফ), শায়খ সায়্যিদ ইউসুফ বিন হাশিম রেফাঈ (কুয়েত), শায়খ সায়্যিদ আল হাবীব আসিম বিন আদী (মদীনা শরীফ), শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (পাকিস্তান), মুফতিয়ে আযম শায়খ মুহাম্মাদ রফি উসমানী (পাকিস্তান), শায়খ ড. সায়্যিদ আজ্জাজ আল খাতীব (সিরিয়া), শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মাদ সাঈদ সাগিরজী রাহিমাহুল্লাহ (সিরিয়া), শায়খ সায়্যিদ আল হাবীব সালিম শাতিরী (ইয়ামান), শায়খ ড. নাজী বিন রাশীদ আল আরাবী (বাহরাইন), শায়খ সামির আন নাস (সিরিয়া), শায়খ ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ।


সময়ের
সাক্ষী

সময়ের সাক্ষী

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

আল হাবীব ফাউন্ডেশন

সময়ের সাক্ষী

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯, সফর ১৪৪১

প্রকাশনায়
আল হাবীব ফাউন্ডেশন
ডাক : থানাবাজার-৩১৯০, উপজেলা : জকিগন্জ, জেলা : সিলেট।
ফোন : ০১৭১২ ১১৭১১৫, ০১৭১৫ ৫৭০৫০৪
www.alhabibfoundation.com

কপিরাইট : প্রকাশক

পরিবেশক
নুমানিয়া লাইব্রেরী, হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট। মোবাইল : ০১৭১৫ ০৯৫৪৯৪১
সাইমুন লাইব্রেরী, সুবহানীঘাট, সিলেট। মোবাইল : ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯
মুজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা, দোকান-১৭৯, ক্ষুদ্র মার্কেট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯২৯ ৪৮৫২৯৯

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com

প্রচ্ছদ : দিনার মিনহাজ

গ্রাফিক্স : আর্টিস্টিক, ০১৭১৭ ২৫৪২৫৪

মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ান, ঢাকা

মূল্য : ৩৩০.০০ টাকা

Shomoyer Shakki
Collections of selected articles in Bengali
by Muhammad Abdul Awal Helal
1st Edition October 2019
Published by Al Habib Foundation. Price £ 5.00
ISBN 978-984-34-7450-6

"তুমি যাই হও
আকাশ পাতাল
তুমি যে আমার ভাই
শুধুই হেলাল।"

কবি কালাম আজাদ
প্রেরণার বাতিঘর।

সূচি

প্রাক কথন / ৮

লেখকের পিতা উস্তাযুল উলামা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহু'র দোয়া / ৯

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, দৈনিক ইনকিলাব'র নির্বাহী সম্পাদক হযরত মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান হাফিযাহুল্লাহ'র অভিমত / ১০

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বহুগ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ হাফিযাহুল্লাহ'র অভিমত / ১১

ধর্মচিন্তা (১৩-৮৭)

বিতর্কের বেড়াজালে শবেবরাত / ১৫

মক্কা শরীফে শবেবরাত : ইবনু জুবায়ির'র বর্ণনা / ২৫

শবেবরাত নিয়ে আলোচনার তুফান দেখে একজন সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া / ২৭

তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা একটি পর্যালোচনা / ৩১

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবীহ : একজন মোল্লার মন্তব্য / ৩৭

প্রসঙ্গ সুবহানাযিল মুলকি ম্যান মেইড : একজন আলিমের দায় / ৪৪

মুহাররাম ভাবনা : রাফিযি প্রোপাগান্ডা / ৪৯

ইয়াযিদ কি নিন্দিত / ৫৫

ইয়াযিদ সম্পর্কে হাদীসে কী আছে / ৬২

বদর দিবস : ইয়াওমুল ফুরকান / ৬৯

কদমবুছি নিয়ে কিছু কথা / ৭৪

মীলাদুন্নবী বিষয়ে লিখিত কিতাবাদি / ৭৭

দূরে থেকো দূরে রেখো / ৮৪

মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ'র নসিহত আল্লাহ এবং রাসূল হতে চেয়ো না / ৮৬

সতর্কতা / ৮৭

জীবনালেখ্য (৮৯-১৯৪)

ইমাম মাতুরিদী রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর গ্রন্থাবলী / ৯১

সূফি কবি শিতালং শাহ রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর রচনাবলি / ৯৮

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর রচনাবলি / ১০৭

মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ / ১৪০
শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহ / ১৫৬
অনুস্মরণীয় এক আলিমে দ্বীন আল্লামা আবদুর রাহমান বর্ণী রাহিমাহুল্লাহ / ১৭০
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহিমাহুল্লাহ / ১৭৫
একুশের চেতনা ও একজন মতিন উদ্দীন আহমদ / ১৭৯
জকিগনজের অহংকার এম. এ. হক / ১৮৮
শিক্ষা দরদী কাজী আবদুল খালিক / ১৯৪

মতামত (১৯৭-২০৫)

আহলে হাদীস প্রসঙ্গ / ১৯৯
মুক্তবাক / ২০২
প্রতিক্রিয়া / ২০৪

স্মৃতিচারণ (২০৭-২৭২)

স্মৃতি অম্লান - মুহাদ্দিসুল হিজায সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ'র খিদমতে এক সন্ধ্যা / ২০৯
হাবীব জিলানী হাফিযহুল্লাহ'র দারসে বুখারী / ২১১
আব্বার সান্নিধ্যে শায়খ ড. নাজী / ২১৪
প্রিন্সিপাল হাবীবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ কিছু স্মৃতি, কিছু শ্রুতি / ২১৭
কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া : একটি ব্যতিক্রমী ভ্রমন বৃত্তান্ত / ২২১
জীবন থেকে নেয়া / ২৩৪
স্মৃতি রোমন্থন : জকিগঞ্জে কবি আল মাহমুদ / ২৩৬
জকিগনজ মনীষা প্রকাশ অভিজ্ঞতা ও কৈফিয়ত / ২৪৪
প্রসঙ্গ জকিগনজ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য- গ্রন্থ পুণঃপ্রকাশ হোক / ২৫০
আফসোস তিনিও কবি হতে চান / ২৫১
ও বজলু ভাই! না বলেই চলে গেলে তুমি / ২৫৩
ছুঁয়ে গেলো মনটা আমার / ২৫৫
দেশ থেকে ফিরে / ২৫৭
ভাঙছে আমার গ্রাম / ২৭০

প্রাক কথন

সময়ের সাক্ষী একটি অপ্রত্যাশিত গ্রন্থ। অপ্রত্যাশিত এ কারণে যে, এই লেখাসমুহ গ্রন্থবদ্ধ করবো এরকম চিন্তা ভাবনাও ছিলো না। ২০১৭ সালে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব দেশের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ, দৈনিক ইনকিলাব'র নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান হাফিযাহুল্লাহ লন্ডন সফরকালীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমুহ ব্যবহারের সুফল-কুফল ইত্যাদি নিয়ে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার ফাঁকে ফেইসবুকে বিভিন্ন সময়ে পোস্টকৃত কিছু লেখা তাঁকে দেখাই। তিনি লেখাসমুহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পরামর্শ দেন। ২০১৮ সালে আব্বা লন্ডন সফরে এলে কিছু লেখা পড়ে শোনাই। তিনিও নির্দেশ দেন যেনো এই লেখাসমুহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি। মূলত: আব্বা এবং খান সাব হুজুরের হুকুম পালন করার নিমিত্তে এই উদ্যোগ। সময়ের প্রেক্ষাপটে ফেইসবুকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রায়ই লেখা পোস্ট করি।এ দৃষ্টিকোণ থেকেই নামকরণ করা হয়েছে সময়ের সাক্ষী। ফেইসবুকে বন্ধু তালিকায় যারা আছেন লক্ষ করে থাকবেন, সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রায়ই কিছু লেখা পোস্ট করি। কিন্তু এ গ্রন্থে রাজনীতি বিষয়ক কোন লেখা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। লেখাগুলো সংরক্ষিত আছে, ভবিষ্যতে কেবল রাজনীতি বিষয়ক লেখা পৃথকভাবে মলাটবদ্ধ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন সময়ের লেখা এ গ্রন্থে একত্রিত করা হয়েছে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে একই কথার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যেতে পারে। লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পুনরাবৃত্তি এড়ানো সম্ভব হয়নি।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবি অধিকাংশ নিজ ক্যামেরায় ধারণ করা। তবে কিছু ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছে প্রিয় নাজিম উদ্দিন, এজেএম শিহাব ও আহমদ হোসাইন আইমান, জুবায়ের আহমদ, মাওলানা শহীদ আহমদ ও মাওলানা ইমাদ উদ্দীন। সবার ঋণ স্বীকার করছি।

ফেইসবুকে পোস্টকৃত লেখায় বিভিন্ন সময়ে কমেন্ট করে যারা উৎসাহিত করেছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। ক্ষণস্থায়ী জীবনের আগামী সময়টুকু ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে যেন ব্যয় করতে পারি এ দোয়া প্রার্থী।

শ্রদ্ধেয় পাঠক! কোন ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি গোচরিভূত হলে আমাদের অবগত করতে অনুরোধ রইলো।

ওয়াসসালাম

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল
helal69@ymail.com

লেখকের পিতা, উস্তাযুল উলামা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহু'র দোয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগ চলছে এখন। তাই মুসলিম তরুণদের উচিত প্রযুক্তি নির্ভর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও সর্বজনিন শিক্ষা প্রচারে সাধ্যমত চেষ্টা অব্যাহত রাখা। ২০১৮ সালে লন্ডন সফরকালীন সময়ে আমার বড় ছেলে মো. আবদুল আউয়াল হেলাল ফেইসবুকে প্রচারিত তার কিছু লেখা পড়ে শুনায়। তখনই মনে হয়েছে নাতিদীর্ঘ এই লেখাসমূহ ফেইসবুকের পাশাপাশি বই আকারে প্রচার হওয়া দরকার। সে অনুযায়ী তাকে এসব লেখা একত্রিত করে বই প্রকাশের নির্দেশনা দিই। এবার লন্ডন অবস্থানকালীন ফেইসবুকে প্রচারিত লেখাসমূহ থেকে বাছাইকৃত কিছু লেখা গ্রন্থবদ্ধ করে আমাকে দেখালো। এর মধ্যে অধিকাংশ লেখা আমি পড়িয়ে শুনেছি। আমার বিশ্বাস এই লেখাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সমাজের উপকারে আসবে।

দোয়া করি আল্লাহপাক যেনো আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সঠিক শিক্ষা প্রচার প্রসারের তাওফিক দেন। তাঁর হাবীবের উসিলায় এসব কবুল করেন।

(মো. হবিবুর রহমান)

২৮ আগস্ট ২০১৯
লন্ডন

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, দৈনিক ইনকিলাব'র নির্বাহী সম্পাদক হযরত মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান হাফিযাহুল্লাহ'র অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد

নামাজের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা প্রার্থনা জানাই–রাব্বুল আলামীন! 'আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন'। ইফরাত ও তাফরীত তথা চরম প্রান্তিকতামুক্ত যে পথ সে পথই সরল পথ–সিরাতুল মুস্তাকীম। নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ হলেন এই পথের দিশারী। এর বিপরীত হচ্ছে প্রান্তিক পথ ও মত। মধ্যপন্থা পরিহার করে প্রান্তিক পথ ও মত গ্রহণ করার কারণেই উদ্ভব ঘটেছে পথভ্রষ্ট বাতিল ফির্কাসমূহের। বক্ষমান গ্রন্থের প্রণেতা জনাব মো. আব্দুল আউয়াল হেলাল যথাযর্থই লিখেছেন, 'জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা'। এ শিক্ষা পরিহার করেই আজ মুসলিম যুবকরা বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে দেশে দেশে। এই বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তাদের সামনে নতুন করে সিরাতুল মুস্তাকীম তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন এই সময়ে। আশার কথা, বিদগ্ধ লেখককে সে সাধনাতেই মশগুল দেখতে পাচ্ছি।

ধর্মচিন্তা, জীবনালেখ্য, মতামত ও স্মৃতিচারণ এ চার অধ্যায়ের সমাহার- 'সময়ের সাক্ষী'। সাম্প্রতিক সময়ে ফেসবুকে পোস্টকৃত তাঁর কিছু লেখা পড়ে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছিলাম। তার আংশিক বাস্তবায়ন দেখে অত্যন্ত প্রীত হলাম। যদিও রাজনীতি বিষয়ক কোন লেখা এ গ্রন্থে স্থান পায়নি, তবে তা স্বতন্ত্র পুস্তক আকারে প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন গ্রন্থকার।

বক্তব্যের সমর্থনে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ ও বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করাই লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বক্ষমান গ্রন্থেও তার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ, তিনি লেখককে দীর্ঘায়ু দান করুন, আরও লেখার তাওফীক এনায়েত করুন ও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন! আমীন।

রুহুল আমীন খান
১৩ অক্টোবর ২০১৯
ঢাকা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বহুগ্রন্থ প্রণেতা
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ হাফিযাহুল্লাহ'র অভিমত

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।

বর্তমানে শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে যুক্ত। বেশির ভাগ মানুষই এগুলোকে নিছক সময় কাটানো অথবা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। এরপরও কেউ কেউ এটাকে সীমিত পরিসরে জ্ঞানচর্চা, দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসেবেও নিয়েছেন। বর্তমান যুগে এর উপযোগিতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল হেলাল একজন আধুনিক-মনস্ক তরুণ ইসলামি চিন্তাবিদ। লেখালেখিতে তাঁর ভালো হাত রয়েছে। ইতোমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি স্বীয় ফেইসবুক আইডিতেও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখালেখি করেন। সম্প্রতি তাঁর রচিত 'সময়ের সাক্ষী' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেছি। লেখক মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত লেখাগুলো এখানে জড়ো করেছেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী থেকে শুরু করে ধর্মীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা এখানে স্থান পেয়েছে। বইটির লেখাগুলো স্মৃতিচারণা আর ঘরোয়া আলাপের ভঙ্গিতে লেখা হলেও অনেক দুর্লভ তথ্যের সমাহার ঘটেছে। বিশেষত সায়্যিদ আলভি আল মালেকি র., মাওলানা আব্দুল জাব্বার গোটারগ্রামী র. প্রমুখের ব্যাপারে বাংলা ভাষায় আর কোনও লেখা আমার চোখে পড়েনি। আশা করি, এ লেখাগুলো ভবিষ্যতের গবেষকদের কাজে আসবে। কিছু কিছু লেখা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত হলেও বিষয়বস্তুর বিবেচনায় তা কৌতুহলী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে মনে করি।

অন্তর্জালের লেখাগুলো মলাটবদ্ধ হওয়ায় হারিয়ে যাওয়া থেকেও রক্ষা পেলো। এজন্য লেখককে সাধুবাদ জানাই।

আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।


ধর্মচিন্তা

বিতর্কের বেড়াজালে শবেবরাত

আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টিকুলের সব কিছুকে সমান মর্যাদা দেননি। মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। এরূপ আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি মাস, প্রতিটি দিন মর্যাদার দিক থেকে সমান নয়। মাসের মধ্যে রামাদান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান। আবার এই রামাদানের একটি রাত শবেকদর হলো হাজার মাসের চেয়েও বেশি উত্তম।

আল্লাহপাক তাঁর হাবীবের উম্মতের জন্য যত নিয়ামত রেখেছেন তন্মধ্যে রয়েছে বিশেষ মাস, বিশেষ দিন এবং বিশেষ কিছু সময়। যাতে অন্যান্য নবীর উম্মতের চেয়ে হায়াত কম পাওয়া সত্বেও এই বিশেষ সময়কে মর্যাদার সাথে কাজে লাগিয়ে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে বেশি উপকার লাভ করতে পারে।

চন্দ্র বছরের শা'বান হচ্ছে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মাস। উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ বহুসংখ্যক সাহাবি থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবীজি প্রায় পুরো শা'বান মাসই নফল রোযা রাখতেন। শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতের বিশেষ ফযিলতের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। আমাদের দেশীয় পরিভাষায় এ রাতকে শবেবরাত বলা হয়। যুগ যুগ ধরে উপমহাদেশের মুসলমানগণ বিভিন্ন নফল ইবাদাত বন্দেগির মাধ্যমে গুরুত্বের সাথে শবেবরাত পালন করে আসছেন। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে কিছু সংখ্যক আলিম বা শায়খ নামধারী ব্যক্তি ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বক্তৃতা বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে প্রচার করছেন যে, ইসলামে শবেবরাত বলে কোন কিছু নেই। এটা পারসিয়ান অগ্নি পুজারীদের কালচার থেকে আমদানী করা। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এসব বক্তব্য টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ সন্দিহান হয়ে পড়ছেন। চলমান নিবন্ধে শবেবরাতের প্রামাণ্যতা এবং ফযিলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

হাদীস শরীফে শবেবরাত প্রসঙ্গ

শবেবরাতের ফযিলত সম্পর্কে একুশটি হাদীস পাওয়া যায়। এসব

হাদীস সনদ বিচারে সমমর্যাদার নয়। কোনটি সহীহ, কোনটি হাসান এবং কোনটি দাঈফ রয়েছে। এমনকি শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ে কিছু মাউদু বা বানোয়াট হাদীসও কোন কোন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

এ পর্যায়ে আমরা শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ে বর্ণিত একটি মাত্র হাদীস উল্লেখ করে হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা করবো। হাদীসটি হলো-

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطّلع الله الى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا مشرك او مشاحن

অর্থাৎ মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, মধ্য শা'বানের রাতে (শবেবরাতের) আল্লাহ তা'লা তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের নজরে তাকান; এবং মুশরিক ও অপরের প্রতি হিংসা পোষণকারি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

এ হাদীসটি নিম্নোক্ত কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে-

১. ইমাম ইবনু হিব্বান-সহীহ ইবনু হিব্বান (অখণ্ড), পৃষ্ঠা ১৫১৪
২. ইমাম তাবারানী-আল মু'জামুল কাবীর ২০:১০৭
৩. ইমাম তাবারানী-আল মু'জামুল আওসাত ৭:৩৬
৪. ইমাম সুয়ূতি-আদদুররুল মানছূর ৫:৭৪১
৫. ইমাম দিমইয়াতি-আল মুত্তাজারুর রাবিহ, পৃষ্ঠা ১৮২
৬. ইমাম বাইহাকী -ফাদাঈলুল আওকাত, পৃষ্ঠা ৩০
৭. ইমাম মুনযিরী- আত তারগীব ওয়াত তারহীব (অখণ্ড), পৃষ্ঠা ২৪১
৮. ইমাম আবু আসীম- আসসুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৮০
৯. ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী- হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫:২৩৫
১০. ইমাম সায়্যিদ সালিম সানহুরী- ফাদাইলু লাইলাতিন নিসফি শাহরি শা'বান পৃষ্ঠা ৪
১১. ইমাম ইবনু আসাকির- তারীখু দিমাশক ৩৮:২৩৫

১২. ইমাম ইবনু রাজাব হাম্বালী - লাতায়িফুল মা'রিফ, পৃষ্ঠা ১৮৮

১৩. ইমাম ইবনু দুবাইছি- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান ওয়া ফাদলুহা, পৃষ্ঠা ৪৩

১৪. ইমাম হাইছামী- মাজমাউয যাওয়াইদ ৮:৬৫

১৫. ইমাম মোল্লা আলী কারী- আত তিবইয়ান, পৃষ্ঠা ১০

১৬. ইমাম আবদুল হক দেহলবী- মা সাবাতা বিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ২০

১৭. ইমাম সায়্যিদ যাকী ইবরাহীম- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃষ্ঠা ৭

১৮. ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাবী আল মাক্কী- ইতমিনানুল কুলূব, পৃষ্ঠা ৬১

১৯. শায়খ ড. আলী মুহাম্মাদ ইউসুফ আল মুহাম্মাদি- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান ফী দাউয়িস সুন্নাতিল মুশাররাফাহ, পৃষ্ঠা ২২১

২০. ইমাম সায়্যিদ আবদুল্লাহ সিদ্দীক গুমারী- হুসনুল বায়ান, পৃষ্ঠা ২১

২১. শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী- ফাদাইলু লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃষ্ঠা ৬

২২. শায়খ আবু উবায়দা মাশহুর বিন হাসান- হুসনুল বায়ান, পৃষ্ঠা ১৭

২৩. শয়খ জামাল বিন উমার মাক্কী- রিসালাতু লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃষ্ঠা ৮

২৪. শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী- সিলসিলাতুল আসাদীসিস সাহীহাহ ৩;১৩৫

২৫. শায়খ ড. সায়্যিদ মাহমুদ আসসাবিহ- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃষ্ঠা ৭২

সনদ পর্যালোচনা

ইমাম ইবনু হিব্বান (ওফাত ৩৫৭ হিজরী) নিজস্ব সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাইছামী (ওফাত ৮০৭ হিজরী) বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে ইমাম তাবারানী বলেছেন- তাঁরা সবাই সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য

ছিলেন।

{মাজমাউয যাওয়াইদ ৮:৬৫}

সালাফীদের কাছে ইলমে হাদীসের ইমাম হিসেবে বরিত শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী স্বীয় কিতাবে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করে সনদ সম্পর্কে বলেন-

حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضاً

হাদীসটি সহীহ। সাহাবিগণের একটি জামাত থেকে বিভিন্ন সনদসূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যার একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করেছে।

{সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৩:১৩৬}

এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা শেষে শায়খ আলবানী আরো বলেন-

وجملة القول ان الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب

সারকথা হলো বিভিন্ন সনদসূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

{সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৩:১৩৮}

শবেবরাত সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের অভিমত

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (ওফাত: ৬৮ হিজরী)

হিবরুল উম্মাহ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা শবেবরাত সম্পর্কে বলেন-

تقضي الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم الى أربابها ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان

শবেবরাতে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আর শবেকদরে তা দায়িত্বশীল ফিরিশতাগণকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

{তাফসীরে রূহুল মা'নী ২৫:১৩}

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (ওফাত:৭৩)

শবেবরাতের ফযিলত সম্পর্কে সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন-

خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتى العيدين

এমন পাঁচটি রাত রয়েছে যেগুলোতে দোয়া ফেরত দেয়া হয় না। রাতগুলো হলো- জুমুআর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত (শবেবরাত) এবং দুই ঈদের রাত।
{মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪:৩১৭}

শবেবরাত সম্পর্কে তাবিঈগণের অভিমত

আতা বিন ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ৯৭ হিজরী)

মদীনা শরীফের অধিবাসি বিশিষ্ট ফকীহ তাবিঈ আতা বিন ইয়াসার ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার আযাদকৃত দাস। তিনি সাতজন সাহাবির কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শবেবরাতের ফযিলত সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো-

ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم الا لمشرك او مشاحن او قاطع رحم

শবেকদরের পর শবেবরাতের চেয়ে বেশি ফযিলতপূর্ণ কোন রাত নেই। সে রাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'লা দুনিয়ার আকাশে আসেন। অত:পর মুশরিক, হিংসুক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যতিত তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।
{লাতায়িফুল মা'রিফ, পৃষ্ঠা ১৯১}

ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ১০৭ হিজরী)

দুইশতাধিক সাহাবির সাথে সাক্ষাতকারী তাবিঈ হযরত ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খাস ছাত্র। তিনি ১৮ জন সাহাবি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শবেবরাত সম্পর্কে তিনি বলেন-

في ليلة النصف من شعبان يبرم فيه امر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم احد ولا ينقص منهم اخد

শবেবরাতে সারা বছরের যাবতীয় কাজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। জীবিত ও মৃতের পৃথক পৃথক তালিকা করা হয়। (পরবর্তী বছর) যারা হজ্জ করবে তাদের তালিকাও হয়। এই সিদ্ধান্ত হেরফের হয় না।
{তাফসীরে তাবারী ১১:২২২}

উমার বিন আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ১০১ হিজরী)

খলিফা উমার বিন আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তাবিঈ। তিনি পাঁচজন সাহাবির কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংরক্ষণের প্রথম উদ্যোগ তিনিই গ্রহণ করেন। তাঁকে প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ গণ্য করা হয়।

খলিফা উমার বিন আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ বাসরায় নিযুক্ত গভর্ণর আদী বিন আরতাতকে এক পত্রে লিখে পাঠান -

عليك بأربع ليال في السنة فان الله يفرغ فيهن الرحمة، اول ليلة من رجب وليلة النصف شعبان وليلة الفطر وليلة النحر

বছরের চারটি রাতকে তুমি গুরুত্বের সাথে নেবে। এ রাতগুলোতে আল্লাহপাক অপার রাহমাত ঢেলে দেন। সে রাতগুলো হলো রজব মাসের প্রথম রাত, শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত।
{তালখীসুল হাবীর ২:১৬০}

ইমাম ইবনু রাজাব হাম্বালী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ৭৯৫ হিজরী) বলেন-

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادات

শামের অধিবাসী তাবিঈগণ যথা খালিদ বিন মা'দান, মাকহুল ও লুকমান বিন আমির প্রমূখ শবেবরাতকে খুবই তাযিম করতেন। এবং এ রাতে নফল ইবাদাতে মশগুল থাকতেন।
{লাতায়িফুল মা'রিফ, পৃষ্ঠা ১৯০}

শবেবরাতে সম্মিলিতভাবে মসজিদের অবস্থান বিদআত নয়

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ'র বিশিষ্ট উস্তাদ, যার অনুপ্রেরণায় তিনি সহীহ বুখারী শরীফ সংকলন করেন, সেই ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়িয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ২৩৮ হিজরী) শবেবরাতে সম্মিলিতভাবে মসজিদে অবস্থান করা সম্পর্কে বলেন-

في قيامهافي المساجد جماعة ليس ببدعة

শবেবরাতে জামাতবদ্ধ হয়ে মসজিদে অবস্থান করা বিদআত নয়।
{লাতায়িফুল মা'রিফ, পৃষ্ঠা ১৯০}

মাযহাবের ইমামগণের দৃষ্টিতে শবেবরাত

ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ২০৪ হিজরী) বলেন,

ان الدعاء يستجاب في خمس ليال، في ليلة الجمعة و ليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان

পাঁচ রাতে দোয়া কবুল হয়; জুমুআর রাত, ঈদুল আদহার রাত, ঈদুল ফিতর'র রাত; রাজাব মাসের প্রথম রাত এবং শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত বা শবেবরাত।
{কিতাবুল উম্ম ১:১৩১}

ইমাম মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ১০১৪হিজরী) বলেন,

ليلة النصف من شعبان وهي ليلة البراءة ولعل وجه تخصيصها لانها ليلة مباركة فيها يفرق كل امر حكيم

শা'বানের মধ্যবর্তী রাত, সে রাত হলো লাইলাতুল বারাত বা শবেবরাত। সে রাতকে হাদীসে খাস করা এ কারণে হতে পারে যে, সে রাতে সব প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
{মিরকাত শরহে মিশকাত ৩:৩৮৫}

ইমাম ইবনুল হাজ্জ মালিকী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ৭৩৭ হিজরী) বলেন,

ولا شك انها ليلة مباركة عظيمة القدر عند الله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم

নিঃসন্দেহে এটা (শবেবরাত) আল্লাহ তা'লার নিকট একটি বারাকাতপূর্ণ ও মর্যাদাবান রাত। এ রাতেই সব প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। {আল মুদখাল ১:২৯৯}

ইমাম ইবনু মুফলিহ হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত : ৮৮৪ হিজরী) বলেন,

وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن احمد وقد روى عن احمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديث

শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ে ইমাম আহমাদ'র অভিমত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আহমাদ ও আমাদের (হাম্বলীদের) একটি জামাত এবং অন্যান্য উলামা থেকে এ রাতের ফযিলত বিষয়ে হাদীসের কিতাবাদিতে অনেক কিছুই বর্ণিত রয়েছে।
{আল ফুরূ' ৩:৮৮}

শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ে চার মাযহাবের অনুসরণীয় কয়েকজন ইমামের অভিমত উপরে উল্লিখিত হলো। মূলত: চার মাযহাবের বিপুল সংখ্যক ইমাম, উলামার অভিমত উল্লেখ করা যায়। কিন্তু লেখার কলেবর চিন্তায় ক্ষান্ত দিতে হলো।

বর্তমান সময়ে যারা শবেবরাত সম্পর্কে অহেতুক বিতর্কের জন্ম দিয়ে মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে চলেছেন, যারা বলেন শবেবরাত বলে ইসলামে কোন কিছু নেই; এটি ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং পারসিয়ান অগ্নিপুঁজারিদের কালচার, তারা নিজেদের পরিচয় দেন সালাফী ও আহলে হাদীস বলে। এবার আমরা তাদের চরম মান্যবর দু'জন ব্যক্তির অভিমত উল্লেখ করতে চাই।

হাফিয ইবনু তাইমিয়্যা (৭২৮ হিজরী) বলেন,

ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والاثار ما يقتضي انها ليلة مفضلة وان السلف من كان يخصها بالصلاة

শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ে অনেক মারফু হাদীস এবং আছার

(সাহাবি- তাবিঈ'র অভিমত) বর্ণিত রয়েছে। এসব প্রমাণ করে যে, এটা একটি ফযিলতপূর্ণ রাত। সলফে সালিহীন এ রাতকে নফল নামাযের জন্য খাস করে রাখতেন।
{ইকতিদাউ সিরাতুম মুসতকীম, পৃষ্ঠা ৩০১}

শায়খ আবদুর রাহমান মুবারকপুরী (ওফাত: ১৩২০ হিজরী) ভারতীয় উপমহাদেশে মাযহাব বিরোধীদের সংগঠন জমিয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর লেখা দশখণ্ডে সমাপ্ত তিরমিযী শরীফের শরাহ সৌদিআরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বের সাথে পঠিত হয়। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ক হাদীসের শরাহ বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়খ মুবারকপুরী এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم انه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء

এই সামষ্টিক হাদীস তাদের জন্য হুজ্জত বা দলিল যারা মনে করেন শবেবরাতের ফযিলত প্রমানের জন্য কিছু নেই।
{তুহফাতুল আহওয়াযি শারহু জামিউত তিরমিযী ৩: ৩৬৭}

ইদানিংকালে দেখা যায় শবেবরাতের ফযিলত অস্বীকারকারীগণ বলতে শুরু করেছেন যে, শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস নেই। যা আছে সবই দাঈফ ও মাউদু। তাই এগুলোকে মানা যায় না। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীকে তো আপনারা হাদীসের সর্বোচ্চ ইমাম মনে করেন। যদিও শায়খ আলবানীর (ওফাত: ১৪২০ হিজরী) ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্ববিরোধিতার কারণে বহু অনাকাঙ্খিত ফিতনার জন্ম হয়েছে। সেই আলবানী সাহেবের সংকলিত এগারো খণ্ডে সমাপ্ত সহীহ হাদীসের কিতাব হলো **সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ**। সে কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১৩৫নং পৃষ্ঠা খুলে দেখুন। সেখানে জ্বলজ্বল করছে একটি শিরোনাম- **শবেবরাত বিষয়ে যা সহীহ (ما صح في ليلة النصف)**। এই শিরোনামের অধিনে শবেবরাতের ফযিলতের হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। (পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

পরিশেষে বলতে চাই, আসুন অহেতুক বিতর্কে না জড়িয়ে যথাযত মর্যাদায় শবেবরাত পালন করি। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে শবেবরাত কেন্দ্রীক বহু অনৈসলামিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- আতশবাজি, বাড়ি ঘর, মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদিতে অপ্রয়োজনীয় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন; আনন্দ ফুর্তি ও হৈ হুল্লোড় করা, এগুলো পরিহার করতে হবে। আরেকটা বিষয় লক্ষনীয় যে, আজ কাল দেখা যায় শবেবরাত এলেই শহর গ্রাম সর্বত্র প্রতিটি মসজিদে রাতব্যাপি মাইক বেজেই চলেছে। শবেবরাতের ফযিলতের বয়ান চলছে রাতভর। মনে রাখতে হবে যে, এ রাতটি মাইক বাজানোর রাত নয়। একাগ্রচিত্তে ইবাদত বন্দেগি করে ক্ষমা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকার রাত। রাতভর যদি ফযিলতের বয়ান চলতেই থাকে তবে সে ফযিলত লাভের জন্য মানুষ নফল বন্দেগি কখন করবে?

(শবেবরাত সম্পর্কে আরো বেশি জানতে এ অধমের লেখা *কুরআন হাদীসের আলোকে শবেবরাত* বইটি পড়ে দেখতে পারেন।)

মক্কা শরীফে শবেবরাত ইবনু জুবায়ির'র বর্ণনা

মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপ আমেরিকার দেশসমূহে গতকাল সোমবার দিনগত রাত ছিলো মধ্য শাবানের রাত বা ليلة النصف من شعبان বাংলাদেশসহ পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহে আজ মঙ্গলবার দিনগত রাত মধ্য শাবান। আমাদের দেশীয় পরিভাষায় এ রাত শবেবরাত নামে পরিচিত। স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে মহিমান্বিত এ রাতকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষ এমন কিছু কাজ করেন যা কোন ক্রমেই শরীয়ত সমর্থিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-আতশবাজি, ঘরবাড়ি, কবরস্থানে অহেতুক মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ইত্যাদি। কেবল শবেবরাত নয় শরীয়ত সমর্থন করে না এমন কাজ মুসলমানের জন্য সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

আজকের আলোচনা ভিন্ন। পাঠক নিশ্চয়ই শিরোনাম লক্ষ্য করেছেন, আজকের বিষয় মক্কা শরীফে শবেবরাত। যারা দাবি করেন ইসলামে শবেবরাত বলে কিছু নেই, তারা তাদের দাবির পক্ষে কিছু যুক্তি দাঁড় করান। তন্মধ্যে একটি হলো মক্কা মদীনার মানুষ শবেবরাত পালন করে না। এসব আরবে নেই। সাধারণ মুসলমান সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাই তো! ইসলামের উৎস ভূমি আরবে যা নেই তা আবার ইসলামি হয় কেমনে? হ্যাঁ, যারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে *আরব* এবং *সৌদি আরব*'র পার্থক্য বুঝেন তাদের কাছে এই যুক্তি ধোপে ঠেকে না। কিন্তু যারা বুঝেন না কিংবা বুঝেও না বুঝার ভান করেন তাদের কাছে এটি নিছক যুক্তি থাকেনা, হয়ে যায় অখণ্ডনীয় দলিল।

মূলত: নজদের সাউদ পরিবারের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী (১১১৫-১২০৬ হিজরি) কর্তৃক উগ্রবাদী বিশেষ মত প্রতিষ্ঠার আগে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো মক্কা মদীনার মানুষ ঘটা করে মধ্য শাবান'র রাত তথা লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করতো। আজকের লেখায় মক্কা শরীফে আনুষ্ঠানিক শবেবরাত পালন বিষয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর চাক্ষুষ বিবরণ উপস্থাপন করতে চাই। তিনি স্পেনের একজন খ্যাতিমান আলিম। তাঁর নাম আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জুবায়ির আল কান্নানী। *ইবনু জুবায়ির* নামেই তিনি অধিক খ্যাত। তাঁর জন্ম ৫৩৯ হিজরি,

ইন্তিকাল ৬১৪ হিজরিতে। তিনি তাঁর বাবা এবং স্পেনের তখনকার খ্যাতিমান উলামার তত্বাবধানে ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। জীবনীকারগণ তাঁর আলোচনায় বলেন-

كان من علماء الأندلس في الفقه والحديث، وكانت له مشاركة في الآداب

অর্থাৎ তিনি স্পেনে ফিকহ্ এবং হাদীস'র পরিজ্ঞাত উলামার মধ্যে গণ্য। সাহিত্য চর্চায়ও তাঁর অবদান ছিলো।

৫৭৮ হিজরি থেকে ৫৮১ হিজরি এই তিন বছর সময়কাল তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমন করেন। নিজ চোখে দেখা বিভিন্ন এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে সেই লিখিত বিবরণ *রিহলাহ ইবনু জুবায়ির* (رحلة ابن جبير) বা ইবনু জুবায়িরের সফরনামা নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে ইবনু জুবায়ির মধ্য শাবান তথা শবেবরাতে মক্কা শরীফে মানুষের আচরিত অনুষ্ঠানের বিবরণ তুলে ধরেছেন। ১১৯ পৃষ্ঠার শেষ দিক থেকে শুরু করে ১২১ পৃষ্ঠার শেষ পর্যন্ত এ বর্ণনা আছে। তিনি বলেন

فشهدنا ليلة السبت، التي هي ليلة النصف حقيقة ، احتفلا عظيما في الحرم المقدس

অর্থাৎ শনিবার রাত, প্রকৃতপক্ষে সে রাত ছিলো মধ্য শাবান'র রাত (শবেবরাত)। আমরা হারামে মুকাদ্দাসে বিশাল অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলাম।

(রিহলাহ ইবনু জুবায়ির পৃষ্ঠা ১১৯)

এরপর তিনি সে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন।

ওয়াহাবী-সালাফী মতাদর্শে প্রভাবিত নয় এমন আরবি মানুষ মাত্রেই এখনো নফল বন্দেগিতে মধ্য শাবান'র রাত কাটান। তবে নজদী রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা এবং নানাবিধ হয়রানির ভয়ে মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে আগের মতো অনুষ্ঠান হয় না।

যারা জেগে ঘুমায় তাদের চোখে আঙুল কেনো বট গাছ ঢুকিয়ে দিলেও দেখবে না। তবে যারা সরল মনে তাদের সাথে সুর মেলান তারা ভেবে দেখতে পারেন।

শবেবরাত নিয়ে আলোচনার তুফান দেখে একজন সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া

আমাদের দেশীয় পরিভাষায় শবেবরাত বলে পরিচিত বিষয়টি হাদীসের ভাষায় *লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান*। এই রাতের বিশেষ ফযিলত সম্পর্কে একুশটি হাদীস পাওয়া যায়। সাহাবি যুগের পরবর্তীকালের হাদীস বর্ণনাকারীগণের সবলতা দুর্বলতা বিচারে হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ হাদীসের যে শ্রেণি বিন্যাস করেছেন সে অনুযায়ী শবেবরাতের ফযিলত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো চার প্রকার। কিছু সহীহ, কিছু হাসান, কিছু দাঈফ এবং কিছু মাউদু। মাউদু হাদীস হলো বানোয়াট। অর্থাৎ মূলত: এটা রাসূলের হাদীস নয়। মাউদু হাদীস সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। বাকী তিন প্রকার হাদীস কোনটি কিভাবে কাজে লাগবে সেই উসূল বা মূলনীতি ইলমে হাদীসের সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইসলামের বিধি বিধানগুলোও শ্রেণি বিন্যাস করা আছে। কোনটি ফরজ, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত, কোনটি নফল, কোনটি মুসতাহাব এবং কোনটি মুবাহ। অন্যদিকে আছে হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি। শরীয়াতের দ্বিতিয় দলীল হলো হাদীস। যেহেতু হাদীস শ্রেণি বিন্যাস করা আছে তাই কোন প্রকারের বিধান কোন শ্রেণির হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমান করা হবে তাও স্থিরকৃত আছে। কোন কাজ হাদীস দ্বারা ফরজ, ওয়াজিব অথবা হারাম সাব্যস্থ করতে হলে অবশ্যই সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করতে হবে। এভাবে কোন মুসতাহাব কাজের দলীল হিসেবে দাঈফ হাদীসই যথেষ্ট।

এবার মূল কথায় আসি। শবেবরাতের ফযিলতের যত হাদীস আছে তন্মধ্যে মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সরল তরজমা হলো- শাবান'র মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের নজরে তাকান এবং মুশরিক ও অপরের প্রতি হিংসাপোষণকারি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

উল্লিখিত হাদীসটি আমার সংগ্রহে থাকা পঁচিশটি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনু হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪ হিজরী) হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন। ইমাম হাইছামী (ওফাত: ৮০৭ হিজরী) বলেন- ইমাম তাবারানী'র মতে এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত। (মাজমাউয যাওয়াঈদ ৮:৬৫)। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী (ওফাত: ১৪২০ হিজরী) সংকলিত সহীহ হাদীসের কিতাব *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহায়* (১১খণ্ডে সমাপ্ত) উল্লিখিত হাদীসটি সংকলন করে বলেছেন- হাদীসটির বর্ণনাসূত্রগুলো পর্যালোচনা দেখা গেছে এটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ৩:১৩৮)।

শবেবরাতের ফযিলতের হাদীসসমূহ যেসকল ইমাম নিজ নিজ হাদীসের কিতাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম তিরমিযী (ওফাত: ২৯৭ হিজরী), ইমাম ইবনু মাজাহ (ওফাত: ২৭৩ হিজরী), ইমাম ইবনু হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪ হিজরী), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (ওফাত: ২৪১ হিজরী), ইমাম মুনযিরী (ওফাত: ৬৫৬ হিজরী), ইমাম আবূ আসীম (ওফাত: ২৮৭ হিজরী), ইমাম তাবারানী (ওফাত: ৩৬০ হিজরী), ইমাম বাইহাকী (ওফাত: ৪৫৮ হিজরী) প্রমূখ হাদীসের বরেণ্য ইমামগণ।

সাহাবিগণের মধ্যে ইবনে আব্বাস (ওফাত: ৬৮ হিজরী), ইবনে উমর(ওফাত: ৭৩ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, তাবিঈগণের মধ্যে আতা বিন ইয়াসার(ওফাত: ৯৭ হিজরী), ইকরিমা (ওফাত: ১০৭ হিজরী), মাকহুল (ওফাত: ১১৮ হিজরী), খালিদ বিন মা'দান (ওফাত: ১০৪ হিজরী), লুকমান বিন আমির, উমর বিন আবদুল আযীয (ওফাত: ১০১ হিজরী) রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখ শবেবরাতের ফযিলত সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হাফিয ইবনু তাইমিয়্যা (ওফাত: ৭২৮ হিজরী) নিজ গ্রন্থে শবেবরাত প্রসঙ্গে বলেন- *হাদীস এবং সাহাবি তাবিঈগণের অভিমত পর্যালোচনা করে বলা যায়, এ রাতটি একটি ফযিলতপূর্ণ রাত।*

(ইকতিদাউস সিরাতুম মুসতাকীম, পৃষ্ঠা ৩০১)

সহীহ হাদীস এবং সাহাবি- তাবিঈগণের অভিমত দ্বারা যে রাতের মৌল ফযিলত প্রমাণিত, সেটিকে বিদআত বলে বাতিল করে দেবেন? লোকাল কালচার বা স্থানীয় সংস্কৃতি বলে হালকা করে দেবেন?

ইদানিং দেখা যায় শায়খ নামধারী কোন কোন ব্যক্তি বলতে শুরু করেছেন মধ্য শা'বানের রাত তথা শবেবরাতের ফযিলত আছে ঠিকই। তবে এ রাতে মসজিদে একত্রিত হয়ে ইবাদত বন্দেগি করা বিদআত।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়িয়া (ওফাত: ২৩৮ হিজরী), যার নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণায় তিনি সহীহ বুখারী শরীফ সংকলন করেছিলেন। সেই ইমাম ইবনু রাহওয়িয়া বলেছেন- *শবেবরাতে সম্মিলিতভাবে রাতব্যাপী মসজিদে অবস্থান করা বিদআত নয়*। (লাতায়িফুল মাআরিফ পৃষ্ঠা ১৯০)। মাশাআল্লাহ! ইমাম বুখারীর উস্তাদের চেয়েও আমরা সুন্নাত বিদআতের প্রার্থক্য বেশি বুঝতে শুরু করেছি!

যারা বলেন মক্কা মদীনার ইমামগণ শবেবরাত পালন করেন না। সৌদি আরবে শবেবরাত নেই। তাঁদের প্রতি যথাযত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলতে চাই, নবীজি অনাগত কালের উম্মতের প্রতি এই নির্দেশ দেননি যে, তোমরা মক্কা মদীনার ইমাম অথবা সৌদি আরবের অনুসরণ করবে। বরং বলেছেন- তোমরা কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করবে। এছাড়া আরব ভূমি ইবনে সৌদের দখল পূর্ব ইতিহাস অর্থাৎ আরব সৌদি আরব হবার আগের ইতিহাসে নজর দিন, শবেবরাতসহ অনেক কিছুই পাবেন যেগুলোকে আপনারা বিদআত ফতোওয়া দেন।

সৌদি আরবে বিয়ে শাদির অনুষ্ঠানে কিন্তু বর্তমানেও নিয়মিত উলুধ্বনি দেয়া হয়। নাচ গান চলে দেদারসে। মক্কা শরীফে রমযানের রাতে সেহরীর সময় জানান দেয়ার জন্য বিকট আওয়াজে কামান দাগানো হয়। এরকম বাস্তব ভিত্তিক উদাহরণ দিতে গেলে তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। সৌদি আরবের সবকিছুই যদি অনুসরণীয় হয় তবে এগুলো কেন অনুসরণ করেন না?

হ্যাঁ, উপমহাদেশে শবেবরাত কেন্দ্রীক কতিপয় অনৈসলামিক অনুষ্ঠান

আচরিত হয়ে আসছে। সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে জানানো, তাদেরকে সতর্ক করা অবশ্যই উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব। বারাকাতপূর্ণ এ রাত কেন্দ্রীক যত শরীয়ত গর্হিত কাজ হয় সেসব থেকে সাধারণ মানুষকে বিরত রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কিন্তু মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে নয়।

একজন মানুষের হাত বা পায়ের আঙুলে পচন রোগ হয়েছে। পচন রোধে কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আঙুল কেটে ফেলার পরামর্শ দিলে সেটি যৌক্তিক। কিন্তু রোগীর মাথা কেটে ফেলার পরামর্শ দিলে ধরে নিতে হবে ডাক্তারের মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। শবেবরাত কেন্দ্রীক কিছু শরীয়ত গর্হিত কাজ হয়, এই অজুহাতে কেউ যদি বলতে চায় শবেবরাত বলে ইসলামে কিছু নেই ; ধরে নিতে হবে তারও মস্তিষ্কে বিকৃতি দেখা দিয়েছে।

১২ মে ২০১৯

তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা
একটি পর্যালোচনা

মাহে রামাদান ঘনিয়ে এলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক নজরে পড়ে। দিন যতই এগুচ্ছে এই বিতর্কে নানা মাত্রা যোগ হচ্ছে। আহলে হাদীস নামধারী কিছু মাযহাব অমান্যকারী আলিম দাবি করেন, তারাবীহ নামায আট রাকাত। বিশ রাকাত মারাত্মক বিদআত। তাদের দাবি হলো আট রাকাত তারাবীহ'র দলীল বুখারী- মুসলিমে আছে। বিশ রাকাতের দলীল ভিত্তিহীন। সুতরাং সহীহ হাদীসের অনুসরণে বিশ রাকাত পরিত্যাগ করে আট রাকাত তারাবীহ পড়তে হবে। এইসব প্রচারণার ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে সন্দেহ সংশয় বাড়ছে, সৃষ্টি হচ্ছে নানামূখি ফিতনা।

আট রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে যে হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা হয় সেটি হলো-

عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عاءشة رضى الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره احدى عشر ركعة...متفق عليه

অর্থাৎ আবি সালামা বিন আব্দির রাহমান রাহিমাহুল্লাহ হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, রামাদানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র (রাতের) নামায কিরূপ ছিলো? জবাবে আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রামাদান এবং রামাদান ছাড়া (অন্য মাসে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারো রাকাত নামায আদায় করতেন। বুখারী-মুসলিম

তাদের দাবি মতে উল্লিখিত হাদীসে আট রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতর মোট এগারো রাকাতের কথা বলা হয়েছে।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, প্রশ্নকারীর জবাবে আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, রামাদান এবং রামাদান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এগারো রাকাত নামায আদায় করতেন। তাঁর এই কথা দ্বারা যদি আট রাকাত তারাবীহ প্রমাণ করা হয় তবে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, রামাদান ছাড়াও কি নবীজি তারাবীহ আদায় করতেন? যদি বলা হয়, না রামাদান ছাড়া অন্য মাসে রাতে আট রাকাত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন। আর রামাদানে আট রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন। (আট রাকাত তারাবীহ দাবিদারগণ এরকমই বলেন।) এ ক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। নবীজি কি তাহলে রামাদানে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তবে পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াজিব তরককারী প্রমাণ করা হয়ে যাচ্ছে। কেননা নবীজির জন্য রামাদান ও অন্য সময়ে তাহাজ্জুদ নামায আল কুরআনের ভাষ্য মতে ওয়াজিব ছিলো।

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা আট রাকাত তারাবীহ প্রমাণকারীগণ বিষয়টি আশা করি ভেবে দেখবেন।

বিশ রাকাত তারাবীহ'র আলোচনা শুরুর আগে একটি কথা বলে রাখা দরকার। আট রাকাত তারাবীহ'র দাবিদারগণ সাধারণ মানুষের সামনে একটি কথা তুলে ধরেণ, নবীজি আট রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। বিশ রাকাত তারাবীহ চালু করেছেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু। এবার আপনি সিদ্ধান্ত নিন কার অনুসরণ করবেন, রাসূলের নাকি উমারের। শক্ত লজিক। সত্যিই তো, রাসূল বাদ দিয়ে উমারের অনুসরণের কোন সুযোগ নেই। তাদের যুক্তির সামনে হার মেনে যারা ইতোমধ্যে আট রাকাত তারাবীহ শুরু করেছেন তারা কখনো ভেবে দেখেছেন, এই যুক্তির মধ্য দিয়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করার মতো ভয়ংকর খেলায় মেতেছেন সালাফী-আহলে হাদীস নামধারী শায়খরা। কখনো কি মনে আসে না যে, উমার যদি রাসূলের কোন সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে এমনিতেই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাচ্ছেন। চরমপন্থী শিয়াগণ বহু পূর্ব থেকে প্রথম তিন খলিফাকে মুরতাদ বলে আসছে। উমারকে রাসূলের প্রতিপক্ষে দাঁড় করিয়ে আপনারাও তো একই কাজ করছেন।

বিশ রাকাত তারাবীহ'র সূচনা

বুখারী-মুসলিমসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে, নবীজি রামাদনের কোন এক রাতে উপস্থিত সাহাবাগণকে নিয়ে মসজিদে তারাবীহ নামায করলেন। জানাজানি হয়ে গেলে পরের রাতে মুসল্লির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেলো। এভাবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে মসজিদে উপচে পড়া ভীড়। নবীজি মসজিদে এলেন না। অপেক্ষমান সাহাবা রাতের শেষ প্রহরে যে যার মতো নামায আদায় করে ঘরে ফিরলেন। পরদিন নবীজি বললেন, গতরাতে তোমাদের উৎসাহ আর একাগ্রতা আমি দেখেছি। কিন্তু এই আশংকায় বের হইনি যে, এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে হয়তো তোমাদের জন্য তারাবীহ ফরয করে দেয়া হতে পারে। যা তোমাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে যাবে।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যে দুই বা তিন রাত নবীজি সাহাবিগণকে নিয়ে জামাতে তারাবীহ নামায আদায় করেছেন এর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। যদিও কোন কোন কিতাবে রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা আছে, এর কোনটিই প্রমাণিত নয়।

হযরত আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের দুই রামাদান সাহাবিগণ মসজিদে নববীতে বিচ্ছিন্নভাবে যে যার মত করে তারাবীহ আদায় করেছেন।

১৩ হিজরির ২৩ জুমাদাল আখিরাহ হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪ হিজরির রামাদান মাসে তিনি হযরত উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইমাম মনোনীত করে একই জামাতে মসজিদে নববীতে তারাবীহ নামায শুরু করেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শুরু করা সেই নিয়মিত তারাবীহ'র জামাতে রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো-

عن يزيد بن خصيفة، عن الساءب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان بعشرين ركعة

الامام البيهقي- السنن الكبرى الجزء الثاني، صحفة 496، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان

অর্থাৎ ইয়াযিদ বিন খুসাইফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। সাইব বিন ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে সাহাবিগণ রামাদানে বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন।

-ইমাম বাইহাকী, আসসুনানুল কুবরা, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৯৬।

উপরোল্লিখিত বর্ণনাকে ইমাম নববী, ইমাম সুবকী, হাফিয ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল ইরাকী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম আলী কারী প্রমূখ সহীহ বলেছেন।

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলাবানী তারাবীহ নামায বিষয়ে লিখিত সালাতুত তারাবীহ নামক রিসালায় এই বর্ণনাকে দাঈফ বলেছেন। তবে সৌদিআরবের রাষ্ট্রীয় দারুল ইফতা'র অন্যতম গবেষক শায়খ ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল আনসারী শায়খ আলবানীর সেই অভিমত খণ্ডন করে কিতাব লিখেছেন। সে কিতাবের নাম *তাসহিহু হাদীসি সালাতিত তারাবীহ ইশরিনা রাকাআতান ওয়ার রাদ্দি আলাল আলবানী ফী তাদঈফিহী*। রিয়াদের মাকতাবা ইমাম শাফিঈ থেকে ১৯৮৮ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবে বিশ রাকাত তারাবীহ'র হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাসূত্র পর্যালোচনা করে প্রমাণ করা হয়েছে হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর সরাসরি ছাত্র ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিজরি) স্বীয় কিতাবে তারাবীহ নামাযের ফযিলত বিষয়ে হাদীস বর্ণনার পর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে নিজ পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

و اكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلي وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي. وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

الجامع الترمذي- الجزء الاول صحفة 223، كتاب الصوم باب ما جاء في قيام شهر رمضان

অধিকাংশ আহলে ইলম এ বিষয়ে একমত যে,হযরত উমার, হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবি থেকে তারাবীহ নামায বিশ রাকাত বলে বর্ণিত রয়েছে। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক ও ইমাম শাফিঈও এ মতই পোষণ করতেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, মক্কাবাসীকেও বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করতে দেখেছি।

- তিরমিযী শরীফ, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ২২৩। কিতাবুস সাওম, বাব মা জাআ ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান।

শ্রদ্ধেয় পাঠক! আপনাদের কী মনে হয়, হযরত উমার, হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবি ও উল্লিখিত ইমামগণের চেয়ে বর্তমান কথিত আহলে হাদীস, সালাফী শায়খগণ রাসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখেন?

এবার আসুন দেখা যাক তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সালাফী-আহলে হাদীস নামধারীদের মান্যবর শায়খগণ কী বলেন।

হাফিয ইবনু তাইমিয়্যা বলেন-

قد ثبت ان ابى بن كعب يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث، فرا ى كثير من العلماء ان ذالك هوالسنة، لانه اقامه بين المهاجرين والأنصار ، ولَم ينكره منكر

مجموعة الفتاوى الجزء 22 صحفة٦٨

নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, উবাই বিন কা'ব লোকদের নিয়ে রামাদানে বিশ রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত বিতর নামায আদায় করতেন। অধিকাংশ উলামার মতে এটিই সুন্নাহ। কেননা তিনি মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণকে নিয়েই বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন। অথচ তাঁরা কেউ কক্ষনো তা অপছন্দ করেননি।

-মাজমুআ ফাতাওয়া, খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা ৬৮।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী বলেন-

وصلاة التراويح سنة موءكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسب الى عمر لانه جمع الناس على ابي بن كعب. والمختار عند احمد عشرون ركعة وبه قال الشافعي،وقال مالك ستة وثلاثون.ولنا ان عمرلما جمع الناس على ابي بن كعب يصلي بهم عشرين ركعة،..... وما كان عليه الصحابة أولى

مختصر الانصاف والشرح الكبير ،صحفة157-

তারাবীহ নামায সুন্নাতে মুআককাদাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এটা সুন্নাত সাব্যস্ত কৃত। যদিও উমার'র প্রতি সম্মন্ধযুক্ত করা হয়। কেননা তিনি উবাই বিন কা'ব'র পেছনে লোকদের একত্রিত করেছিলেন। ইমাম আহমাদ'র নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো তারাবীহ বিশ রাকাত। ইমাম শাফিঈ'র অভিমতও তাই। ইমাম মালিক বলেছেন, ছত্রিশ রাকাত। আমার মতে উমার যখন উবাই বিন কা'ব'র পেছনে লোকদের একত্রিত করেন তাঁরা বিশ রাকাতই আদায় করেছেন।..... সুতরাং সাহাবিগণের মতই উত্তম মত।

-মুখতাসারুল ইনসাফ ওয়া শারহুল কাবীর, পৃষ্ঠা ১৫৭।

যারা সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নে সোচ্চার তাদের জন্য এ লেখা উপকারে আসবে না। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামান্যতম উপকার হলে রাত জাগা স্বার্থক হবে।

১৪ মে ২০১৮

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবীহ : একজন মোল্লার মন্তব্য

গতকাল ২১ এপ্রিল *মক্কা শরীফে শবেবরাত : ইবনু জুবায়ির'র সাক্ষ্য* শিরোননামে একটি লেখা পোস্ট করেছিলাম। কয়েকজন লেখাটি শেয়ার করেছেন। কমেন্ট করেছেন কয়েকজন। লেখাটিতে উদাহরণ হিসেবে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে রামাদান মাসে বিশ রাকাত তারাবীহ প্রসঙ্গ উল্লেখ ছিলো। সে লেখায় মোল্লা সোহেল মোশাররফ নামক একজন মন্তব্য করেছেন, মক্কা মদীনায় তারাবীহ ১৮ রাকাত পড়া হয়। বিচ্ছিন্ন এক মন্তব্য নিয়ে আলাদা লেখার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়ায় তারা মক্কা শরীফের মসজিদে হারাম এবং মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে আদায়কৃত বিশ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে মনগড়া ও হাস্যকর কিছু ব্যাখ্যা পেশ করেন। বর্তমান বাংলাদেশে কথিত আহলে হাদীস মতবাদের একজন প্রথমসারির শায়খ ও বক্তা আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এক বক্তব্যে বলেছেন, *তারাবীহ নামায আট রাকাত। মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবীহর বিদআত চালু হয়েছিলো হানাফী মাযহাবের অনুসারী উসমানী সালতানাতের সময়। আর মক্কা ও মদীনা এখনো তুরস্ক সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে, তাই সে বিদআত সেখানে এখনো চালু আছে*। অন্যত্র বলেছেন, *মক্কা ও মদীনার দু'টি মসজিদে দশ রাকাত তারাবীহ শেষ করে ইমাম চলে যান। অন্য ইমাম এসে আরো দশ রাকাত পড়ান। সেখানে বিশ রাকাত পড়া হয় না। পৃথক দুই জামাতে তারাবীহ হয়*। তার অন্ধ অনুসারীগণ কিন্তু এ প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেনা যে, এই ব্যাখ্যা সত্য বলে মেনে নিলেও তো সেখানে আট রাকাত তারাবীহ প্রমাণ হচ্ছে না, হচ্ছে দশ রাকাত। এছাড়া মক্কা মদীনা এখনো তুরস্ক নিয়ন্ত্রণ করছে, বাস্তবতা বিবর্জিত চরম গাঁজাখুরি এই বক্তব্য শোনার পরও অন্ধ অনুসারিদের চিন্তার কোন পরিবর্তন হয় না, বরং শায়খের সত্যায়নে নানা যুক্তি দাঁড় করাতে তৎপর হয়।

মোল্লা সোহেল মোশাররফ লোকটি কে, কী তার যোগ্যতা কিছুই জানি না। সুতরাং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। তবে ধারণা করছি হয়তো তিনি কোন কথিত শায়খের কাছ থেকে শুনেছেন মক্কা মদীনায় তারাবীহ ১৮ রাকাত হয়। একজন অচেনা মানুষের ফেইসবুক কমেন্ট বলে এর তেমন গুরুত্ব থাকার যৌক্তিকতা ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে আট রাকাত তারাবীহই সুন্নাত, বিশ রাকাত বিদআত বলে প্রতিনিয়ত প্রচারণার ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, এ নিয়ে বাদানুবাদের ফলে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়ে চলেছে; অদূর ভবিষ্যতে মক্কা মদীনায় ১৮ রাকাত তারাবীহ হয় বলে প্রচার চালিয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার খেলায় কেউ মত্ত হবে না এর কোন নিশ্চয়তা নেই।

মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে নিয়মিত বিশ রাকাত তারাবীহর সূচনাকাল সম্পর্কে হাদীসের কিতাবাদিতে যে বিবরণ আছে তা আপাতত: উহ্য রেখে আট রাকাত তারাবীহ'র দাবিদারদের পূর্বসুরি শায়খগণের গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করছি।

সায়্যিদিনা উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা মনোনীত হন ১৩ হিজরি মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তখন পর্যন্ত সাহাবা তাবিঈগণ নিজেদের ঘরে এবং মসজিদে নববীতে একা একা কিংবা ছোট ছোট কয়েক জামাতে তারাবীহ নামায আদায় করতেন। ১৪ হিজরি মোতাবেক ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইমাম মনোনীত করে একই জামাতে তারাবীহ আদায়ের প্রচলন করেন। এই বিবরণ সহীহ বুখারিতে আছে। সেসময় সাহাবি উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু তারাবীহ বিশ রাকাতই পড়িয়েছেন। আট রাকাতই সুন্নাত, বিশ রাকাত বিদআত দাবিদারদের ইমামগণ এ সম্পর্কে কী বলেছেন দেখুন।

হাফিয ইবনু তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিজরি) বলেন-

ثبت ان ابي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعةً في رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثيراً من العلماء ان ذٰلك هو السنة، لانه قام بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكرٌ

তরজমা : এটি প্রমাণিত যে, উবাই ইবন কা'ব রামাদানে লোকদের নিয়মিত বিশ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতর পড়াতেন। বেশিরভাগ উলামা এটাকেই সুন্নাত মনে করেন। কেননা তিনি মুহাজির আনসার সাহাবির উপস্থিতেই তা করেছেন, অথচ তাঁদের কেউ তা প্রত্যাখ্যান করেননি।

[মাজমুআ ফতোওয়া খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯১।]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১১১৫-১২০৬ হিজরি) বলেন-

و لنا ان عمر لما جمع الناس على ابي بن كعب يصلى بهم عشرين ركعةً

তরজমা : আমাদের মতে উমার যখন লোকদের উবাই ইবন কা'ব'র পেছনে একত্রিত করেছেন তখন তাঁরা বিশ রাকাত (তারাবীহ) পড়েছেন।

[মুখতাসারুল ইনসাফ ওয়া শারহুল কাবীর, পৃষ্ঠা ১৫৭।]

শায়খ সায়্যিদ সাবিক (১৩১৫-১৪২০ হিজরি) বলেন-

وصح ان الناس يصلون على عهد عمر وعثمان وعلى عشرين ركعةً

তরজমা : বিশুদ্ধ কথা হলো উমার, উসমান ও আলী'র খিলাফতকালে লোকেরা বিশ রাকাত (তারাবীহ) পড়তেন।

[ফিকহুসসুন্নাহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪২।]

শায়খ আতিয়া মুহাম্মাদ সালিম (১৩৪৬-১৪২০ হিজরি) বলেন-

ففي زمن علىّ رَضِىَ الله عنه كانت التراويح عشرين ركعةً...كما كانت في عهد عثمان رَضِىَ الله عنه وعهد عمر رَضِىَ الله عنه

তরজমা : আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তারাবীহ ছিলো বিশ রাকাত.... যেরূপ ছিলো উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে।

[আততারাবীহ আকছারা মিন আলফি আ'মিন ফী মসজিদিননববী আলাইহিস সালাম, পৃষ্ঠা ২৯।]

শায়খ আলী সাবুনী (১৯৩০-২০১৫ ঈসায়ি) বলেন-

وهي عشرون ركعةً من غير صلاة الوتر، ومع الوتر تصبح ثلاثاً وعشرين ركعةً، على ذٰلك مضت السنة واتفقت الامة سلفاً وخلفاً من عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه و أرضاه إلى زماننا هذا

তরজমা : বিতর ছাড়া তারাবীহ বিশ রাকাত, বিতরসহ তেইশ রাকাত। খলিফায়ে রাশিদ উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে। আর উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরাও এতে একমত পোষণ করেন।

[আল হাদয়্যুননববী আসসাহীহ ফী সালাতিত তারাবীহ, পৃষ্ঠা ৫২।]

আট রাকাত তারাবীহ'র দাবিদারদের কাছে শায়খুল ইসলাম, ইমাম, মুজাদ্দিদ ইত্যাদি উচ্চ মার্গের উপাধিতে ভুষিত হাফিয ইবনু তাইমিয়া এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদির গবেষণায় প্রমাণিত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল থেকে নিয়মিত একই ইমামের পেছনে মসজিদে নববী ও মসজিদে হারামে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া হয়ে আসছে। মদীনা শরীফের সাবেক বিচারপতি শায়খ আতিয়া মুহাম্মাদ সালিম'র গবেষণায় উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম'র খিলাফতকাল থেকে এই উম্মাহ বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করে আসছে। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন'র প্রথমসারির নেতা, মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির হাদীস বিভাগের দীর্ঘ দিনের শিক্ষক, সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার *কিং ফয়সাল এওয়ার্ড* প্রাপ্ত আলিম সায়্যিদ সাবিক'র গবেষণায় উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম'র খিলাফতকাল থেকে এই উম্মাহ বিশ রাকাত তারাবীহ পড়ে আসছে। দীর্ঘ বিশ বছরকাল ধরে উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির তাফসীর বিভাগের শিক্ষক সিরিয়ার শায়খ আলী সাবুনী'র গবেষণায় উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল থেকে বিশ রাকাত তারাবীহ চলে আসছে।

মক্কা শরীফে মসজিদে হারামে বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় সম্পর্কে

নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শায়খ আলী সাবুনী আরো বলেন-

لقد عشت في مكة المكرمة عشرين سنة ، وفي كل رمضان نصلي في المسجد الحرام عشرين ركعةً وراء الامام ثم نوتر مع الامام بثلاث، وكبار العلماء من نجد والحجاز وأقطار العالم الإسلامي يصلون كذلك، ولم ينكر احد ذٰلك ولم يعترض عليه

তরজমা : বিশ বছরকাল ধরে আমি মক্কা মুকাররামায় বাস করছি। প্রত্যেক রামাদানে মসজিদে হারামে আমরা ইমামের পেছনে বিশ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতর পড়ে আসছি। নজদ, হিজায এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড় বড় উলামা একইভাবে সেখানে তারাবীহ আদায় করছেন। কিন্তু কেউ তা অপছন্দ করেছেন কিংবা আপত্তি পেশ করেছেন বলে নজির নেই।

[আল হাদয়্যুন নববী আসসাহীহ ফী সালাতিত তারাবীহ, পৃষ্ঠা ৭৬।]

মক্কা ও মদীনা শরীফে বিশ রাকাত তারাবীহ আদায়ের প্রামাণ্য বিবরণ পেশ করার পর কোথাকার কোন মোল্লা সোহেল মোশাররফ'র কমেন্ট মক্কা মদীনায় ১৮ রাকাত তারাবীহ হয়, নিতান্তই মূল্যহীন। তবে ভবিষ্যতে এই মোল্লার পথ ধরে কেউ মক্কা মদীনায় ১৮ রাকাত তারাবীহ'র দাবি নিয়ে যদি সামনে আসে সে সময় লেখাটি কাজে আসবে।

উল্লেখ্য যে, কথিত আহলে হাদীস শায়খ আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ যে বললেন, হানাফী মাযহাবের অনুসারী উসমানী খলিফারা মক্কা মদীনার মসজিদ দু'টিতে বিশ রাকাত তারাবীহ'র বিদআত চালু করেছে, এটাও যে নেহায়েত গাঁজাখুরি বক্তব্য তাও প্রমাণিত।

অর্ঘুজ তুর্কি বংশোদভূত এরতুগ্রুল গাজীর পুত্র প্রথম উসমানের হাত ধরে ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে উসমানী সালতানাতের বীজ অঙ্কুরিত হলেও ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে উসমানী সালতানাত পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হিজায তথা মক্কা মদীনাসহ আরব অঞ্চল ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু পরে উসমানী সালতানাতভুক্ত হয়।

উসমানী সুলতানগণ হানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন ঠিকই।

তবে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের পর বিশ রাকাত তারাবীহ তাঁরা চালু করেননি। বরং এর ৮৮২ বছর পূর্বে ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৪ হিজরিতে খলিফা সায়্যিদিনা উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত বিশ রাকাত তারাবীহ একই ইমামের পেছনে আদায়ের প্রচলন করেন। পরবর্তী দুই খলিফা সায়্যিদিনা উসমান ও সায়্যিদিনা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুমা'র সময়কালে তা অব্যাহত থাকে। উমাইয়্যা খিলাফত, আব্বাসি খিলাফত, সেলজুক খিলাফত ও উসমানী খিলাফতকালেও এই ধারাবাহিকতা চালু থাকে। সে ধারা আজো অব্যাহত আছে।

নজদের আলে সৌদ'র বংশধর আবদুল আযিয ইবন আবদুর রাহমান আলে সৌদ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আরব দখল করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের নামকরণ করেন *সৌদি আরব*। নজদের মুহাম্মাদ ইবন সৌদ ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদি বৃটিশ গোয়েন্দাদের উসকে দেয়া আরব জাতীয়তাবাদে প্রলুব্ধ হয়ে উসমানী খিলাফত বিরোধি আন্দোলন শুরুর প্রাক্কালে একটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সম্মিলিত সেই আন্দোলনের পথ ধরে সৌদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও সেই চুক্তি বলবৎ থাকে।

চুক্তিবলে আলে শায়খ (বর্তমানেও সৌদি আরবে নামের সাথে আলে শায়েখ উপাধিযুক্ত সব আলিম ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নজদীর বংশধর।) তথা ইবন আবদুল ওয়াহহাবের বংশধর এবং তাদের অনুসারিরা ধর্মীয় সংস্কারের নামে দেশ ব্যাপী ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। তাদের পরিচালিত কথিত সংস্কার আন্দোলনের ফলে আরবের তখনকার মুসলমানদের জীবনাচারে বেদুঈন সংস্কৃতি থেকে আসা শরীয়ত বিরোধী বহু কাজ রহিত হয় ঠিকই, তবে সেই সাথে নিজেদের ব্যাখ্যা এবং ইজম বাস্তবায়নের নিমিত্তে শরীয়ত সমর্থিত বহু বিষয়কেও বল প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়া হয়। তখনকার আরবে চার মাযহাবের অনুসারী সুন্নি মুসলমানদের উপর নানা অজুহাতে নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানো হয়। রাজতন্ত্র এবং নিজেদের উগ্র প্রান্তিক মতবাদ ঠিকিয়ে রাখতে আহলে বাইতের বুযুর্গ এবং শীর্ষ স্থানীয় উলামাদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ

করে দিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাপকহারে হত্যাজজ্ঞ এবং জেল জুলুম চালানো হয়।

যেহেতু ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদি স্বয়ং বিশ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে), তাই তারা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবীহ'র ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেননি। তবে ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদির পরবর্তী অনুসারিগণের মধ্যে শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯ ঈসায়ি) গং আট রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে জোরালো মত পোষণ করেন। তাই দেখা যায় মক্কা শরীফের মসজিদে হারাম এবং মদীনা শরীফের মসজিদে নববী ছাড়া সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে অধিকাংশ মসজিদে আট রাকাত তারাবীহ পড়া হয়। ফলে আমাদের দেশের যে সকল শ্রমিক বা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে অবস্থান করেন তারা দেশে ফিরে কথিত আহলে হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে বলে বেড়ায় সৌদি আরবে তারাবীহ আট রাকাত। এতে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই প্রতারিত হন।

২২ এপ্রিল ২০১৯
লন্ডন।

প্রসঙ্গ সুবহানাযিল মুলকি ম্যান মেইড একজন আলিমের দায়

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিষয়টি নিয়ে লিখব না। কিন্তু পারলাম না। এই কয়দিনে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে পরিচিত, অপরিচিত বহু মানুষ একটি ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়ে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে লিখতে হলো। প্রথমেই একটি বিষয় খুলাসা করা দরকার, কোন ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে লেখাটি উৎসারিত নয়। তাই পাঠক বিবেচনায় রাখবেন বক্তব্য, বক্তা নয়।

বিষয়ের আদ্যোপান্ত

একটি টিভি'র লাইভ প্রোগ্রামে আলোচনা করছেন পূর্ব লন্ডনের নামকরা এক মসজিদের দুই নম্বর (দ্বিতীয়) ইমাম। এক ভদ্র মহিলা টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলেন, তারাবীহ নামাযে যে দুইটি দোয়া পড়া হয়, কোনটি কোন জায়গায় পড়তে হবে? হুজুর জানতে চাইলেন, আপনি কোন দুই দোয়ার কথা বলছেন? প্রশ্নকারি মহিলা বললেন, *সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি এবং আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার*। এবার হুজুর বললেন, তারাবীহ নামাযে প্রতি চার রাকাত পর পর ব্যাক হোম (আমাদের দেশে) এবং এখানেও কেউ কেউ পড়ে *সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি*। এগুলো ম্যান মেইড, *বেহেশতি জেওর ও মকসুদুল মুমিনীন* জাতিয় কিছু বই ছাড়া কোন কিতাবে এগুলো নেই। এসব পড়বেন না। সওয়াবের আশায় এসব পড়লে জাহান্নামে যাবেন। এরপর বিদআত বিষয়ক বিখ্যাত হাদীসটি শুনিয়ে দিলেন। তারাবীহ নামাযের শেষে সাধারণত: যে দোয়াটি পড়া হয় *আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযুবিকা মিনান নার*, বললেন- *এটির অর্থ খুবই সুন্দর। এটি পড়তে পারেন*।

ভাইরাল হওয়া উল্লিখিত বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি পয়েন্ট আউট করছি।

সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি তাসবীহ হলো-

* ম্যান মেইড বা মানুষের বানানো।

* বেহেশতি জেওর ও মকসুদুল মুমিনীন ছাড়া অন্য কোন কিতাবে এটা নেই।

* সওয়াবের আশায় এসব পড়লে জাহান্নামে যাবে।

এ তিন পয়েন্ট ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে আমরা দেখবো তারাবীহ নামাযের চার রাকাত পর পর উল্লিখিত তাসবীহ পড়ার নির্দেশনা কোন কিতাবে পাওয়া যায় কি না।

প্রথমত: *সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি...* এই তাসবীহ ম্যান মেইড বা মানুষের বানানো এ দাবি ভিত্তিহীন। বহুসংখ্যক কিতাবে উল্লিখিত তাসবীহ ফিরিশতাদের তাসবীহ বা *তাসবীহে মালাইকাহ* বলে বর্ণিত আছে। যেমন-

عن سعيد بن جبير ان عمر بن الخطاب سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الملا ءكة فلم يرد عليه شياً فاتاه جِبْرِيل فقال ان أهل السماءالدنيا سجود الى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأهل السماء الثانية ركوع الى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأهل السماء الثالثة قيام الى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي الحي الذي لا يموت

(الدر المنثور للأمام السيوطي ، المجلد الاول صحفة ١١٣-١١٤)

তরজমা : হযরত সাঈদ বিন জুবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। হযরত উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরিশতাদের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি কোন জবাব দিলেন না। ইতোমধ্যে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, দুনিয়ার আকাশে কিছু ফিরিশতা সিজদারত আছেন কিয়ামত অবদি সময়ের জন্য, তারা *সুবহানাযিল মুকলি ওয়াল মালাকুতি* এই তাসবীহ পড়ছেন। দ্বিতীয় আকাশে কিয়ামত অবদি

সময়ের জন্য কিছু ফিরিশতা রুকু অবস্থায় পড়ছেন, *সুবহানাযিল ইযযাতি ওয়াল জাবারূতি*। তৃতীয় আকাশে কিছু ফিরিশতা কিয়ামত অবদি সময়ের জন্য কিয়ামরত অবস্থায় পড়ছেন, *সুবহানাল হায়্যিল্লাযি লা ইয়ামুতু*।

(ইমাম সুয়ূতী- আদদুররুল মানছূর, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪)

ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। সে বর্ণনায় প্রথম তিন আকাশে ফিরিশতাগণের পঠিত তাসবীহ *সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি, সুবহানলিল ইযযাতি ওয়াল জাবারূতি, সুবহানাল হায়্যিলাযি লা ইয়ামুতু*; তিন আকাশে ফিরিশতাদের এ তিন তাসবীহ'র সাথে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে ফিরিশতাদের আরোও তাসবীহ উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং সাহাবি সাঈদ বিন জুবায়ির ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে ফিরিশতাগণের পঠিত তাসবীহ বলে যে তাসবীহ উল্লিখিত হয়েছে, সেটিকে মুখের উপর ম্যান মেইড, বিদআত, পড়লে জাহান্নামে যাবে ইত্যাকার ফতোওয়া দিয়ে মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করা কোন আলিমের কাজ হতে পারে না।

পাঠক! এতক্ষণে আশা করি পরিস্কার হয়েছে যে, এই তাসবীহ ম্যান মেইড বা মানুষের বানানো নয়। হাদীসে এই তাহবীহ উল্লেখ আছে।

বেহেশতি জেওর ও *মকসুদুল মুমিনীন* ছাড়া অন্য কিতাবে এ তাসবীহ নেই, এই দাবি রীতিমত হাস্যকর। অবশ্য কারো পড়া শোনা যদি *বেহেশতি জেওর* আর *মকসুদুল মুমিনীন* পর্যন্ত সিমীত থাকে তবে সে ভিন্ন কথা (অবশ্য বেহেশতি জেওর কিতাবে এ বিষয়টি নেই)। আর না হয় ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরি) প্রণীত *তাফসীরে তাবারী* ১*ম খণ্ড*, ইমাম ইবনু কাছীর (৭০২-৭৭৪ হিজরি) প্রণীত *তাফসীরে ইবনু কাছীর* ১*ম খণ্ড* এবং ইমাম সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হিজরি) প্রণীত *আদদুররুল মানছূর* ১*ম খণ্ডসহ* আরো অন্যান্য কিতাবে *তাসবীহে মালাইকা* বলে এই তাসবীহ উল্লেখ আছে। একজন শায়খ বা আলিমের উল্লিখিত কিতাবসমূহ অধিক থাকা উচিত।

তারাবীহ নামাযে চার রাকাত পর পর এ তাসবীহ পড়া

তারাবীহ নামাযে প্রতি ترويحة বা চার রাকাত পর পর কিছু সময় বিশ্রামের কথা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে। বিশ্রামকালিন করণীয় সম্পর্কে চার মাযহাবের কিতাবাদিতে বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো- এ সময় কী করবে,তা সম্পূর্ণ মুসল্লির ইচ্ছাধিন। চাইলে চুপচাপ বসে থাকবে। চাইলে যে কোন তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল করবে। চাইলে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। চাইলে দুরূদ শরীফ পড়বে। এমনকি চাইলে একাকী দু'রাকাত নফল নামায পড়তে পারবে।

ফতোওয়ায়ে শামী নামে খ্যাত হানাফী মাযহাবের কিতাব *রাদ্দুল মুহতার আলাদদুররিল মুখতার* এ ইমাম ইবনু আবিদীন শামী (১১৯৮-১২৫২ হিজরি) প্রতি চার রাকাত পর বিশ্রামের সময় করণীয় সম্পর্কে বলেন-

قال القهستاني: فيقال ثلاث مرات سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت،سبحان الملك الحي الذي لايموت، سبوح قدوس رب الملاءكة والروح

(ردالمحتار على الدر المختار، المجلد الثاني، صحفة 479)

কুহিস্তানি বলেছেন, (এ সময়) তিনবার বলবে-*সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি, সুবহানাযিল ইযযাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জাবারূত, সুবহানাল মালিকিল হায়্যিল্লাযি লা ইয়ামুতু, সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ...*

(রাদ্দুল মুহতার আলাদদুররিল মুখতার, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৭৯)

সুতরাং বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেখানেই হানাফী মাযহাবের অনুসারি মুসলমানের অধিবাস,তারা ইমাম ইবনু আবিদীন রাহিমাহুল্লাহ'র নির্দেশনা অনুযায়ী তারাবীহ নামাযে প্রতি চার রাকাত পর পর উল্লিখিত তাসবীহ পাঠ করেন।

দ্বীনি শিক্ষায় সতর্কতা

সাহাবি আবু হুরাইরা, আনাস বিন মালিক, যায়িদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ

বিন আব্বাস,আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুম'র ছাত্র তাবিঈ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিরীন রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ১১০ হিজরি) দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, انظروا عمن تأخذون دينكم লক্ষ রেখো, তোমরা তোমাদের দ্বীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করছো (মুকাদ্দিমা মুসলিম)? তাই ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে উস্তাদের আকীদা বিশ্বাস, তাকওয়া, ইলমি গভীরতা ও আমানতদারি,সনদ পরম্পরা ইত্যাদির খুঁজ খবর নিয়ে উস্তাদ নির্ধারণ করতে হবে। নতুবা এভাবেই ফিরিশতাগণের পঠিত তাসবীহকে ম্যান মেইড,বিদআত আখ্যায়িত করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে।

নবীজির নির্দেশনা

পরিশেষে মুসলিম শরীফের মুকাদ্দিমা বা ভূমিকায় বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে লেখার ইতি টানতে চাই।

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:سيكون في اخر امتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فإياكم واياهم

তরজমা : আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের আখেরি যামানায় এমন কিছু লোক আবির্ভূত হবে তারা তোমাদের সামনে এমন সব অভিনব বয়ান পেশ করবে, যা তোমরা কখনো শুনোনি, তোমাদের বাপ দাদারাও শুনেনি। তোমরা তাদের থেকে দূরে থেকো, আর তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রেখো।

হায়! সেদিন টেলিভিশনে প্রশ্নকারি মহিলাকে যদি বলে আসতে পারতাম, বোন! ঐ কথিত শায়খ আপনাকে এবং অগণিত দর্শক শ্রোতাকে সেদিন মিসগাইড করেছেন। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন।

৩১ মে ২০১৮
লন্ডন

মুহাররাম ভাবনা
মুখোশধারী রাফিযীদের প্রোপাগান্ডা

বাংলাদেশে দিনকে দিন রাফিযী ও খারিজী আকীদার প্রসার ঘটছে নীরবে নিভৃতে। যে দুই পক্ষ চেতনে অবচেতনে তা করছে তারা কেউই নিজেদের রাফিযী-খারিজী পরিচয় দিতে প্রস্তুত নয়। সমাজে এদের পরিচয় ভিন্ন। তাই সাধারণ মানুষ সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে সচেতন উলামায়ে কিরামের বলিষ্ঠ তৎপরতা একান্ত কাম্য। সচেতনতা বৃদ্ধির আশায় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়েই কলম হাতে নেয়া।

রাফিযী প্রোপাগান্ডা

বিগত কয়েক বছর হলো বিষাদের মাস মুহাররাম এলে বাংলাদেশে সুন্নি নামধারী রাফিযী চিন্তা চেতনা ও আকীদা লালনকারি কিছু মানুষ সায়্যিদিনা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ ইতিহাসের কিছু অসংলগ্ন তথ্য উপাত্তকে সামনে নিয়ে এসে স্বভাব সুলভ কদর্য ভাষায় প্রকাশ্যে আক্রমণ সানায় কাতিবে ওহী মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর। বাংলার মুসলমান এদের অতীত বর্তমান মোটামুটি জানে এবং তাদের ফেরেববাজি সম্পর্কে সচেতন রয়েছে। কিন্তু সুন্নিয়তের মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কিছু রাফিযী-শিয়া ইনিয়ে বিনিয়ে আহলে বাইত'র মুহাব্বাত প্রকাশের নাম করে মালউন ইয়াযীদ'র যাবতীয় অপকর্মের দায় চাপাতে চায় মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর। এরা খুবই খতরনাক,কারণ মুখোশের অন্তরালে ঢেকে রাখা তাদের রাফিযী তথা শিয়া আকীদা সম্পর্কে সাধারণ সুন্নি মুসলমান ততটা সচেতন নয়।

এই মুখোশধারীরা ইতিহাসের বিভিন্ন ফাঁক ফোকর তালাশ করে তাদের চিরায়ত স্বভাবের কুযুক্তির মাধ্যমে রাফিযীয়াতের খড়্গ চালিয়ে পরোক্ষভাবে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খিয়ানতকারি, চরিত্রহীন, লম্পট ইত্যাদি প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। কেউ কেউ আরো এক কাঠি এগিয়ে বলে, তিনি মুসলমানই ছিলেন না। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো প্রহসন, আদতে মুনাফিক ছিলেন। আল ইয়াযু বিল্লাহ।

কারো চিন্তাধারা, ইজতিহাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করা এক কথা আর তাঁর চরিত্র হননে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন কথা। উল্লেখ্য যে, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক কিছু ইজতিহাদের সাথে দ্বিমত পোষণের সুযোগ আছে। তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত উম্মাহর জন্য সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু এই অজুহাতে তাঁর চরিত্র হননের মত হীন কাজ আহলুসসুন্নাহ'র ইমামগণ অনুমোদন করেন না।

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ইতিহাসে দু'টি মত প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম মত হলো অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এবং তাঁর পিতা- মাতা ও ভাই একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মত ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়া সন্ধিকালে তিনি মুসলমান হয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনায়িন অভিযানকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিবেদিত সৈনিক হিশেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওহি লেখক নিয়োগ করেন।

১২ হিজরিতে সায়্যিদুনা আবুবাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামাতুল কাযযাব বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বীরত্বের সাথে লড়াই করেন।

২১ হিজরিতে দ্বিতীয় খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁকে জর্দান এবং পরে দামেস্কের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

২৩ হিজরিতে তৃতীয় খলীফা উসমান যিননূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পুরো শামের গভর্ণর নিয়োগ করেন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি জিজ্ঞাসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মুমিন মুনাফিকের পার্থক্য বুঝতেন না? যারা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুনাফিক প্রমাণ করতে চায় পক্ষান্তরে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাজকে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন বিদ্ধ করে। একজন মুনাফিককে কেমন করে তিনি ওহি লেখক নিয়োগ করলেন?

খলীফা উমার এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কি একজন খিয়ানতকারি, চরিত্রহীনকে গভর্ণর নিয়োগ করলেন? মূলত: চরমপন্থী রাফিযী তথা শিয়ারা প্রথম তিন খলীফার কার্যক্রমকে বিতর্কিত করতে নানাবিধ প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিলো। বাংলাদেশে সে কাজটিই ভিন্ন আঙ্গিকে এখন করছে কথিত সুন্নি মুখোশধারী রাফিযীরা।

আহলুসসুন্নাহ'র ইমামগণ মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একজন নিষ্ঠাবান সাহাবি হিশেবে নিজেদের সাহাবি চরিত বিষয়ক কিতাবে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। যেমন- ইমাম ইবনু আবদিল বার (৩৬৮-৪৬৩ হিজরি)- *আল ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৪১৬*, ইমাম ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০ হিজরি)- *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিসসাহাবাহ খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ২০৯*, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরি)- *আল ইসাবাহ ফী তাময়িযিসসাহাবাহ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১২।*

এবার দেখা যাক একজন সাহাবির চরিত্র হনন, গালমন্দ, দোষারোপ বৈধ কী না। সাহাবয়ে কিরামকে গালমন্দ করতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهﷺصَلّى اللهﷺعَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ"

حديث أبى سعيد: أخرجه الطيالسى (ص 290 ، رقم 2183) ، وأحمد (3/54 ، رقم 11534) ، وابن أبى شيبة (6/404 ، رقم 32404) ، وعبد بن حميد (ص 287 ، رقم 91 ، والبخاري (3/1343 ، رقم 3470) ، ومسلم (4/1967 ، رقم 2541) ، وأبو داود (4/214 ، رقم 465 ، والترمذى (5/695 ، رقم 3861) وقال : حسن . وابن حبان (16/238 ، رقم 7253) . حديث أبى هريرة : أخرجه مسلم (4/1967 ، رقم 2540) ، وابن ماجه (1/57 ، رقم 161) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (1/212 ، رقم 687)

তরজমা : হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা আমার সাহাবিদের গালমন্দ করোনা, তোমরা আমার সাহাবিদের গালমন্দ করো না। আমার যথাসর্বস্ব যার হাতে সেই সত্বার শপথ! তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সোনা আল্লাহর রাহে খরচ করো তবু তাঁদের এক অথবা অর্ধেক মুদ এর সমান হবে না। (মুদ- তখনকার সময়ে মদীনা শরীফে প্রচলিত ওজনের বাটখারা বিশেষ।)

উপরোক্ত হাদীস শরীফখানা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনু আবি শাইবাহ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখ নিজ নিজ কিতাবে সংকলন করেছেন। আরবি অংশে কিতাবসমূহের রেফারেন্স সবিস্তারে আছে।

শরহে মুসলিমে এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ শরহু মুসলিমে বলেন-

وَاعْلَمْ أَنّ سَبّ الصّحَابَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَرَام مِنْ فَوَاحِش الْمُحَرّمَات، قَالَ الْقَاضِي: وَسَبُّ أَحَدهمْ مِنْ الْمَعَاصِي الْكَبَائِر

জেনে রাখুন, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে গালমন্দ করা নিকৃষ্টতম হারামের মধ্যে একটি। কাযী আয়ায বলেছেন, যেকোন সাহাবিকে গালমন্দ করা কবিরা গোনাহ।

সাহাবায়ে কিরামকে গালমন্দ করা, তাদের সমালোচনা, দোষারোপের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন। এ বিষয়ে বহু হাদীস উল্লেখ করা যায়। কলেবর চিন্তায় আমরা তা উল্লেখ করলাম না। সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আকীদা আলোচনায় ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ তাহাবী (২৩৮-৩২১ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

لا نذكرهم الا بخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

আমরা তাঁদের (সাহাবিগণের) উত্তম ছাড়া কোন আলোচনা করবো না। তাঁদের মুহাব্বাতই দ্বীন, ঈমান এবং ইহসান। আর তাঁদের প্রতি হিংসা পোষণ হলো কুফরি, মুনাফিকী এবং সীমালঙ্ঘন।
[আল আকীদাতুত তাহাবিয়্যা, পৃষ্ঠা ৪২]

সুতরাং ইতিহাস চর্চা কিংবা গবেষণা যে কোন অজুহাতেই হোক সাহাবায়ে কিরামের সম্মানহানিকর আলোচনা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আকীদায় নিষিদ্ধ।

তারা যিন্দিক

ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ প্রমুখের সরাসরি উস্তাদ ইমাম আবু যুরআ রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ২৬৪ হিজরি) বলেন-

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق

(العواصم من القواصم، صحفة 47)

অর্থাৎ যখন তুমি দেখবে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কোন সাহাবিকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে জেনে নিও সে একজন যিন্দিক।
(আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃষ্ঠা ৪৭)

সুতরাং যারা বিভিন্ন অজুহাতে কোন সাহাবিকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহাবিগণের ত্রুটি অন্বেষণে লেগে আছে তারা বাহ্যিকভাবে যে পরিচয়ে বিচরণ করুক না কেনো মূলত: তারা যিন্দিক।

যিন্দিক কে বা কারা

যিন্দিক শব্দটি ফারসি, আরবি ভাষায়ও শব্দটির ব্যবহার আছে। যিন্দিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ বলা হয়েছে-

الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الاسلام وكان يسمى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافق

অর্থাৎ যিন্দিক হলো সেই ব্যক্তি যে তার অন্তর্গত কুফরি লুকিয়ে রেখে

বাহ্যত নিজেকে মুসলমান পরিচয় দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সময়ে এদের নাম ছিলো মুনাফিক।

উপরের আলোচনায় একটি কথা পরিস্কার হলো, যে কোন স্তরের সাহাবির ত্রুটি অন্বেষণকারিকে ইমাম আবু যুরআ রাহিমাহুল্লাহ মুনাফিক বলেই চিহ্নিত করেছেন।

কুরআনুল কারীমের সূরা শুরার তেইশ নাম্বার আয়াতের একটি অংশের আলোকে আহলে বাইতের মুহাব্বাত ঈমানের অংশ বলে সাব্যস্ত। ঠিক তেমনি বহু সংখ্যক হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মুহাব্বাত ঈমানের আলামত বা নিদর্শন বলে পরিগণিত। তাই আহলে বাইত'র মুহাব্বাতের নামে যারা যে কোন সাহাবির দোষ চর্চায় প্রবৃত্ত হয়-মূলতঃ আহলে বাইত'র প্রতি তাদের মুহাব্বাতের দাবি প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য।

ইয়াযিদ কি নিন্দিত

ইসলামের ইতিহাসে কুখ্যাত এক নাম ইয়াযিদ। এ জাতির দুর্ভাগ্য যে, যুগে যুগে এমন মানুষের জন্ম হয়েছে যারা ইয়াযিদকে নির্দোষ প্রমাণে ইতিহাসের অলি গলি চষে বেড়ায়। বর্তমান বাংলাদেশে আহলে হাদীস নামধারী কয়েকজন কথিত শায়খ ইয়াযিদের পক্ষে সাফাই দিতে গিয়ে মিথ্যা হাদীস রচনার মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন ইতোমধ্যে। তারা এও বলতে চান যে, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয় বিদারক শাহাদতের জন্যে ইয়াযিদ দায়ি নয়। ইয়াযিদ নাকি কারবালা হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দাতা নয়। এ বিষয়ে ইতিহাসের নানা তথ্য উপাত্ত নিয়ে নানা কথা বলার সুযোগ হয়তো আছে। তবে আমরা ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহর গবেষণা এবং ইলমি আমানতদারির প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করি। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পূর্বাপর আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম সুয়ূতি বলেন-

وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه اليهم، فخرج من مكة متوجهاً إلى العراق في عشر ذى الحجة ومعه طائفة من آل بيته رجالاً ونساء وصبياناً، فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله ، فوجه اليه جيشاً أربعة آلاف ..... لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضاً

(تاريخ الخلفاء ، ص 341)

অর্থাৎ ইরাকের জনগণ হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বহু দূত ও পত্র প্রেরণ করে। ফলে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে তিনি মক্কা মুকাররামা থেকে ইরাক অভিমূখে রওয়ানা দেন। সাথে ছিলেন তাঁর পরিবারের নারী, পুরুষ এবং শিশুগণ। তখনই ইয়াযিদ ইরাকে নিযুক্ত তার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদের প্রতি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহুকে হত্যার নির্দেশপত্র দিয়ে চার হাজার সেনা প্রেরণ

করে।..... হুসাইন রাদিলাহু আনহুকে হত্যাকারি ইবন যিয়াদ এবং ইয়াযিদের উপর আল্লাহ লানত বা অভিশাপ বর্ষণ করুন।

(তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৩৪১)

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে ইমাম হুসাইন রাদিয়ালাহু আনহুর কর্তিত মস্তক দামেশকে ইয়াযিদের দরবারে যখন রাখা হয় সে হাতে থাকা ছড়ি দিয়ে দাঁত মুবারকে আঘাত করতে করতে কবিতা আবৃত্তি করেছিলো-

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل
لاهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل

অর্থাৎ হায়! বদর যুদ্ধে নিহত আমার পূর্ব পুরুষরা যদি আজ থাকত, তবে আজকের বিজয় গাঁথা দেখে তারা খুশিতে আমায় অভিনন্দন জানিয়ে বলতো, হে ইয়াযিদ! তোমার উদ্যোগ বৃথা যায়নি। তুমি যথাযথ প্রতিশোধই নিয়েছো।

(সিলসিলাতু আবায়িননাবী পৃষ্ঠা ১৯২, আস সাওয়াইকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা ৫৪৩।)

এই কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে ইয়াযিদ এ কথাই বলেছে যে, বদর যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামের হাতে নিহত উতবা, শাইবা প্রমুখ কাফির নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে সে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েছে।

ইমাম মোল্লা আলী কারী (ওফাত ১০১৪ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬১ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ'র বরাতে কারবালার হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ইয়াযিদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সে বলেছে-

اني جازيتهم بما فعلوا باشياخ قريش وصناديدهم في بدر
(منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، صحفة 218)

অর্থাৎ বদর যুদ্ধে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে তারা যা করেছে আমি তার বদলা নিয়েছি।

(মিনাহুর রাওদুল আযহার ফী শারহিল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ২১৮।)

সুতরাং কারবালা ট্র্যাজেডির মাস্টার মাইণ্ড যে ইয়াযিদ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত মস্তকের সাথে ইয়াযিদের পাশবিক ও ঘৃন্য আচরণের বর্ণনার সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে ভিন্ন একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সে বর্ণনা মতে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত মস্তক দেখে ইয়াযিদ কেঁদে ফেলে এবং ইবন যিয়াদের প্রতি রাগান্বিত হয়। বর্তমানে যারা কারবালা ঘটনার জন্য ইয়াযিদ দায়ি নয় বলে তারা এই বর্ণনা উল্লেখ করে বলতে চায় যে, যদি ইয়াযিদের নির্দেশে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হতো তবে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তিত মস্তক দেখে সে কাঁদতো না এবং ইবন যিয়াদের প্রতি রাগান্বিতও হতো না।

মূলত: ইতিহাসের এই বর্ণনা দু'টি কারণে সঠিক নয়।

প্রথমত: যেসব কিতাবে এই বর্ণনা আছে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ইমামগণ ইমাম হোসাইন রাদিয়ালাহু আনহুর কর্তিত মস্তকের সাথে ইয়াযিদের ঘৃন্য আচরণের বর্ণনা পেশ করার পর وقيل (কথিত আছে) শব্দ সহযোগে পরের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আরবি ভাষার শব্দশৈলীর ব্যবহার বিধি সম্পর্কে যাদের নুন্যতম জ্ঞান আছে তারা জানেন, আরবি ভাষায় সাধারণত: খুব দুর্বল বা গ্রহণযোগ্য নয় এমন মত উল্লেখ করার ক্ষেত্রে قِيْلَ বা কথিত আছে শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয়ত: ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার কারণে যদি ইয়াযিদ কুফায় নিযুক্ত গভর্ণর ইবন যিয়াদের উপর রাগান্বিত হয়ে থাকে বা কারবালা হত্যাকাণ্ডে তার সম্মতি না থাকে তবে সাধারণ বিবেকের দাবি মতে সে ইবন যিয়াদসহ অন্য যারা এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের বিচার করতো। নুন্যতম তাদের পদচ্যুত করতো। কিন্তু ইতিহাসে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না যে, ইয়াযিদ কোন বিচার করেছিলো, অথবা বিচারের কোন উদ্যোগ নিয়েছিলো। বরং বিপরীতে এই বর্ণনা পাওয়া যায়, সফলভাবে কারবালা গণহত্যা সংঘটিত করার কারণে ইয়াযিদের কাছে ইবন যিয়াদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ইমাম

ইবনু হাজার হাইতামি (৯০৯-৯৭৩ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ কারবালা ঘটনার পর ইয়াযিদের কাছে ইবন যিয়াদের মর্যাদা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন-

انه بالغ في رفعه ابن زياد حتى ادخله على نساءه

অর্থাৎ ইবন যিয়াদের মর্যাদা তার কাছে এতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, সে অনায়েসে তার অন্দর মহলেও প্রবেশ করতে পারতো।

(আস সাওয়াইকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা ৫৪৩।)

যারা আজ সহীহ হাদীসের অনুসরণের নামে সাধারণ মুসলমানের মাঝে বহুমূখি ফিতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, কারবালা হত্যাকাণ্ডের হুকুম দাতা ইয়াযিদকে নির্দোষ সাধু পুরুষ প্রমাণে ব্যর্থ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, ইয়াযিদের সাথে সাথে তাদের উপরও আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

কারবালা ঘটনা ছাড়াও তো ইয়াযিদ লানত বা অভিশাপের উপযুক্ত। হাররার ঘটনা বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে চুম্বক অংশ সামনে নিয়ে আসলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ইয়াযিদ নিন্দাবাদ বা অভিশাপের উপযুক্ত কি না।

৬২ হিজরির ঘটনা। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবন হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র নেতৃত্বে মদীনা তায়্যিবাহ থেকে একটি প্রতিনিধি দল দামেশক যায়। ইয়াযিদ তাঁদের প্রতি খুবই সম্মান প্রদর্শন করলো। নানা উপহার দিয়ে মন জয় করতে চেষ্টা করলো। প্রতিনিধি দল ফিরে এলে গণ চাহিদার প্রেক্ষিতে দলনেতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। বললেন- ইয়াযিদ আমাকে অনেক সম্মান দেখিয়েছে, এমনকি এক হাজার দিনার উপঢৌকনও দিয়েছে। তবু বলবো, সে নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে মদ পান করে, নামাযের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। হেন কোন অপকর্ম নেই যা সে করে না। এমতাবস্থায় আমরা তার বাইআত ছিন্ন করে যদি প্রতিবাদ মুখর না হই তবে আমি আশংকা করি আসমান থেকে আল্লাহ আমাদের উপর গজবের পাথর বর্ষণ করবেন। ইয়াযিদের অপকর্মের এই বর্ণনা প্রত্যক্ষ দর্শী একজন সাহাবির মুখে শোনার পর তাৎক্ষণিক মদীনাবাসি প্রতিবাদে ফেঁটে পড়লো। তাঁরা মদীনায় ইয়াযিদ নিযুক্ত গভর্ণর মারওয়ান ইবন

হাকামকে গৃহবন্দী করে রাখলো। সংবাদ পেয়ে ইয়াযিদ মুসলিম ইবন উকবার নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্য পাঠালো। ইবন উকবাকে এই নির্দেশ দিলো যেনো মদীনাবাসিকে চূড়ান্ত শায়েস্তা করার পর মক্কা অবরোধ করে এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে।

সময় মত মুসলিম মদীনা নগরীর অদূরে *হাররা* নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলো। ৬২ হিজরির ২৮ যিলহাজ্জ বুধবার প্রিয় নবীর প্রিয় শহর মদীনার উপর আক্রমণ করলো। আবদুল্লাহ ইবন হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নেতৃত্বে মদীনাবাসি প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁদের প্রতিরোধ ব্যুহ ভেঙে গেলো। ইয়াযিদ বাহিনী নির্বিচারে নরহত্যা চালিয়ে ৮০ জন সাহাবিসহ কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ হত্যা করলো। তিন দিন পর্যন্ত মদীনাকে হালাল ঘোষণা করা হলো। ফলে অবাধ লুটতরাজ এবং ব্যাপক নারী ধর্ষণের মত জঘন্য কাজ চালানো হলো। গণধর্ষণের ফল স্বরূপ পরবর্তীতে এক হাজার পিতৃ পরিচয়হীন শিশুর জন্ম হলো। এই তিন দিন মসজিদে নববীতে আযান ইকামাত পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে সৈন্যদের ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পুরো মদীনা নগরী মৃত্যুপুরীর রূপ পরিগ্রহ করে।

মদীনা তায়্যিবায় ম্যাসাকার সম্পন্ন করে মুসলিম ইবন উকবা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে সৈন্য রওয়ানা করে। পথিমধ্যে মুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হুসাইন ইবন নুমায়িরকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করে। ইবন নুমায়ির'র নিয়োগ সম্পন্ন করেই মুসলিম মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হুসাইন ইবন নুমায়ির'র নেতৃত্বে ইয়াযিদ বাহিনী মক্কা অবরোধ করে। দুই মাস ধরে সে অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহু বীর বিক্রমে মোকাবেলা চালিয়ে যান। তাঁকে পরাস্ত করতে ইয়াযিদ বাহিনী মিনজানিকের সাহায্যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে পবিত্র কা'বা ঘরের দেয়াল ধ্বসিয়ে দেয়। এমনকি নিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলকের কারণে গিলাফে আগুন লেগে কা'বা গৃহ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময়ই পাপাচারী ইয়াযিদের মৃত্যু সংবাদ মক্কায় পৌঁছে।

মনোবল হারিয়ে সৈন্য বাহিনী রণেভঙ্গ দিয়ে ফিরে যায় দামেশকে।

পাঠক! এবার একটি হাদীসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أ خاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين (مسند احمد 4:55)

অর্থাৎ যে মদীনাবাসিকে ভীত সন্ত্রস্থ করবে আল্লাহ তাকে ভীত করবেন, আর তার উপর আল্লাহপাক, ফিরিশতাকূল এবং সমস্ত মানব জাতির অভিশাপ।

(মুসনাদ আহমাদ ৪:৫৫)

এবার উল্লিখিত হাদীসের আলোকে নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করুন, ইয়াযিদ কি নিন্দাবাদ বা অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য?

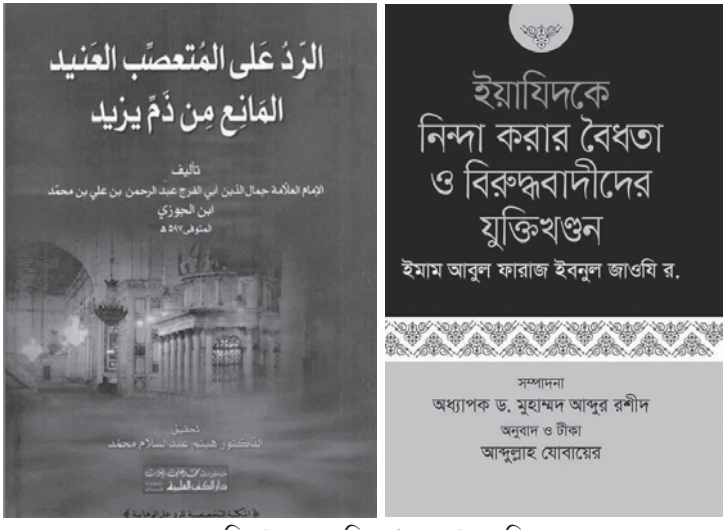
ইয়াযিদ নিন্দাবাদ পাওয়ার উপযুক্ত

মূলত: অভিশপ্ত ইয়াযিদকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা নতুন নয়। যুগে যুগে খারিজী চিন্তা চেতনা ও আকীদায় বিশ্বাসীরা সে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সে ধারা দেশে দেশে আজও বহমান। হিজরি ৫১০ সালে জন্মগ্রহণকারি সায়্যিদুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধ:স্তন পুরুষ ইমাম জামালুদ্দিন আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ আরবি ভাষায় রচনা করেছিলেন الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد নামক প্রামাণ্য কিতাব। ইয়াযিদকে নিন্দামন্দ করতে তখনকার সময় যারা বিভিন্ন যুক্তির আলোকে বারণ করতো ইমাম ইবনুল জাওযি সেই যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে প্রমাণ করেছিলেন যে, ইয়াযিদ তার কৃত কর্মের জন্যে অবশ্যই নিন্দাবাদ এবং অভিশাপ পাওয়ার উপযুক্ত।

ইমাম ইবনুল জাওযি ইন্তিকাল করেছেন ৫৯৭ হিজরিতে। তাঁর রেখে যাওয়া প্রামান্য এবং অনবদ্য এ কিতাবখানা ৮৪৩ বছর পর প্রথমবারের মত বাংলা অনুবাদ করেছেন আব্দুল্লাহ যোবায়ের। *ইয়াযিদকে নিন্দা করার বৈধতা ও বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডন* নামক অনুবাদ কর্মটি সম্পাদনা করেছেন দেশের খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের ইসলামি ধারার বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে ইতোমধ্যে নিজের আসন পোক্ত করে নিয়েছেন। তাঁর অনুদিত *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যা*, *ফুতুহুল গাইব'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ* বোদ্ধা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। প্রখর মেধাবী এ তরুণকে অনুবাদ কর্মে দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছেন তাঁরই শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, বহুগ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। বাংলা ভাষাভাষী অগনন পাঠকের পক্ষ থেকে অনুবাদক এবং সম্পাদক মহোদয়ের প্রতি অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা জানাই। দেশের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশনী ঐতিহ্য প্রকাশিত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

১৮ জানুয়ারি ২০১৯
লন্ডন।



মূল কিতাব ও অনুদিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র

ইয়াযিদ সম্পর্কে হাদীসে কী আছে

বিগত ১৮ জানুয়ারি *ইয়াযিদ কি নিন্দিত* শিরোনামে একটি লেখা পোস্ট করেছিলাম। কারবালা এবং হাররা ট্র্যাজিডি সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে প্রমাণ করে ছিলাম, ইতিহাসের এক ঘৃন্য চরিত্র ইয়াযিদ, অবশ্যই সে নিন্দিত। কৌতুহলী কয়েকজন পাঠক জানিয়েছিলেন, হাদীসে নাকি ইয়াযিদের প্রশংসা আছে। চলমান লেখায় আমরা দেখবো হাদীসে আদৌ ইয়াযিদ সম্পর্কে কিছু আছে? নাকি বানোয়াট। আশা করি সাধারণ পাঠকের কাছে ইয়াযিদ বন্দনাকারিদের মুখোশ উন্মোচিত হবে।

প্রথমেই একটি কথা পরিস্কার করা দরকার যে, হাদীসে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনভাবেই ইয়াযিদের প্রশংসা নেই। তবে ইয়াযিদ যে অভিশপ্ত সেটি পরোক্ষভাবে হাদীসে আছে। আমরা পূর্বের লেখায় *মুসনাদে আহমাদ* কিতাব থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছি, নবীজি জানিয়ে দিয়েছেন- যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর মধ্যে ভীতি ছড়াবে তার উপর আল্লাহপাক, ফিরিশতাকুল এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ।

হাররা ঘটনার মাধ্যরেম ইয়াযিদ বাহিনী মদীনা নগরীতে গণহত্যা, লুটতরাজ ও ব্যাপক নারীধর্ষণ করে মদীনাবাসির মনে নজীর বিহীন ভীতি সঞ্চার করেছিলো। সুতরাং হাদীসের ভাষ্যমতে ইয়াযিদ ও তার বাহিনী অবশ্যই অভিশপ্ত।

কথিত আহলে হাদীস এবং সালাফি শায়খদের বক্তব্য এবং লেখায় কন্সট্যান্টিনোপল প্রথম অভিযানে অংশ গ্রহণকারিদের প্রতি নবীজির দেয়া সুসংবাদ বিষয়ক একটি হাদীস উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা প্রমাণ করতে চান যে, ইয়াযিদের নেতৃত্বে কন্সট্যান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল (আরবি কুসতুনতুনিয়্যা) প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তাই সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমার সুসংবাদ প্রাপ্ত।

এবার আমরা সেই হাদীসের ভাষ্য দেখি। মূলত: এটি সহীহ বুখারী কিতাবে উদ্ধৃত উম্মু হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত একটি দীর্ঘ

হাদীসের অংশ বিশেষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم

অর্থাৎ আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী কায়সার এর শহর আক্রমণ করবে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব মা কীলা ফী কিতালির রুম। হাদীস নং ২৯২৪)

উল্লেখ্য যে, হাদীসে যেই বাহিনীকে ক্ষমা প্রাপ্ত বলা হয়েছে তাঁদের দু'টি বিষয় থাকতে হবে।

প্রথমত: তাঁরা হবে اول جيش বা প্রথম বাহিনী। সুতরাং প্রথম অভিযানে অংশ গ্রহণকারি বাহিনীর জন্য এ সুসংবাদ। পরবর্তী অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণকারি কারো জন্যে এ সুসংবাদ নয়।

দ্বিতীয়ত: যারা مدينة قيصر বা কায়সার তথা রোম অধিপতির শহর আক্রমণ করবে।

এখানে রোম অধিপতির রাজধানী বলা হয়নি। আরবি মদীনা শব্দের অর্থ রাজধানী নয়। কিন্তু বাংলাদেশে আহলে হাদীস নামধারীদের তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারী'র বাংলা অনুবাদে مدينة قيصر এর অনুবাদ করা হয়েছে কায়সারের রাজধানী। আসলে মদীনা শব্দের বাংলা রাজধানী করার সুক্ষ্ম মতলব পরবর্তী আলোচনায় পরিষ্কার হবে।

হাদীসে কায়সার তথা রোম অধিপতির রাজধানী কুস্তুনতুনিয়্যা বা কন্সট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) এর কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে রোম অধিপতির শহর। তা যে কোন শহরই হতে পারে। এবার আমরা ইতিহাস ঘেটে দেখবো মুসলমানদের বাহিনী কবে প্রথম রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ করেছিলো। সেই সাথে দেখবো প্রথম সে বাহিনীতে নেতৃত্বে হোক কিংবা সাধারণ সৈনিক হিসেবে ইয়াযিদ কি ছিলো।

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল সূচনা হয় ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে। তাঁর শাসনকালে ৪২ হিজরি থেকে শুরু করে ৬০ হিজরি পর্যন্ত প্রতি বছরই মুসলিম বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করে।

ইমাম তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরি), ইমাম ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হিজরি), ইমাম ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০ হিজরি), ইমাম ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিজরি) ও ইমাম ইবনু খালদুন (৭৩২-৮০৮ হিজরি) প্রমুখের মতে মুসলিম সেনা বাহিনী ৪২ হিজরিতে প্রথম রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন।

(দ্রষ্টব্য: তারীখে তাবারী ৫ : ১৭২, আল মুনতাযাম ৫ : ১৯৩, আল কামিল ফিততারীখ ৩ : ২৮৩, আল বিদায়া ওয়াননিহায়া ৮ : ২৪, তারীখে ইবন খালদুন ৩ : ১১)

এরপর থেকে প্রত্যেক বছরেই বিভিন্ন জনের নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ছোট বড় অভিযান অব্যাহত থাকে। ইমাম তাবারীসহ অন্যান্য ইতিহাসবিদ ইমামগণ উল্লেখ করেছেন- ৪৩ হিজরিতে সাহাবি বুসর ইবন আরতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান চালিয়ে কুস্তুনতুনিয়্যা বা কন্সট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) পর্যন্ত পৌঁছান। সেখানে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। সুতরাং রোম অধিপতি কায়সার'র রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপল প্রথম আক্রমণ হয়েছে ৪৩ হিজরিতে। উল্লেখ্য যে, ৪২ হিজরি থেকে শুরু করে ৪৮ হিজরি পর্যন্ত সময়কালে রোমান সাম্রাজ্যে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর কোন অভিযানে ইয়াযিদের অংশগ্রহণের কোন প্রমাণ ইতিহাসের প্রামান্য কোন সূত্রে উল্লেখ নেই।

৪৯ হিজরিতে রোমান সাম্রাজ্যে দুইবার অভিযান পরিচালিত হয়। প্রথম অভিযানে নেতৃত্বে ছিলেন মালিক ইবন হুবাইরা। দ্বিতীয় অভিযানে মূল নেতৃত্বে ছিলেন সুফইয়ান ইবন আউফ। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইমাম ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

في هذه السنة وقيل سنة خمسين سير معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة،وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة

وأم كلثوم امرأته وهي ابنة عبد الله بن عامر . فبلغ معاوية شعرهمامعهم فتثاقل واعتل فامسك عنه ابوه فأصاب الناس غزاتهم ومرض شديد، فأنشأ يزيد يقول

ان ابا لى بما لا قت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم

إذا اتكأت على الأنماط مرتفقاً بدير مران عندي أم كلثوم

فاقسم عليه ليلحقن بسفيان في ارض الروم ليصيبه ما اصاب الناس، فسار ومعه جمع كثير أضافهم اليه ابوه وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فاغلوا في بلاد الروم حتى بلغوا القسطنطينية فا قتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدت الحرب بينهم [الكامل في التاريخ، المجلد الثالث ، الصحفة ٣١٤]

অর্থাৎ এ বছর (৪৯ হিজরি) অন্য বর্ণনায় ৫০ হিজরি সনে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সুফইয়ান ইবন আউফ'র নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যে যুদ্ধাভিযান প্রেরণের জন্য বিশাল সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করলেন। পুত্র ইয়াযিদকে সেনা বাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ দিলেন। সে নানা টালবাহানার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে যেতে চাইলো না। তিনিও তার দিক থেকে মনোনিবেশ ফিরিয়ে নিলেন। সেনা বাহিনী সেখানে পৌঁছে খাদ্যাভাব ও নানা রোগের প্রকোপে কাবু হয়ে পড়লো। দামেশকে সেই দু:সংবাদ পৌঁছলে ইয়াযিদ আনন্দিত হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো-

তাদের এই বিপর্যয়ে বিচলিত নই আমি
কেননা উম্মে কুলসুম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে
উঁচু আসনে আছি উপবিষ্ট।

সেই উম্মে কুলসুম (কবিতায় উল্লিখিত) হলো তার স্ত্রী, আবদুল্লাহ ইবন আমির'র কন্যা। মুআবিয়া রাদিয়াআল্লাহু আনহুর কাছে ইয়াযিদ'র এই হঠকারি কবিতা আবৃত্তির সংবাদ পৌঁছলে তিনি কসম করে বললেন,

মুসলিম সেনারা সেখানে যে দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়েছে এর ভাগিদার হতে তাকে অবশ্যই সুফইয়ান'র বাহিনীর সাথে মিলিত হতে হবে। তিনি ইয়াযিদ'র নেতৃত্বে আরও একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। সে বাহিনীতে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমার, আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ির, আবু আইউব আনসারী ও আবদুল আযীয ইবন যুরারাহ আল কালাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। বাহিনী রোমান ভূখণ্ডে প্রবেশ করলো, এমনকি কন্সট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। সেখানে কয়েকদিন ধরে রোমান ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

[আল কামিল ফিত তারীখ, খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩১৪।]

ইমাম ইবনুল আছীর'র দেয়া এই বিবরণ সামান্য শাব্দিক তারতম্য এবং কম বেশিসহ ইসলামের ইতিহাসের মৌলিক সব কিতাবেই আছে। এ থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইয়াযিদ মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় সংবাদে আনন্দিত হয়েছিলো। সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যায়নি। বরং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু শাস্তি স্বরূপ তাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আর সেই যুদ্ধাভিযান রোমান সাম্রাজ্যে মুসলিম বাহিনী পরিচালিত প্রথম অভিযান ছিলো না। নির্ধারিতভাবে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সন্ট্যানটিনোপল প্রথম আক্রমণের কথা বলা হলেও সেই বাহিনীতে ইয়াযিদ ছিলো না। কারণ ৪৩ হিজরিতে সাহাবি বুসর ইবন আরতাহ (ওফাত ৮৬ হিজরি) রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে কন্সট্যান্টিনোপল প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। সুতরাং বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত ক্ষমা প্রাপ্ত সেই اول جيش বা প্রথম বাহিনী হলো বুসর ইবন আরতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নেতৃত্বাধীন বাহিনী।

উল্লেখ্য যে, ইয়াযিদ বন্দনায় মত্ত কথিত শায়খগণ ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ'র একটি বর্ণনাকে পুঁজি করে ইয়াযিদ বন্দনার রসদ খুঁজে পান। ৪৯ হিজরিতে কন্সট্যান্টিনোপল অভিযানের বিবরণ দিতে গিয়ে সুফইয়ান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীর সাহায্যার্থে পশ্চাদে প্রেরিত ইয়াযিদ'র নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কথা উল্লেখ করে ইমাম ইবনু কাছীর বলেছেন-

سنة تسع واربعين : فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعات من سادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري . وقد ثبت في صحيح البخاري ان رسول صلى الله عليه وسلم قال : اول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . فكان هذا الجيش اول من غزاها

অর্থাৎ ৪৯ হিজরি : এবছর ইয়াযিদ ইবন মুআবিয়া রোমান সাম্রাজ্যে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে। এমনকি সে কন্সট্যান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছায়। তার সাথে সম্মানিত সাহাবিদের একটি দলও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন আবদুল্লাহ ইবন উমার, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ির ও আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সহীহ বুখারীতে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রোম অধিপতি কায়সার'র শহরে প্রথম যে বাহিনী আক্রমণ করবে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত। আর এ বাহিনী ছিলো প্রথম যারা সেখানে প্রথম যুদ্ধ করেছে।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৪]

ইমাম ইবনু কাছীর'র এই বর্ণনা মতে ইয়াযিদ'র নেতৃত্বে পরিচালিত এ যুদ্ধ ছিলো রোম অধিপতি কায়সার'র শহরে মুসলিম বাহিনীর প্রথম যুদ্ধ। অথচ একই কিতাবে একটু আগে ইমাম ইবনু কাছীর নিজেই বলে এসেছেন-

سنة ثلاث واربعين : فيها غزا بسر بن ابي ارطاة بلاد الروم فتوغل حتى بلغ قسطنطينية

অর্থাৎ ৪৩ হিজরি : এবছর বুসর ইবন আবু আরতাহ রোমান সাম্রাজ্যে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এমনকি কন্সট্যান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছান।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৪]

পাঠক লক্ষ করুন! ইমাম ইবনু কাছীর *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* কিতাবের অষ্টম খণ্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন ৪৩ হিজরিতে বুসর ইবন আবু আরতাহ রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ করে কন্সট্যান্টিনেপল পর্যন্ত

পৌঁছান। অথচ একই কিতাবের একই খণ্ডের ৩৪ পৃষ্ঠায় বলছেন ৪৯ হিজরিতে ইয়াযিদ রোমান সাম্রাজ্যের কন্সট্যান্টিনোপলে প্রথম আক্রমণ করেছে। আপনারাই বলুন, ৪৩ হিজরির আক্রমণ প্রথম হবে নাকি ৪৯ হিজরির আক্রমণ প্রথম?

প্রশ্ন হলো ইমাম ইবনু কাছীর'র এ অসংলগ্ন বর্ণনার কারণ কী? উত্তরে বলা যায়, হয়তোবা তিনি অসতর্কতার কারণে এমন বর্ণনা করেছেন। কারণ বয়সের দিক বিবেচনায় তাঁর বহু আগের ইতিহাসবিদ, হাদীস বিশারদ ইমাম তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরি), ইমাম ইবনুল জাওযী (৫১০-৬৯৭ হিজরি) এবং ইমাম ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০ হিজরি) নিজ নিজ কিতাবে বলেছেন, ৪৩ হিজরিতে বুসর ইবন আরতাহ কন্সট্যান্টিনোপল শহরে আক্রমণ করেন। ইবনু কাছীর নিজেও একই বর্ণনা দিয়েছেন।

অন্যথায় ইমাম ইবনু কাছীর'র কিতাবে হয়তো তাহরীফ তথা ইচ্ছাকৃত রদবদল হয়েছে। যদিও আমাদের হাতে এখন পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ নেই যে, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* কিতাবে তাহরীফ হয়েছে। কিন্তু সমসাময়িককালে বিভিন্ন কিতাবে ইচ্ছাকৃত রদবদল বা নিজেদের ইজম প্রমাণের জন্য মনগড়া কথা জুড়ে দেয়ার অসংখ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তাই এমন সন্দেহ করাটা খুব একটা অমূলক হবে না যে, ইয়াযিদ ভক্ত কোন পক্ষ ইমাম ইবনু কাছীর'র কিতাবে এমন কথা জুড়ে দিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, রোম অধিপতি কায়সার'র শহর তথা কন্সট্যান্টিনোপলে মুসলিম বাহিনী প্রথম আক্রমণ করে ৪৩ হিজরিতে, সাহাবি বুসর ইবন আরতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে। আর ইয়াযিদ'র নেতৃত্বে ৪৯ হিজরিতে সপ্তম কিংবা অষ্টম আক্রমণ হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ক্ষমা প্রাপ্তির সুসংবাদ ইয়াযিদ'র জন্য নয়। বরং সাহাবি বুস্‌র ইবন আরতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নেতৃত্বাধীন বাহিনীর জন্য।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
লন্ডন

বদর দিবস : ইয়াওমুল ফুরকান

দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রামাদান, দিনটি ছিলো শুক্রবার। কুরআনে কারীমে দিনটিকে বলা হয়েছে *ইয়াওমুল ফুরকান*। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারি দিন। ইসলামকে চিরায়ত মযবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে এ দিনের ভূমিকা ছিলো অনন্য।

যুহুরে নবুওয়াত বা নবুওয়াত প্রকাশের পর নবীজি তেরো বছর মক্কা শরীফে অবস্থান করে দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এ সময়কাল ছিলো মুসলমানদের জন্য চরম ধৈর্য পরীক্ষার সময়। অবর্ণনীয় শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন মুখবুজে সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিরোধের অনুমতি ছিলো না, সামর্থও ছিলো নগন্য। হিজরতের পর পর *মীসাকে মদীনা* বা মদীনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কৌশল অবলম্বন করেন তাতে এই উম্মাহর সোনালী ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত হয়। মদীনা কেন্দ্রীক নগর রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনে মক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দ বিচলিত হয়ে পড়ে। অচিরেই নিজেদের বিনাশ আঁচ করতে পেরে তারা গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ায় যায়। মূল লক্ষ্য ছিলো বাণিজ্যের আড়ালে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করা। মক্কাবাসির দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত হয়ে নবীজি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে সমরাস্ত্রবাহী বাণিজ্যিক কাফেলাকে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মূলত: ইতোমধ্যে নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন। আয়াত নাযিল হয়েছে-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَقَدِير

অর্থাৎ তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, কেননা তারা নির্যাতিত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। (সূরা হাজ্জ আয়াত ৩৮)

চতুর আবু সুফিয়ান (মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।) বিপদ টের পেয়ে সাহায্য চেয়ে মক্কায় সংবাদ প্রেরণ করে। নিজেদের

কাফেলার সাহায্যার্থে আবু জাহল, উতবা ও উমাইয়্যার যৌথ নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা করে মক্কাবাসি। এদিকে আবু সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে নিরাপদে মক্কার দিকে চলতে থাকে। বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে আছে জানার পরও আবু জাহল এই বলে উসকানী দেয়, বেরিয়ে যখন এসেছি ওদের শায়েস্তা করে যাই ; যাতে আর কোন দিন আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস না করে।

মদীনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণে বদর নামক কূপের পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় পৌঁছে যোদ্ধা সাহাবিগণকে নিয়ে থামলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা মাঠ রেকি করলেন। উঁচু মত স্থানে স্থাপিত *আরীশ* বা ছাউনীতে অবস্থান করে রাতভর আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে রুণাজারি করলেন। ১৭ রামাদান শুক্রবার মুসলমানগণ ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে মুখোমুখি হলেন সংখ্যায় তিনগুণ বেশি মক্কার মুশরিক সেনা বাহিনীর। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মক্কাবাসির দর্প চূর্ণ হলো। কুরআনুল কারীমে আল্লাহপাক যথার্থই এদিনের নাম দিলেন *ইয়াওমুল ফুরকান* বা সত্য মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারি দিন।

একনজরে বদর যুদ্ধ

তারিখ: ১৭ রামাদান ২ হিজরি, ১৩ মার্চ ৬৩৪ ঈসায়ি, শুক্রবার।

স্থান: মদীনা তায়্যিবা থেকে দিকে ৮০ মাইল বা ১৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে বদর নামক কূপের পার্শ্ববর্তী উপত্যকা।

মুসলিম নেতৃত্ব: মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সামরিক শক্তি: সৈন্য ৩১৩ জন। ৭০টি উট ও ২টি ঘোড়া।

শহীদ ১৪ জন। ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার।

কাফির নেতৃত্ব: আবু জাহল, উতবাহ বিন রাবিআহ ও উমাইয়্যা বিন খালফ (তিন জনই সেদিন নিহত হয়)।

সামরিক শক্তি: সৈন্য ১০০০ জন। ১০০টি উট ও ২০০টি ঘোড়া।

নিহত ৭০ জন, বন্দী ৭০ জন।

বন্দীদের মধ্য ১৬ জন পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

কারা মরবে কোথায় মরবে

১৬ রামাদান বৃহস্পতিবার জানবাজ যোদ্ধা সাহাবিদের নিয়ে মাঠ রেকি করতে বেরিয়েছেন সেনাপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাঁটতে হাঁটতে মাটিতে দাগ দিয়ে দিয়ে বলে দিলেন, এখানে অমুক মরবে, ওখানে অমুক মরবে। কাফির নেতাদের যারাই সেদিন মারা গেছে কারো নামই বাদ পড়েনি।

এই যে আগের দিন বলে দিলেন পর দিন কে মরবে, কোথায় মরবে এগুলোকে গাইবের সংবাদ স্বীকার করা ছাড়া উপায় আছে? ঐতিহাসিক বর্ণনা, সিয়ারের রিওয়ায়াত ইত্যাদি বলে দুর্বল প্রতিপন্ন করার কোন উপায় নেই।

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদিনা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা বদরের আলোচনায় বলেন-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالامس،يقول: هذا مصرع فلان غدا انشاء الله

قال فقال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما اخطوءوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(صحيح مسلم 2:1209 رقم الحديث7402)

তরজমা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের দিন আমাদের বদরে নিহতদের নাম ধরে ধরে স্থান চিহ্নিত করে বলে দিলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ অমুক এই স্থানে মরবে, অমুক ওই স্থানে মরবে।

উমার বলেন, সেই সত্তার কসম! যিনি তাঁকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর দেখানো সীমা অতিক্রম করেনি।

(সহীহ মুসলিম, ২:১২০৯, হাদিস নম্বর৭৪০২)

বদর যুদ্ধে শহীদগণ

মুহাজির ৬ জন

১. সাফওয়ান বিন বাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু

২. আকিল বিন বুকায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহ

৩. উবাইদা বিন হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু

৪. উমায়ির বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

৫. মাহজাহ বিন সালিহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

৬. যুশশিমালাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু

আনসার ৮ জন

১. হারিছা বিন সুরাকা রাদিয়াল্লাহু আনহু

২. সা'দ বিন খাওলি রাদিয়াল্লাহু আনহু

৩. সা'দ বিন খাইসুমা রাদিয়াল্লাহু আনহু

৪. উমায়ির বিন হুমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু

৫. আউফ বিন আ'ফরা রাদিয়াল্লাহু আনহু

৬. মুবাশশির বিন আবদুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু

৭. মুআওয়িয বিন আ'ফরা রাদিয়াল্লাহু আনহু

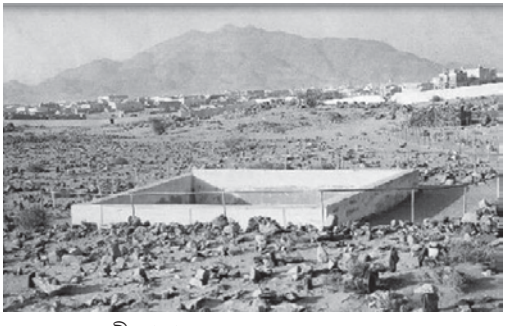
৮. ইয়াযিদ বিন হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু

৩ জুন ২০১৮



মসজিদে আরীশঃ বদর প্রান্তরের পূর্ব উত্তর দিকে একটু উঁচু মতো স্থানে নির্মিত আরীশ বা ছাউনিতে অবস্থান করে নবীজি রাতব্যাপী রুণাজারি করেছেন। পরদিন এখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

খলিফা উমার বিন আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ (৬১-১০১ হিজরি) মদীনা তায়্যিবার গভর্ণর থাকাকালীন (৮৬-৯৩ হিজরি) নবীজির পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করে রাখতে সেসব স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে আরীশ প্রথম নির্মিত হয় সেই সময়ে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এ মসজিদ সম্প্রসারিত হয়েছে।



বদর যুদ্ধে শহীদগণের কবর।



শহীদগণের নামফলক।

কদমবুছি নিয়ে কিছু কথা

পা-হাত, বুক-পিঠ কোন জায়গায় ছুঁয়ার সাথে সালামের কোন সম্পর্ক নেই। বুখারী-মুসলিমের যে হাদীস মিশকাতের কিতাবুল আদাবে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, (خلق الله آدم على صورته) যেখানে আদম আলাইহিস সালাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত ক্রমাগত তাঁর সন্তানদের সালামের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেই হাদীস কিংবা অন্য কোন হাদীসে সালামের সাথে হাত-পা বা অন্য কোন অঙ্গ ধরাধরির উল্লেখ নেই।

কদমবুছি বা পা ছুঁয়ে বরকত হাসিল করা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র একটি আমল। এটির সাথে সালামের কোন সম্পর্ক নেই। কোন আলিম কিংবা আলিম নামধারী ব্যক্তি যখন কদমবুছিকে পা ছুঁয়ে সালাম বলেন, নিজের অজান্তেই তিনি দু'টি বিষয় সামনে নিয়ে আসেন। প্রথমত: এর দ্বারা নিজের অজ্ঞতা ও চরম মুর্খতার পরিচয় দেন। দ্বিতীয়ত: একটি মুস্তাহাব কাজকে বিদআত, নাজায়িয বলার সুযোগ করে দেন।

মনে রাখবেন, আপনি যখনই মুস্তাহাব কাজ কদমবুছির নাম পা ধরে বা পা ছুঁয়ে সালাম বলবেন তখন কিয়ামত অবদি চেষ্টা করেও এটি জায়িয বলার কোন দলিল দেখাতে পারবেন না। হ্যাঁ, নরেন্দ্র মোদীর পা ছুঁয়া ছবি পোস্ট করে খিস্তি খেউড় করতে পারবেন, অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারবেন। কিন্তু এর দ্বারা কদমবুছির দলিল প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কদমবুছিকে আমরা সাধারণ সামাজিক রেওয়াজে পরিণত করে এই বিশেষ আমলটির বৈশিষ্টকে ধুলিস্যাত করে দিয়েছি। মনে রাখা দরকার যে, এটি যদি সালামের পর্যায়ের সুন্নাত হতো তবে সাহাবায়ে কিরাম সকাল সন্ধ্যা প্রতিনিয়ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কদমবুছি করতেন। হাদীসের কিতাবাদিতে সেভাবেই এর বর্ণনা পাওয়া যেতো। *আদাবুল মুফরাদ, আবু দাউদ, রিয়াদুস সালিহীন, মিশকাতুল মাসাবিহ* প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে কোন কোন সাহাবি নবীজির কদমবুছি করেছেন মর্মে যে হাদীসসমূহ পাওয়া যায়, গভীরভাবে দেখুন পরিষ্কার

বুঝবেন, এ কাজটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে, বিশেষ ব্যক্তিকে করার কাজ। যাকে তাকে ঢালাওভাবে করার কাজ নয়। এর বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। হাদীসের আলোকে উলামায়ে কিরাম এ কাজকে মুস্তাহাব বলেছেন।

আমাদের দেশে যারা ঢালাওভাবে কদমবুছিকে নাজায়িয, বিদআত এবং হিন্দুয়ানি রেওয়াজ বলেন, তাদের মধ্যে যারা নিজেদের দেওবন্দের অনুসারি বলে দাবি করেন তাদেরকে বলবো-মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতি কেফায়ত উল্লাহ, মুফতি শফি প্রমূখ বরেণ্য আলিমের কিতাব অন্তত: পড়ুন। (ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া পৃষ্ঠা ৪৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ৩৪৫, আত তাকাশশুফ পৃষ্ঠা ৪২৪, কিফায়াতুল মুফতি খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা ১১৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৩।) তাঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু কদমবুছিকে মুস্তাহাব বলেছেন। অবশ্য নিজেদের মান্যবর আকাবিরগণের ফতোওয়া মানতে যদি আপনাদের আপত্তি থাকে সে ভিন্ন কথা।

আর যারা সৌদি সালাফি শায়খদের ভক্ত অনুসারি তারা সৌদিআরবের শায়খ সালেহ আল উছাইমিন রচিত *রিয়াদুস সালিহীন* কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ খুলে দেখুন। চতুর্থ খণ্ডে পেয়ে যাবেন, সাফওয়ান বিন আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত কদমবুছি বিষয়ক হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খ উছাইমিন পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন,

الحاصل ان هذين الرجلين قبّلا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله ، فاقرهما على ذلك ، ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف والعلم ، وكذا تقبيل اليد والرجل من الأب والام وما اشبه ذلك ، لان هما حقاً ، وهذا من التواضع

شرح رياض الصالحين المجلد الرابع صحفة 451

তরজমা: সারকথা হলো, এ দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র হাত ও পায়ে চুমো দিয়েছেন আর তিনি তাতে সমর্থনও দিয়েছেন। এ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, ইলম ও সম্মানের দিক থেকে জ্যৈষ্ঠ

ব্যক্তির হাত এবং পায়ে চুমো দেয়া জায়িয। অনুরূপ প্রমানিত হয় যে, পিতা মাতা এবং সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের হাত পায়ে চুমো দেয়া জায়িয। আর এটি তাঁদের প্রাপ্য, এটা বিনয়ের প্রকাশ।

(শরহে রিয়াদুস সালিহীন খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪৫১)

মুস্তাহাব একটি কাজ আপনি করতে না চাইলে করবেন না। কোন সমস্যা নেই। তবে কোন মুস্তাহাব কাজকে বিদআত, নাজায়িয বলার অধিকার আপনার নেই। বিশেষ করে হাদীসে বর্ণিত একটি মুস্তাহাব কাজকে হিন্দুয়ানি রেওয়াজ বলে সাধারণ মানুষের আই ওয়াস করতে পারবেন ঠিকই, তবে ইলমি খিয়ানতের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না।

মূলত: সবকিছুকেই আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র ইজম এবং ইগো দ্বারা পরিমাপ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই দিন দিন ইখতিলাফের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে, অনৈক্যের দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে। শরীয়তের মানদণ্ড দিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে যাচাই করতে শুরু করলে চলমান অধিকাংশ ইখতিলাফ এমনিতেই খতম হয়ে যাবে।

(সম্প্রতি হুজুর টাইপ দু'তিন ব্যক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন এমন ছবি ফেইসবুকে পরিচিত- অপরিচিত কয়েকজন পোস্ট করে কদমবুছি বিরোধীদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে লিখেছেন, নরেন্দ্র মোদীর পা ধরে সালাম করলে জায়িয হয়; আর আমরা কোন বুযুর্গের পা ধরে সালাম করলে বিদআত হয়ে যায়। এসব লেখার প্রতিক্রয়ায় লিখিত।)

মীলাদুন্নবী বিষয়ে লিখিত কিতাবাদি

এক শ্রেণির চটি পুস্তকের লেখক এবং কিছু সংখ্যক বক্তার বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ জানতে পারে যে, মীলাদুন্নবী মাহফিল একটি নাজাইয কাজ। বলা হয়ে থাকে এক শ্রেণির পেটুক মোল্লা ও মুর্খ পীর মীলাদুন্নবী মাহফিল করে থাকে; কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে মীলাদুন্নবীর বৈধতার কথা পাওয়া যায় না। যেহেতু সাধারণ মুসলমান কিতাবাদি সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই ওয়াকিফ নয়, তাই তারা (কোন কোন ক্ষেত্রে) ধরে নেয় মীলাদুন্নবী মাহফিলের বৈধতা বিষয়ক কোন কিতাব হয়তো নেই। এ বিষয়ে নিকট ও দূর অতীত এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় রচিত কিতাবাদির রচয়িতাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কিতাবের নাম নিয়ে (আল্লাহ চাহেতো) একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রনয়ণের চেষ্টায় আছি; চলমান নিবন্ধ এরই অংশবিশেষ। মীলাদুন্নবী মাহফিলের বৈধতা, গুরুত্ব ও বরকত বিষয়ে যুগে যুগে ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ ও হাফিযে হাদীসগণ প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান কিতাবাদি রচনা করেছেন। এগুলোর কোনটি পদ্যে, কোনটি গদ্যে, কোনটি সংক্ষিপ্ত আবার কোনটি বৃহৎ। এসব কিতাব স্থান-কালের সীমানা ছাড়িয়ে দুনিয়ার দিকে দিকে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত। নিম্নে কয়েকজন ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁদের রচিত কিতাবের নাম সন্নিবেশ করা হলো।

১. ইমাম ইবনুল জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫১০-৫৯৭ হিজরি)

তাঁর পুরো নাম আবদুর রাহমান বিন আলী বিন মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাম্মাদী হাম্বলী। লকব ছিল জামালুদ্দীন। হিজরি ৫১০ সালে বাগদাদে তাঁর জন্ম হয়, ৫৯৭ সালে সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস। ইলমে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, পরবর্তীকালে ইলমে হাদীসের ইমামগণ তাঁকে শিরোতাজ হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা ১৫৯; অধিকাংশ হাদীস ও ইতিহাস বিষয়ক। মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *আল্ মাওলুদুল আরূছ*।

২. ইমাম ইবন দেহইয়া কালবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫৫৪-৬৩৩ হিজরি)

৫৫৪ হিজরিতে আন্দালুসে (বর্তমান স্পেন) জন্মগ্রহণ করেন ইবনে দেহইয়া। তাঁর পূর্ণ নাম- আমর বিন হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আবুল খাত্তাব ইবনে দেহইয়া। তিনি ইলমের অন্বেষায় সিরিয়া, ইরাক, খুরাসান সফর করেন। শেষ পর্যন্ত মিশরে অবস্থান করে ইলমের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের বরেণ্য মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবেত্তা। হিজরি ৬৩৩ সালে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *আততানভীর ফী মাওলিদিস্ সিরাজিল মুনীর*।

৩. ইমাম ইবন আবদুল্লাহ আল জাযারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তিকাল: ৬৬০ হিজরি)

পুরো নাম- আবুল খায়ের শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল জাযারী শাফিঈ। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কিত তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবে হিজরি ৬৬০ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইলমে কিরাতের ইমাম।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *উফুত্ তা'রীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ*।

৪. ইমাম ইবন কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তিকাল: ৭৭৪ হিজরি)

দুনিয়ার নানা ভাষায় অনুদিত ও বহুল পঠিত *তাফসীরে ইবনে কাসীর* এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ *আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া*'র রচয়িতা ইমাম ইবন কাসীর। তাঁর পুরো নাম আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল বিন আমর বিন কাসীর। ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম, মুফতী, বহুজ্ঞানে সুপণ্ডিত এবং ইলমে হাদীসে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম ইবন

হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কথা লিখতে গিয়ে বলেন, তিনি আসমাউর রিজাল বিষয় অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। জীবদ্দশায়ই তাঁর লেখনির খ্যাতি দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হিজরি ৭৭৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *মাওলিদু রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*। এ কিতাব খানা ১৯৯৯ সালে বঙ্গানুবাদ করেছেন আমেরিকা প্রবাসী হাফিয মাওলানা আইনুল হুদা।

৫. ইমাম হাফিয ইরাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭২৫-৮০৮ হিজরি)

তাঁর পুরো নাম আবদুর রাহীম বিন হুসাইন বিন আবদুর রাহমান। তিনি হাফিয ইরাকী নামে খ্যাত। এ মহামনীষী হিজরি ৭২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল আবুল ফদল যাইনুদ্দীন। ইলমে হাদীসের সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখেন এমন ব্যক্তির কাছে হাফিয ইরাকীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অবকাশ রাখে না। তিনি সুন্নতে নববী তথা ইলমে হাদীসের সংরক্ষক এবং দ্বীনের স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হতেন। হাদীসের রিওয়াইয়াত, উসূল ও কাওয়াঈদের সনদ হিসেবে হাফিয ইরাকী বলেছেন এতটুকু উল্লেখই যথেষ্ট। হিজরি ৮০৮ সালে এ মহান ইমাম হাফিযে হাদীস ইন্তিকাল করেন।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *আল মাওরিদুল হানী ফিল মাওলিদি সুন্নী*।

৬. ইমাম হাফিয ইবন নাসিরুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৭৭-৮৪২ হিজরি)

৭৭৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণকারী এ মহান হাফিযে হাদীসের পুরো নাম- মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর বিন আবদুল্লাহ আল কায়সী দামেশকী। দামেশকের আল আশরাফিয়্যা দারুল হাদীসে তিনি ছিলেন শাইখুল হাদীস। ইমাম সূয়তী তাঁর ব্যাপারে আলোচনায় বলেন, তিনি দামেশকের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও নির্ভরযোগ্য

ইতিহাসবেত্তা ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য কিতাবের রচয়িতা এ মহান ইমাম ৮৪২ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত তিন খানা কিতাবের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমটি ৭ খণ্ডে সমাপ্ত, বাকী দু'খানা সংক্ষিপ্ত।

১. *জামিউল আছার ফী মাওলিদিন নাবিয়্যিল মুখতার* (৭ খণ্ড)

২. *আল লাফযুর রায়িক ফী মাওলিদি খাইরিল খালাইক*

৩. *মাওরিদুস্ সাদী ফী মাওলিদিল হাদী*

৭. ইমাম সাখাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৮৩১-৯০২ হিজরি)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আলী কাহিরী। তিনি ৮৩১ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইবন ফাহদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- মুতাআখখিরীন হাফিযে হাদীসগণের মধ্যে তাঁর মতো বড় মাপের আলিম দেখিনি। হাদীসের মতন, আসমাউর রিজাল, জারহ ও তা'দিল ইত্যাদি ইলমে তাঁর পারদর্শীতা ব্যাপারে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, এ সমুদয় বিষয়ে তিনিই সনদ ছিলেন। হিজরি ৯০২ সালে মদীনা শরীফে এ মহান ইমাম ইন্তিকাল করেন।

হাজী খলীফার ভাষ্যমতে মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাবের নাম- *মাওলিদুন্নবী*।

৮. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৮৪৯-৯১০ হিজরি)

তাঁর পুরো নাম আবদুর রাহমান বিন আবু বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন সাকীবুদ্দীন সুয়ূতী। তিনি ৮৪৯ হিজরি সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। এ মহান ইমামকে নতুন করে পরিচয় করে দেয়া বাতুলতা মাত্র। তাঁর ইলমী অবস্থান সর্ব মহলে সূর্যের ন্যায় ব্যাপ্ত ছিল বলে *জালালুদ্দীন* উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর রচিত কিতাব সংখ্যা সাতশ পর্যন্ত পৌছে। শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ কিতাবগুলো দুনিয়ার সর্বত্র প্রামাণ্য হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে

সরকারি ও কওমী মাদরাসাগুলোতে তাঁর কিতাব এখনো পাঠ্যভুক্ত। এমনকি কওমী মাদরাসাগুলোতে *জালালাইন* নামে একটি ক্লাশের নামই আছে। ৯১০ হিজরি সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *হুসনুল মাকসিদ ফী আমালিল মাওলিদ*।

মাথিউরা সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা ছালিক আহমদ এ রিসালা খানা বাংলায় তরজমা করেছেন। ২০১০ সালে এটা প্রকাশিত হয়েছে।

৯. ইমাম ইবন হাজার মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তিকাল: ৯৭৪ হিজরি)

তাঁর পুরো নাম- আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হাজার আল হাইতামী আল মাক্কী। শাফিঈ মাযহাবের উজ্জল নক্ষত্র এ মহান ইমামের জন্ম সন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই; তবে ৯৭৪ হিজরি সালে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তিনি ছিলেন *ইমামুল হারামাইন*। একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, ফকীহ, এমনকি মুজতাহিদ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে রচিত জগত খ্যাত কিতাবাদি রয়েছে।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *তাহরীরুল কালাম ফিল কিয়াম ইনদা যিক্‌রি মাওলিদি সায়্যিদিল আনাম*।

১০. ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তিকাল: ১০১৪ হিজরি)

তাঁর পুরো নাম- নূরুদ্দীন আলী বিন সুলতান বিন মুহাম্মাদ আল হারাবী আল মাক্কী। তাঁর সঠিক জন্মসন আমাদের জানা নেই, তবে ১০১৪ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন। হানাফী মাযহাবের উজ্জল এ নক্ষত্র একাধারে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসির ও সূফী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত কিতাবের সংখ্যা ১২৫। তাঁর ইলমী গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপারে নতুন করে আলোচনার অবকাশ নেই। তিনি

ছিলেন মুজতাহিদ ইমাম।

মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *আল মাওরিদুর রাবী ফী মাওলিদিন নাবাওয়ী*।

১১. ইমাম বরযিনজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তিকাল: ১১৭৭ হিজরি)

তাঁর পুরো নাম- সায়্যিদ জাফর বিন হাসান বিন আবদুল করীম বরযিনজি। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। ইন্তিকালের সন নিয়েও কিছু মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে ১১৭৭ হিজরি। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও মদীনা শরীফের মুফতিয়ে আযম। তিনি দীর্ঘ দিন মসজিদদে নববীর ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবের নাম- *ইকদুল জাওহার ফী মাওলিদিন নাবিয়্যিল আযহার*।

এ কিতাবখানা আরব ও আজমের সর্বত্র ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে। আমাদের দেশে *বরযিনজী শরীফ* নামে পরিচিত তাঁর এ কিতাবখানা ব্যাপকভাবে পঠিত। এ কিতাবের মকবুলিয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ- দুনিয়ার নানা দেশের লক্ষ লক্ষ আশিকে রাসূল মুসলমান মুখস্ত করে নিয়েছে এ কিতাব।

হিজরি ৫১০ থেকে প্রায় ১২শ সাল পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীর কয়েকজন মহান ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও মীলাদুন্নবী বিষয়ে তাঁদের রচিত কিতাবাদির নাম উল্লেখ শেষে আমরা শ্রদ্ধেয় পাঠকের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। যেমন- উল্লিখিত মুজতাহিদ ইমাম, হাফিযে হাদীসগণ কি *পেটুক মোল্লা* কিংবা *মূর্খপীর* এর পর্যায়ে পড়েন? তাঁরা কেউ কি সুন্নাত ও বিদ্আত এর পার্থক্য বুঝতেন না? নাকি তাঁরা জেনে শুনেই নাজায়িয আমলকে জায়িয বলে কিতাব লিখে গেলেন? আজকের দিনের যে কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলিমের চেয়ে ইসলামের হুকুম আহকামের জ্ঞান তাঁদের কি কম ছিল? তাঁরা কি দ্বীনের সংরক্ষক ছিলেন নাকি দ্বীন ধ্বংসকারী ছিলেন? তাঁরা কি ইসলামী সংস্কৃতি ও খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতির

ইতিহাস ও পার্থক্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন? উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজলে আমাদের সামনে সত্যটি সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উল্লেখ্য মীলাদুন্নবী মাহফিল মুস্তাহাব-মুস্তাহসান কাজ। কিন্তু যখনই একপক্ষ এসব মাহফিলকে নিন্দনীয় বিদআত বলার চরম পন্থা অবলম্বন করলেন, অপরপক্ষও তখন একে মুস্তাহাব-মুসতাহসান না রেখে ফরয ওয়াজিবের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন।

লক্ষনীয় যে, সব বিষয়ে, সর্বাবস্থায় চরমপন্থা বর্জনীয়। ইসলাম চরমপন্থা সমর্থন করে না। চরমপন্থা যে বিপত্তি ডেকে আনে তা ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত সত্য।

দূরে থেকো দূরে রেখো

প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগ চলছে এখন। দূরকে কাছে এনে দিচ্ছে, অজানাকে জানার সুযোগ করে দিচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। ফলে সমাজে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। মানুষ আলোর সন্ধান লাভ করছে যেমন, ঠিক তেমনি অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত হচ্ছে দিনকে দিন।

অপরাপর বিষয়ের মতো ভার্চুয়াল জগতে ব্যাপকহারে ইসলাম চর্চা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। অশান্ত এ পৃথিবীতে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিকল্প নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, প্রযুক্তি নির্ভর প্রচারণায় ইসলামের মৌলিক সে শিক্ষা ব্যাপকভাবে উপক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রান্তিক মতবাদ কিংবা অভিমত ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে ব্যাপকভাবে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে চলে আসা বিভিন্ন মিমাংসিত বিষয়ে মানুষকে সন্দেহের ঘুর্ণাবর্তে ফেলে প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ফলে মুসলমানের ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইসলাম। অভিনব যুক্তি আর চমকপ্রদ উপস্থানায় আকৃষ্ট হয়ে দেশে দেশে মুসলিম যুবসমাজ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এই সার্বিক বিপর্যয়ের মুখে করণীয় সম্পর্কে ভাবছিলাম গভীরভাবে। এরই মাঝে সামনে এলো একটি হাদীস। চমকে দিলো ভাবনাকে। সেই মুবারক হাদীসখানার সূত্র ধরে এ লেখার অবতারণা। হাদীসখানা ইমাম হাকীম রাহিমাহুল্লাহ'র *আল মুসতাদরাক*সহ অন্যান্য কিতাবে আছে। কিন্তু এখানেও আছে বিপদ। প্রান্তিকতার বিষাক্ত ছোবল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোন হাদীস বুখারী-মুসলিমে না থাকলে সেটিকে হাদীস হিসেবে মেনে নিতে অনেকে প্রস্তুত নয়। আশা জাগানিয়া বিষয় হলো আলোচ্য হাদীসখানা ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ২৬১ হিজরি) নিজ সহীহ মুসলিমে মুকাদ্দিমা বা ভূমিকা অংশে গ্রন্থিত করেছেন। এবার হাদীসখানা দেখে নিই।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ اُمَّتِي اُنَاسٌ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُم فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ

তরজমা : হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্য হতে আখেরি যামানায় এমনসব মানুষ আবির্ভুত হবে, তারা তোমাদের সামনে এমনসব বয়ান পেশ করবে যা তোমরা তো শুননি তোমাদের বাপ দাদারাও শুনেননি। তোমরা তাদের থেকে দূরে থেকো এবং তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে রেখো।

পাঠক! বর্তমান বাস্তবতার সাথে চিরসত্যবাদী রাসূলের ফরমান মিলিয়ে দেখুন। কি চরম সত্য। প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তে কত অভিনব বয়ান শুনছি আমরা। যা আগে কখনো শুনা যায়নি। যাদের বাবা এখনো জীবিত আছেন একটু জিজ্ঞেস করুন তো, তিনি স্বীকার করবেন তাঁর বাবাও এমন বয়ান শুনেননি।

আসুন আমরা রাসূলের দেখানো পথে চলি। তাঁর নির্দেশনা হলো- তোমরা এই অভিনব বয়ানকারীদের থেকে দূরে থেকো এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রেখো।

১৭ মে ২০১৭
লন্ডন

মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ'র নসিহত
আল্লাহ এবং রাসূল হতে চেয়ো না

একদা এক ব্যক্তি মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে আরয করলেন, আমাকে কিছু নসিহত করুণ। মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহ নসিহত করলেন- কখনো আল্লাহ এবং রাসূল হতে চেয়ো না।

এটি কিভাবে সম্ভব যে, একজন মানুষ আল্লাহ এবং রাসূল হতে চাইবে? অবাক বিস্ময়ে লোকটি জানতে চাইলো। বললেন, আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা তিনি যা চান তাই হয়, যেভাবে চান সেভাবেই হয়। কোন মানুষ যখন চায় সবকিছু তার ইচ্ছে মতো হবে। কোন কিছুই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবে না, তখন পরোক্ষভাবে সে নিজেকে আল্লাহর সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। সুতরাং সবকিছুতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিজের মর্জির অনুকূলে সবকিছু করতে চাওয়া পক্ষান্তরে আল্লাহ হতে চাওয়ার নামান্তর।

অপর দিকে রাসূলই একমাত্র সত্ত্বা যার সাথে দ্বিমত পোষণ করা কুফরি। কোন মানুষের মধ্যে যখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আমি যা জানি একমাত্র তাই সঠিক। যে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে সেই গোমরাহ। আমার মানহাজ, আমার মসলক, আমার মাযহাব যে মানবে না সেই কাফির। এমন যে ব্যক্তি মনে করে পক্ষান্তরে সে নিজেকে রাসূল সাব্যস্ত করতে চায়।

বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে কী প্রতিভাত হয়? আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিমণ্ডলে চরম কর্তৃত্ববাদি। এই কর্তৃত্ববাদি মনোভাব আমাদের পরোক্ষভাবে আল্লাহ হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করছে। ফলে সামাজিক রাজনৈতিক অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যতক্ষণ আমরা নিজেদের পরোক্ষভাবে রাসূলের আসনে রাখবো অনৈক্য আর অশান্তি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে।

সুতরাং আসুন, মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহিমাহুল্লাহর নসিহত মেনে নিয়ে প্রত্যেকে আল্লাহ ও রাসূল হওয়ার প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসি।

১২ জুলাই ২০১৯
লন্ডন

সতর্কতা

প্রিয় মাতৃভাষায় যারা ইসলাম চর্চা করেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (সা.), (দ) ইত্যাদি সংকেত দিয়ে দুরূদ হয় না। আমরা দীর্ঘ লেখায় সবই লিখতে পারি কেবল সা. রা. রাহ. এসব সাংকেতিক। কিন্তু কেনো? কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছি?

আগে পরে সব ঠিক থাকে কেবল এই শব্দ বা বাক্যগুলোতে এলে কালি ফুরিয়ে যায় নাকি হাত ব্যথা করে?

মৃত্যু সংবাদে দেখা যায় দীর্ঘ সংবাদের খুঁটিনাটি সব ঠিক আছে। কেবল ইন্না..... রাজিউন। কিন্তু কেনো?

যারা লেখার এই প্রথা শুরু করেছিলো তারা কিন্তু ভেবে চিন্তে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে তুলতে সুচতুরভাবেই তা করেছিলো। আমরা অবচেতন মনে সে তাচ্ছিল্যকে বয়ে বেড়াচ্ছি। ছড়িয়ে দিচ্ছি।

তাই আসুন শুরু করি-যখন প্রিয় নবীর মুবারক নাম কিংবা লকব লিখি তখনই *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* পূর্ণ লিখি।

পূর্ণাঙ্গ দুরুদ শরীফ লেখার ফযিলত সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে,

عن ابي هريرة رَضِيَ الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى عليّ في كتاب لم تزل الملاءكة تستغفر له ما دام في ذٰلك الكتاب

ভাবানুবাদ : আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ লিখে রাখবে যতদিন সে লেখা অক্ষত থাকবে ততদিন ফিরিশতাগণ তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবেন।

(আল মু'জামুল আওসাত ২:২৩২, মাজমাউয যাওয়াঈদ ১:১৩৬, আততারগীব ওয়াত তারহীব ১:৬২, মীযানুল ই'তিদাল ২:৩২, লিসানুল মীযান ২:২৬, তাদরীবুর রাওয়ী ২:৭৪, আদাবুল ইমলা ১:৬৪।)

অনুরূপ সাহবীর নামের সাথে *রাদিয়াল্লাহু আনহু*, আইম্মা- সালিহীনের নামের সাথে *রাহমাতুল্লাহি আলাইহি* কিংবা *রাহিমাহুল্লাহ* পূর্ণ করে লিখি। সতর্কতার সাথে চেষ্টা চালিয়ে গেলে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। চলুন আজই শুরু করি।

২২ এপ্রিল ২০১৮

লন্ডন


জীবনালেখ্য

ইমাম মাতুরিদী রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর গ্রন্থাবলী

সূচনা : মাযহাবের অনুসারী মুসলমানগণ ফিকহের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল রাহিমাহুমুল্লাহ'র। তেমনি আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাত'র অনুসারীগণ আকাঈদ'র ক্ষেত্রে ইমাম মাতুরিদী এবং ইমাম আশআরির রাহিমাহুমাল্লা'র অনুসারী।

হানাফী মাযহাবের অনুসারী সুন্নী মুসলমানগণ শতভাগই আকাঈদ'র ক্ষেত্রে ইমাম মাতুরিদী'র অনুসরণ করেন। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো,ইমাম মাতুরিদীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে তেমন আলোচনা হয় না বললেই চলে। তাই সাধারণ মানুষ নিজেদের এক মহান ইমাম সম্পর্কে অন্ধকারেই থেকে যান। চলমান নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইমাম মাতুরিদীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মধ্য এশিয়ার স্বাধীন দেশ উজবেকিস্তানের অন্তর্গত ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের চারণ ভূমি সমরকন্দ'র মাতুরিদ মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন ইমাম মাতুরিদী। তাঁর পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমুদ আবু মানসুর আল মাতুরিদী। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট কোন বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে জীবনীকারগণ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ঘাটাঘাটি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিল'র খিলাফতকাল ২৩২-২৪৭ হিজরির মধ্যবর্তী কোন এক সময় ইমাম মাতুরিদী জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার ২৪৮ হিজরিতে ইমাম মতুরিদী জন্মগ্রহণ করেছেন বলে কোন কোন সূত্রে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। যুগের মুজাদ্দিদ ইমাম মাতুরিদী অনেক লকব বা উপাধিতে ভুসিত ছিলেন। তন্মধ্যে *আ'লামুল হুদা*,*মুসাহিহু আকাঈদিল মুসলিমীন*, *ইমামুল মুতাকাল্লিমীন*, *ইমামু আহলুসসুন্নাহ* ইত্যাদি।

তৎকালীন সময়ে *মাওয়ারাউন নাহর* তথা মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আকাঈদ, দর্শন, ইতিহাস, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান আলিম।

ইমাম আবদুল কাদির কুরাশি রাহিমাহুল্লাহ *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা* কিতাবে ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদী রাহিমাহুল্লাহর কয়েকজন উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন মুকাতিল আররাযি (ওফাত:২৮৪ হিজরি), ইমাম নুসায়ির ইবন ইয়াহইয়া আল বালাখি (ওফাত: ২৬৮ হিজরি), ইমাম আবু বাকর আহমাদ ইবন ইসহাক আল জুযজানি, ইমাম আবু নাসর আহমাদ ইবন আইয়াদি (ওফাত : ৩০১ হিজরি), ইমাম আবু আওসাজা তাওবাহ ইবন কুতাইবা আল হুজাইমি রাহিমাহুমুল্লাহ।

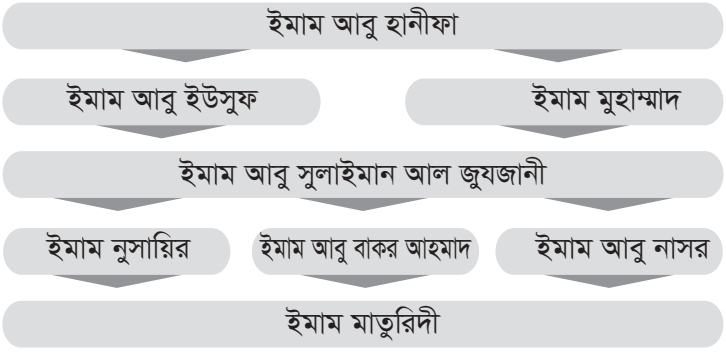
ইমাম মাতুরিদী প্রায় ৮৫ বছর জীবন কালের অধিকাংশ সময় শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান এবং লেখালেখিতে ব্যয় করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এমন ব্যক্তি ছিলেন, দুনিয়ার দেশে দেশে যাদের ইলমের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। যেমন- হাকিম সমরকন্দী নামে মশহুর ইমাম আবুল কাসিম ইসহাক ইবন মুহাম্মাদ (ওফাত : ৩৪২ হিজরি), ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল কারীম ইবন মূসা ইবন ঈসা আল বাযদাওয়ী(ওফাত: ৩৯০ হিজরি)। তিনি হলেন *উসূলে বাযদাওয়ী* প্রণেতা ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবন মুহাম্মাদ আল বাযদাওয়ী'র দাদা।

ইমাম মাতুরিদী তাঁর সময়ে ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ইলমের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইমাম আযমের সাথে তাঁর অনেকগুলো অবিচ্ছেদ্ধ সনদ পরম্পরা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র সনদ উল্লেখ করা হলো।

ইমাম মাতুরিদী'র তিনজন উস্তাদ ইমাম নুসায়ির ইবন ইয়াহইয়া, ইমাম আবু বাকর আহমাদ ইবন ইসহাক ও ইমাম আবু নাসর আহমাদ ইবন আইয়াদি। এই তিনজনের উস্তাদ ইমাম আবু সুলাইমান ইবন মূসা আল

জুযজানী (ওফাত : ২০০ হিজরি)। তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ (ওফাত : ১৮৬ হিজরি) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান (ওফাত: ১৮৯ হিজরি)। তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা (ওফাত : ১৫০ হিজরি) রাহিমাহুমুল্লাহ।

নকশা



শায়খ ড. আহমাদ সা'দ দামনুরী প্রণীত ইমাম মাতুরিদী'র জীবনী গ্রন্থে বিভিন্ন গবেষকের মতামতের আলোকে বলেছেন, এ যাবতকালে ইমাম মাতুরিদীর জীবনী সম্পর্কে যারা আলোচনা করেছেন সবাই একমত যে, তিনি ৩৩৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। তবে নিকট অতীতে ভারতের একজন বিশ্বখ্যাত আলিম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী এবং মিশরের গবেষক আলিম আবু যাহরা'র মতে ৩৩২ হিজরিতে ইমাম মাতুরিদী ইন্তিকাল করেন। সমরকন্দ শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত *জাকিরযিদাহ* নামক বিখ্যাত কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। সমরকন্দের বেশিরভাগ উলামা মাশায়েখ, আউলিয়ায়ে কিরামের কবর রয়েছে এই কবরস্থানে।

গ্রন্থাবলী

ইমাম মাতুরিদী রাহিমাহুল্লাহ তাফসীর, আকাঈদ, ফিকহ ও উসুল ইত্যাদি বিষয়ে ছোট বড় অনেক কিতাব প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে কিছু

প্রকাশিত হয়েছে, কিছু এখনো হয়নি। এছাড়া কিছু কিতাব এমন আছে কোন কোন সূত্রে যেগুলো ইমাম মাতুরিদী প্রণীত বলে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা প্রমাণিত নয়।

ইমাম মাতুরিদী প্রণীত প্রকাশিত, অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. তাফসীর

ইমাম মাতুরিদী'র সবচেয়ে বিখ্যাত কিতাব হলো تفسير القران العظيم المسمي تأويلات أهل السنة ইমাম মাতুরিদী'র এ তাফসীর গ্রন্থখানি সাধারণ তাফসীরের নিয়মে নয় বরং ভিন্ন আঙ্গিকে রচিত। *তাফসীর* এবং *তাওয়ীলের* মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্য আলিমগণ অবহিত আছেন। ইমাম মাতুরিদী তাঁর এ কিতাবে *তাওয়ীল*কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

শায়খাহ ফাতিমা ইউসুফ আল খাইমী'র তাহকীক সম্বলিত ইমাম মাতুরিদী'র পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত এ কিতাবখানা বৈরুতের মুআসসাসাতুর রিসালাহ থেকে ১৪২৫ হিজরি মুতাবেক ২০০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া শায়খ ড. মাজদি বাসলূম'র তাহকীক সম্বলিত ইমাম মাতুরিদী'র তাফসীর গ্রন্থ বৈরুতের দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. আকাঈদ

ক. আকাঈদ বিষয়ে ইমাম মাতুরিদী'র বিখ্যাত কিতাব كتاب التوحيد واثبات الصفات এ কিতাবখানার অন্য নাম হলো التوحيد মূলত: ইলমুল কালাম তথা আকাঈদ বিষয়ে ইমাম মাতুরিদী'র চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে এ কিতাবটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত উসূলবিদ ইমাম বাযদাওয়ী (৪২১-৪৯৩ হিজরি) তাঁর কিতাব اصول الدين এর মুকাদ্দিমায় ইমাম মাতুরিদী'র কিতাবুত তাওহীদ সম্পর্কে বলেন-

ان كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق وتطويل، وفى ترتيبه تعسير ولو لا ذلك لا كتفينا به

অর্থাৎ শায়খ আবু মানসুর প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ অনেকটা সহজবোধ্য এবং সংক্ষিপ্ত। তবে বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা আছে। যদি তা না থাকতো তবে এ কিতাবই যথেষ্ট ছিলো।

ইমাম বাযদাওয়ী'র মূল্যায়নের সারকথা হলো,আসলুসসুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মৌলিক কিতাব হিসেবে ইমাম মাতুরিদী'র কিতাবুত তাওহীদই যথেষ্ট। যদিও বিন্যাসগত জটিলতার কারণে বুঝতে কিছুটা বেগ পেতে হবে।

এক খণ্ডে সমাপ্ত এক হাজার দশ পৃষ্ঠার এ কিতাব বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে শায়খ ড. ফাতহুল্লাহ খালীফ'র তাহকীক সম্বলিত *কিতাবুত তাওহীদ* প্রকাশিত হয়। তুরস্কের দুই প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর ড. বকর তুবালাওগিলি ও ড. মুহাম্মাদ আরওয়িশি'র সম্পাদনা ও টীকা সম্বলিত *কিতাবুত তাওহীদ* ২০০৪ সালে বৈরুতের দার সাদির এবং ইস্তাম্বুলের মাককাবাতুল ইরশাদ থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে।

খ. كتاب المقالات আকাঈদ বিষয়ে লিখিত এই কিতাবের নাম *হাজী খলীফা কাশফুযযুনূন* (২:১৭৮২) এ উল্লেখ করেছেন। কিতাবখানা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি।

গ. كتاب بيان اوهام المعتزلة ইমাম মাতুরিদী এই কিতাবে মু'তাযিলা ফিরকার বিভিন্ন বাতিল আকীদা খণ্ডন করেছেন। *তারীখু আদাবিল আরাবি* (১:৪২) এবং *হাদিয়াতুল আরিফিন* (২:৩৬) এ এমনটিই উল্লেখ আছে। তবে কিতাবখানা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি।

ঘ. كتاب رد تهذيب الجدل للكعبي

ঙ. كتاب رد اواءل الأدلة للكعبي

চ. ردكتاب الكعبي في وعيد الفساق

উল্লিখিত তিনটি কিতাব ইমাম মাতুরিদী লিখেছেন তাঁর সময়কালে বলখ এর অধিবাসি মু'তাযিলা ফিরকার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বহুগ্রন্থ প্রণেতা শায়খ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মাহমুদ আল কা'বী (২৩৭-৩১৯ হিজরি) প্রণীত মু'তাযিলা আকীদার বিভিন্ন কিতাবের জবাবে।

তারীখু আদাবিল আরাবি, *হাদিয়াতু আরিফিন*, *কাশফুযযুনূন* ও *আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা* প্রভৃতি কিতাব থেকে ইমাম মাতুরিদী প্রণীত উল্লিখিত কিতাবগুলোর নাম এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা যায়। তবে প্রকাশনা বিষয়ক কোন তথ্য জানা যায় না।

৩. উসূলে ফিকহ

ক. كتاب مأخذ الشرائع

খ. الجدل في أصول الفقه

ইমাম মাতুরিদী প্রণীত উসূলে ফিকহ বিষয়ক উল্লিখিত কিতাব দু'টি প্রকাশিত হয়েছিলো কি না জানা যায় না। তবে ইমাম মাহমুদ ইবন যায়িদ আল লামিশী আল হানাফী মাতুরিদী (ওফাত: ৫২২ হিজরি) তাঁর كتاب في أصول الفقه এ ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী প্রণীত উল্লিখিত দু'টি কিতাব থেকে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। বলা চলে, ইমাম লামিশী'র কিতাবে ইমাম মাতুরিদী'র দুই কিতাবের সারসংক্ষেপ রক্ষিত হয়েছে।

শায়খ আবদুল মাজিদ তুর্কি'র তাহকীক ও টীকা সম্বলিত ইমাম লামিশী'র কিতাবখানা ১৯৯৫ সালে বৈরুতের দারুল গারব আল ইসলামি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

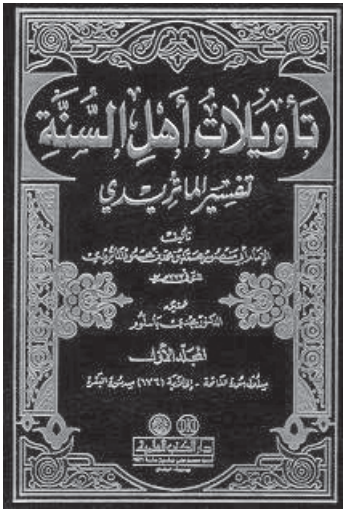
উপরে আলোচিত গ্রন্থাদি ছাড়াও ইমাম মাতুরিদী রাহিমাহুল্লাহ'র ফার্সি ভাষায় একটি ও আরবি ভাষায় আরোও কয়েকটি কিতাব রয়েছে।

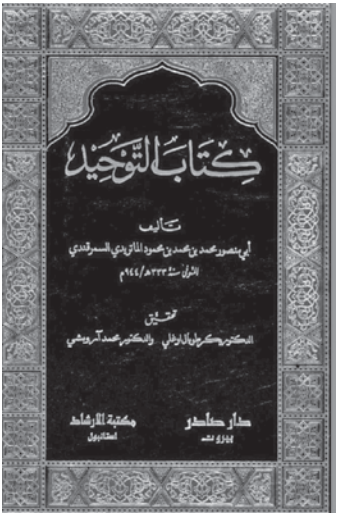
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

লন্ডন



ইমাম মাতুরিদী রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার কমপ্লেক্স, সমরকন্দ, উজবেকিস্তান।





প্রকাশিত দু'টি কিতাবের প্রচ্ছদ চিত্র।

সূফি কবি শিতালং শাহ রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর রচনাবলি

বৃহত্তর সিলেটের মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারায় গভীর শ্রদ্ধার সাথে যাদের স্মরণ করা হয় তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সূফি কবি শিতালং শাহ রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ সলীমুল্লাহ। *শিতালং* হচ্ছে তখল্লুস বা মুর্শিদ প্রদত্ত ফকিরী নাম। শিতালং শাহ'র পিতা মুনশী জাঁহা বখশ আলী। মাতা সুরতজান বিবি।

শিতালং নামকরণের প্রেক্ষাপট

শিতালং ফার্সি শব্দ। অর্থ পায়ের গোড়ালির গোলাকৃতির হাঁড়। সলীমুল্লাহ স্বীয় উস্তাদ ও মুর্শিদ শাহ আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ'র একনিষ্ঠ খাদিম ছিলেন। শাহ সাহেবের ডান পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা লেগে থাকতো প্রায়ই। ব্যথার জায়গায় হাত বুলিয়ে দিলে কিছুটা আরাম বোধ করতেন। সলীমুল্লাহ প্রায় সময়ই মুর্শিদের গোড়ালিতে হাত বুলিয়ে দিতেন। একদিন শাহ সাহেব বললেন- তু *শিতালংয়ে মন সুদি* অর্থাৎ তুমি আমার শিতালং বা গোড়ালির হাঁড় হয়ে গেছো। সেই থেকে সলীমুল্লাহ হয়ে গেলেন *শিতালং*।

(মুহতারাম ওয়ালিদ কিবলা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহ এর মৌখিক বর্ণনা।)

জনশ্রুতি মতে শিতালং শাহ'র পিতা জাঁহাবখশ আলী ঢাকার নবাব বংশের লোক ছিলেন। পারিবারিক বানিজ্য উপলক্ষে নৌপথে তিনি এ অঞ্চলে আসেন। কিন্তু নৌকা ডুবিতে বানিজ্য দ্রব্যাদি হারিয়ে তিনি খিত্তাশিলচরের জমিদার মীর মাহমুদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব বংশের সন্তান জাঁহাবখশ আলীর গুণে মুগ্ধ হয়ে মীর মাহমুদ নিজ কন্যা সুরতজান বিবিকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। পরবর্তীতে জমিদার মীর মাহমুদ কন্যা ও জামাতাকে তারিণীপুরে বেশ কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। ফলে জাঁহাবখশ আলী ঢাকায় ফিরে না গিয়ে তারিণীপুরে স্থায়ীভাবে বসত করেন।

জন্ম ও জন্মস্থান

দেশ বিভাগপূর্ব সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান ভারত) শ্রীগৌরী মৌজার শিলচর খিত্তায় ১৮০০ মতান্তরে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে (১২০৭ বঙ্গাব্দ) শিতালং শাহ জন্মগ্রহণ করেন।

কবি তাঁর *সিফত পীর মুর্শিদান* পয়ারে বলেন-

শিতালং নাম মোর গোনাহ বেশুমার
কৃপা যদি কর আল্লাহ করিম গফফার।
মুহাম্মদ সলীমুল্লাহ দোষগুনে মাজুর
জাঁহা বখশ আলী নাম পিতার মাশুর।
পরগনে চারঘাট মোর পয়দিশ যেথায়
শ্রীগৌরী মৌজায়েতে, শিলচর খিত্তায়।

উল্লেখ্য যে, পয়ারে উল্লিখিত শিলচর বর্তমান ভারতের আসাম প্রদেশের শিলচর জেলা সদর নয়। বরং শ্রীগৌরী মৌজার অন্তর্গত একটি পাড়ার নাম।

সূফি কবি শিতালং শাহ কবে থেকে জকিগনজ উপজেলার বারঠাকুরীতে বসত করেন তা সঠিকভাবে নিরূপন করা যায় না। তবে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর এতটুকু জানা যায় যে, জকিগনজের গণিপুর গ্রামের নজর মুহাম্মদ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি বারঠাকুরীর কাশিরচক পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসত করেন।

শিক্ষা জীবন

তারিণীপুর মক্তবে শিতালং শাহ'র শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে বৃহত্তর সিলেটের প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি মাদরাসায় ভর্তি হন। তৎকালীন সময়ে ফুলবাড়ি মাদরাসা ছিলো শরীয়ত ও মারিফত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মারকাজ। সিলেটী নাগরী ভাষায় লেখা *ভব তরাণ*, *উম্মি তরাণ* ও *ভেদকায়া* প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা বিশিষ্ট আলিম শাহ আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী এবং ফারসি ভাষায় লেখা *বাহারে সালিকীন* প্রণেতা শাহ আবদুল কাহির প্রমুখ বিখ্যাত আলিম ও সূফি সাধক সে সময় ফুলবাড়ি মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সূফি কবি শিতালং শাহ এ দুই মহান সাধকের তত্বাবধানে উচ্চ শিক্ষা

গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি ছাত্র বৃত্তি স্কুলে বাংলা ভাষাও শেখেন। তিনি যে আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন সেই সত্য তাঁর গানসমুহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায়।

আধ্যাত্মিকতা

ফুলবাড়িতে অবস্থানকালীন শিতালং শাহ ইলমে তাসাউফ শিক্ষা তথা আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেন তাঁর জবানিতেই তা বুঝা যায়। তিনি বলেন -

মুর্শিদ কামিল মোর শাহ আবদুল ওহাব
তিনির প্রসাদে হৈল ধিয়ানেতে লাভ।
দ্বিতীয় মুর্শিদ মোর শাহ আবদুল কাহির
শিশুকালে কেরামতি আছর যাহির।
এই দুই ছাবে মোরে রাখিয়া কৃপায়
ভেদ মর্ম শিক্ষা দিলা তওজ্জু নিগায়।

শিতালং শাহ উচ্চ স্তরের আলিম এবং কামিল ওলী ছিলেন। জানা যায় মুর্শিদের নির্দেশে নির্জনে একান্ত সাধনার জন্য তিনি একাধারে বারো বছর পাহাড় জঙ্গলে অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনা লোক মুখে এখনো ছড়িয়ে আছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত একটি ঘটনা হলো- নির্জনবাসের সময় এক রাতে তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে তারিণীপুর গ্রামে তাঁর মাকে দেখতে এসেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, সূফি কবি শিতালং শাহ যে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন তা তাঁর রচনায় দিবালেকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন -

কলমায় করহ জিন্দা আরিফর দিল
লাহুতে খুলিয়া হবে কুরবত হাছিল।
ঈমান শুদ্ধ হইবে কলমায় জপো নাম
নমাযে করহে খাড়া ছতুন ইছলাম।
কলমায় ঈমান শুদ্ধ গোনা হয় মাফ
যকাত নমায রোযায় বয়তুল্লা তওয়াফ।
এই সকল আমলেতে ইছলামের চিন

এই পাঁচ হরফে বান্দে মোহাম্মদী দ্বীন।
পাছআনফাসেতে জপো ইল্লাল্লাহু নাম
লাহুত খুলিয়া শুদ্ধ হইব ইছলাম।
পবন কাষ্ঠে বান্দে নৌকা শরিয়ত
মস্তফা কাণ্ডারী নৌকা ভরিয়া উম্মত।
নবীর তরিকা লইলে হইবে মকবুল
নৌকায় তুলিয়া লইয়া আল্লার রছুল।
যে জনেতে না চড়িবে নৌকা শরিয়ত
নিশ্চয় ডুবিবে সেই হইয়া লা উম্মত।
নবীর তরিকে করে বন্দেগি এলাহির
হাশরে তরাণ হবে শফাতে নবীর।
শিতালং ফকিরে কহে আল্লাহ নিরঞ্জন
সংকটে উছিলা মোর নবীর চরণ॥

শরীয়তের অনুসরণে তিনি সাধারণ মানুষকে গানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এরকম বহু উদাহরণ তাঁর গান থেকে উদ্ধৃত করা যায়। মূলত: শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতিরেকে মারিফত লাভের কোন সুযোগই নেই।

সংসার জীবন

নির্জনবাস শেষে লোকালয়ে ফিরে এসে শিতালং শাহ সংসার জীবন শুরু করেন। বর্তমান ভারতের আসাম প্রদেশের বদরপুর এলাকার দেওরাইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন তিন পুত্র সন্তানের জনক। তাঁরা হলেন - ইদ্রিস আলী, মনতাজ আলী ও মুদরিস আলী।

ইন্তিকাল

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে (১৭ অগ্রহায়ন ১২৯৬ বঙ্গাব্দ) সূফি কবি শিতালং শাহ ইন্তিকাল করেন। বারঠাকুরীর কাশিরচকে নিজ বাড়ির পূর্ব দিকের পুকুরের ঈশানকোণে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পৌত্র মাওলানা তৈয়বুর রহমান মাযারের পাশে দাদার নামে প্রতিষ্ঠা করেন *বারঠাকুরী শিতালঙ্গিয়া মাদরাসা*।

রচনাবলি

সূফি কবি শিতালং শাহ'র পুরো রচনা সিলেটী নাগরী হরফে লেখা। তাঁর রচনা সম্ভার সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ব্যাপক অনুসন্ধানের পর তাঁর রচিত গানের তিনটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়।

এক. মশকিল তরাণ

দুই. কিয়ামত নামা

তিন. রাগ বাউল

এ তিন পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ১২০০।

শিতালং শাহ রচিত গান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন সময়ে তাঁর গান সংগ্রহ করতে উদ্যোগি হয়েছেন। কিছু কিছু গান সিলেটী নাগরী থেকে বাংলা লিপ্যান্তর করে প্রকাশও করেছেন।

জানা যায় জকিগনজের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বাংলা রম্য সাহিত্যের শক্তিমান লেখক মতিন উদদীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০) শিতালং শাহ'র পৌত্র মরহুম আহমদ আলীর কাছে সংরক্ষিত কবির স্বহস্ত লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে জমা দেন। মাইক্রোফিল্ম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে রাখা সে পাণ্ডুলিপি পরবর্তীতে কী হয়েছে বা কী অবস্থায় আছে কিছুই জানা যায় না।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ মুর্তজা আলী *শিতালঙ্গি রাগ* নামে কিছু গান গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বর্তমানে এ বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত ফোকলোর সংগ্রাহক ও গবেষক চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্য ভূষণ (১৯২১-১৯৮৮) শিতালং শাহ'র তিন'শটি গান সংগ্রহ করে বাংলা একাডেমিতে জমা দিয়েছিলেন। অমূল্য সে সংগ্রহ বাংলা একাডেমিতে বর্তমানে কী অবস্থায় আছে জানা যায় নি। শিক্ষাবিদ গবেষক ড. এস এম গোলাম কাদির (জন্ম : ১৯৩৩) *জালালাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য* গ্রন্থে কিছু গান লিপ্যান্তর করে গ্রন্থিত করেছেন। শেকড় সন্ধানী গবেষক ফজলুর রহমান *সিলেটের একশ একজন* ও *সিলেটের কাব্য সাধনা* গ্রন্থদ্বয়ে কিছু গান সংকলন করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক অবসরপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুর রহীম জকি (১৯৪১-২০১৩) *সূফি সাধক শিতালং শাহ* গ্রন্থে কিছু গান সংকলন করেছেন।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে *মরমী কবি শিতালং শাহ* নামক গ্রন্থ। গ্রন্থখানা সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা (জন্ম : ১৯৫১)। এ গ্রন্থে সূফি কবি শিতালং শাহ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকের লেখা আটারোটি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া সংকলক *শিতালং গীতি সংগ্রহ* শিরোনামে ২৪১টি গান সংকলন করেছেন এ গ্রন্থে।

২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর বারঠাকুরী গ্রামের মহিউদ্দিন আলতা'র মাধ্যমে সিলেটী নাগরী ভাষায় ৩৬৫ পৃষ্ঠার হস্ত লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এ পাণ্ডুলিপির স্ক্যান কপি আমার সংরক্ষণে আছে। মূল কপি বারঠাকুরী গ্রামের মৃত আবদুল লতিফ'র পুত্র জালাল উদ্দীনের কাছে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিখানিতে লিপিকারের নাম ও তারিখ উল্লেখ নেই। অনুমান করা যায়, মৃত আবদুল লতিফ হয়তোবা নিজ হাতে লিখেছিলেন, না হয় পূর্ববর্তী কারো হাতে লেখা কপি সংগ্রহ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, মরহুম আবদুল লতিফ শিতালঙ্গি রাগের একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। সিলেট বেতারের আমন্ত্রণে তিনি বহুবার বেতারে শিতালঙ্গি রাগ গেয়েছেন।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে পরিচয় হয় সিলেটী নাগরী ভাষা গবেষক মি. জেমস'র সাথে। ভদ্রলোকের সংগ্রহে সিলেটী নাগরী ভাষায় লেখা দুর্লভ বহু পাণ্ডুলিপি আছে। এর মধ্যে প্রায় সাত'শ পৃষ্ঠার হাত লেখা শিতালং শাহ রচিত *মুশকিল তরাণ* গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও আছে। তিনি আসামের গোয়াহাটি ইউনিভার্সিটির আর্কাইভ থেকে মাইক্রোফিল্ম কপি সংগ্রহ করেছেন বলে জানিয়েছেন। পূর্ব লন্ডনে তাঁর বসতঘরে সে পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ হয়েছে।

সূফি কবি শিতালং শাহ রাহিমাহুল্লাহ'র আলোচনায় প্রখ্যাত রম্য সাহিত্যিক মতিন উদ্দীন আহমদ বলেন, *মৃত্যুর দুয়ার পার হইয়া রাসূলুল্লাহ সা.'র সুপারিশে মোকান হীন মোকামে (শিতালং শাহ'র ভাষায় মোকানে লা মোকাম) পৌঁছিয়া গিয়া পরমাত্মার মাঝে লীন হইয়া গিয়া চির মিলনের প্রবল আকাঙ্খায় নানাভাবে এমন সব উচ্চাঙ্গের ভাব প্রকাশ করিয়া, আর মানবকুলকে পরকালের জন্য ইহকাল হইতে প্রস্তুতি নিবার*

জন্য আল্লাহ রসূলের এশকে আশেক কবি, সাধক কবি যে অমর বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যতেও রাখিবে। (সিলট একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল- মে ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৩০ ।)

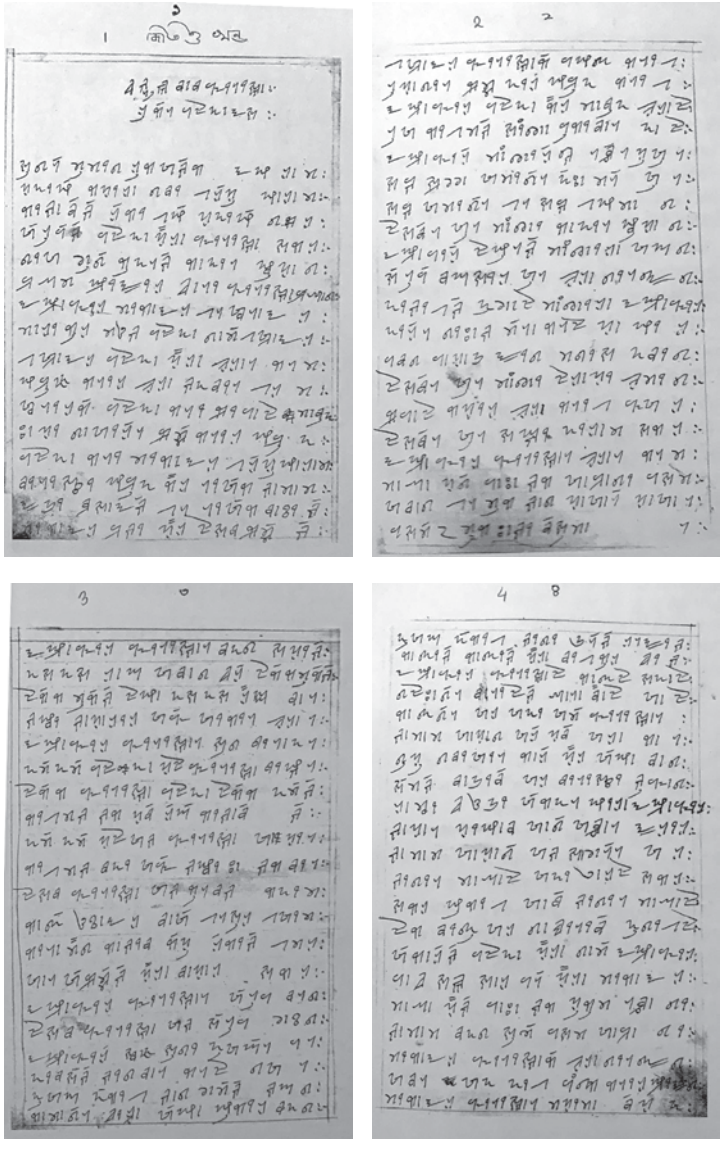
শিতালং শাহ ও রাধারমন প্রসঙ্গ

প্রয়াত গবেষক ড. বিজন বিহারী পুরকাস্থ রচিত পাঠক প্রিয় একটি গ্রন্থ *শ্রীহট্টের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা*। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থে সূফি কবি শিতালং শাহ'র সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পেয়েছে। ড. বিজন বিহারী পুরকাস্থ দাবি করেছেন শিতালং শাহ লোককবি রাধারমন দত্ত কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন। প্রমান হিসেবে তিনি বলেছেন, শিতালং শাহ এবং রাধারমন দত্ত উভয়ের গানে ভাব ও ভাষাগত প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আমরা ড. বিজন বিহারী পুরকাস্থ মহাশয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। কারণ এ যাবতকালে যত গবেষক সিলেটের মরমী সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন প্রত্যেকেই কম বেশি শিতালং শাহ এবং রাধারমন উভয়ের রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু একমাত্র ড. বিজন বিহারী পুরকাস্থ ছাড়া অন্য কেউ এমন দাবি করেন নি। আমরা বরং ড. পুরকাস্থ মহাশয়ের সূত্রানুযায়ি এই দাবি সামনে নিয়ে আসতে পারি যে, লোককবি রাধারমন দত্ত (১৮৩৩- ১৯১৫) সূফি কবি শিতালং শাহ কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন।

কারণ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার কেশবপুর গ্রামে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন লোককবি রাধারমন দত্ত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিতালং শাহ জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৮০৬)। সুতরাং রাধারমনের জন্মের বছর শিতালং শাহ ৩৩ বছর বয়সের পরিণত যুবক। তখনকার সময় বৃহত্তর সিলেটের আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রভাবিত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে *শিতালঙ্গি রাগ*। সুতরাং উভয়ের রচনায় ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্যের কারণে সহজেই ধরে নেয়া যায় রাধারমন দত্ত শিতালং শাহ কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন। এর বিপরীত কথা যুক্তিতে ঠেকে না।

১৬ আগস্ট ২০১৯



লেখকের সংগ্রহে থাকা সিলেটী নাগরী লিপিতে হাতে লেখা শিতালঙ্গি গানের পাণ্ডুলিপি থেকে।



শিতালঙ্গীয়া শাহী ঈদগাহ ও মাদরাসার প্রবেশ পথ।

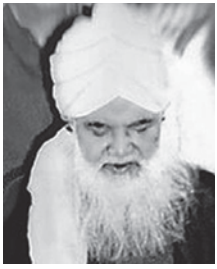


শিতালং শাহ এর মাজার শরীফ।



সূফি কবি শিতালং শাহ'র নামে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা।

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর রচনাবলি



ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং এতদ্বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের ইতিহাসে প্রাত:স্মরণীয় এক নাম মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ।

১৯১১ সালের ২৪ জানুয়ারি সোমবার (১৩২৯ হিজরির ২২ মুহাররাম) অবিভক্ত ভারতের বিহার প্রদেশের মুঙ্গির জেলার পাঁচনা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এ মনীষী। তাঁর পিতা সায়্যিদ আবদুল মান্নান (১৮৮৪-১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ) মাতা সায়্যিদা সাজিদা। পিতামাতা উভয় দিক থেকেই তিনি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। মুফতি সাহেবের বিভিন্ন রচনায় তাঁর নসবনামা বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

মুফতি সাহেবের পূর্বপুরুষ সায়্যিদ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ সিরিয়া ও হিজাযের মধ্যবর্তী *জাযনী*র নামক স্থান থেকে সুলতান তুঘলকের শাসনামলে (১২২৫-১২৫১ খ্রিষ্টাব্দ) দিল্লিতে আগমণ করেন। সুলতান তুঘলকের অনুরোধে সায়্যিদ আহমাদ ইসলাম প্রচারের জন্য বিহার প্রদেশের মুঙ্গির জেলায় চলে যান। মুঙ্গিরের রূহী নামক স্থানে স্থায়ী বসত করে নিষ্ঠার সাথে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে বিশাল ভূমিকা পালন করেন। ফলে সুলতান তুঘলক স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে মুঙ্গির জেলার চৌদ্দটি গ্রামের জায়গির প্রদান করেন।

শিক্ষা জীবন

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন না। পিতা ও চাচার কাছেই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাঠ গ্রহণের সূচনা হয়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি চাচা সায়্যিদ আবদুদ দাইয়্যান রাহিমাহুল্লাহর তত্বাবধানে কুরআনুল কারীম খতম সম্পন্ন করেন। সেই সময়েই বিদ্যুৎসাহি চাচার কাছে উর্দূ ও ফার্সি প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবাদি পাঠ সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে স্বীয় মুরশিদ সায়্যিদ বারাকাত আলী শাহ মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহর খিদমাতে নিয়ে যান। শাহ সাহেব আপন মুরিদের শিশু পুত্রকে নিজ তত্বাবধানে তালিম তারবিয়াত প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পিতার সম্মতিতে শাহ সাহেবের দরবারে দুই বছর অবস্থান করেন বালক আমীমুল ইহসান। সেসময় তিনি আরবি ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করেন। ইলমে তাজবীদ এবং উচ্চতর ফার্সি সাহিত্য তখনই অধ্যয়ণ করেন।

চৌদ্দ বছর বয়সকালে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হয়েও তিনি মাওলানা মাজিদ আলী জৌনপুরী, মাওলানা আবদুর রাহমান কাবুলী, আল্লামা কারামত আলী পানজাবী প্রমুখ বরেণ্য আলিমের কাছে উচ্চতর আরবি ব্যাকরণ, ফিকহ, উসূল, মানতিক প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এ ছাড়া সে সময়ের বিখ্যাত দুই ক্যালিগ্রাফার আবদুর রাহমান খাঁ ও সায়্যিদ ফযলুর রাহমান'র তত্বাবধানে হস্তলিপি এবং পাথরের গায়ে খুদাই করে লিখন পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বীয় পিতার কাছে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র, কারী আবদুস সামি'র কাছে ইলমে কিরাত এবং স্বীয় আত্মীয় আবদুল কারিম'র কাছে ইংলিশ ভাষাও শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালে পনেরো বছর বয়সে মুফতি আমীমুল ইহসান কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় আলিম ক্লাসে ভর্তি হন। এখানে তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম পণ্ডিতগণের কাছে পাঠ্যক্রমভুক্ত দারসে নিযামীর কিতাবাদি কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ণ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন। তবে হাদীস বিষয়ে বোর্ডে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে স্বর্ণ পদক লাভ

করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে ফাযিল এবং ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে স্বর্ণ পদকে ভূষিত হন।

কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন শামসুল উলামা আল্লামা ড. হেদায়েত হোসাইন, শামসুল উলামা মাওলানা ইয়াহইয়া সাহসারামী, মাওলানা আবদুস সাত্তার, মাওলানা ইসমাঈল বিহারী, মাওলানা নূরুল্লাহ স্বন্দ্বীপী, মাওলানা বিলায়েত হোসাইন বীরভূমী, মাওলানা মুশতাক আহমাদ কানপুরী, বাহরুল উলুম আল্লামা মুহাম্মাদ হোসাইন সিলেটী, মাওলানা সিদ্দিক আহমাদ ইসলামাবাদী, মাওলানা সূফি উসমান গণী প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর উস্তাদ শামসুল উলামা মাওলানা ইয়াহইয়া সাহসারামী এবং মাওলানা মুশতাক আহমাদ কানপুরীর কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়া মাওলানা মুশতাক আহমাদ কানপুরীর কাছে *ইলমুল মাওয়াকিত* ও *ইলমুল কিয়াফা* এবং ফতোওয়া প্রদানের বিশেষ নিয়ম কানুন শিক্ষা গ্রহণ করে ইজাযাত লাভ করেন।

এ সময় হিজাযের বিখ্যাত দুই মুহাদ্দিস শায়খ উমার হামদুন ও শায়খ মুহাম্মাদ আল ইয়ামানী'র কাছ থেকে ইলমে হাদীসে বিশেষ ইজাযাত ও সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ'র ঘটনাবহুল কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে কলকাতা এবং ঢাকা কেন্দ্রীক। ছাত্রজীবনে পিতার মৃত্যুতে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়েই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। মুফতি সাহেব ছিলেন পিতার জীবিত সন্তানগণের সবার বড়। ১৯২৭ সালে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মুফতি সাহেবের পিতা মাওলানা সায়্যিদ আবদুল মান্নান ইন্তিকাল করেন। সঙ্গত কারণেই পিতার ইন্তিকালের পরপরই সংসারের দায়িত্ব নিতে হয় মুফতি

সাহেবকে। মুফতি সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় লেখাপড়ার পাশাপাশি পিতার ডিসপেন্সারি, পারিবারিক ছাপাখানা পরিচালনা এবং পিতার স্থলাভিসিক্ত হয়ে মসজিদে ইমামতি ও মক্তব পরিচালনা করতে শুরু করেন।

নাখোদা মসজিদ, মাদরাসা ও দারুল ইফতা

১৯২৬ সালে কলকাতার চিৎপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাখোদা মসজিদ ও মাদরাসা। মাদরাসার দারুল ইফতা (ফাতাওয়া বিভাগ) অল্প সময়ে সারা বাংলায় প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৩৪ সালে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ নাখোদা মসজিদের সহকারি ইমাম এবং মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে দারুল ইফতার প্রধান মুফতির দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি নিয়মিত মাদরাসায় হাদীস এবং আরবি সাহিত্য অধ্যাপনার পাশাপাশি ব্যাপক ফতোওয়া দেয়ার কাজে নিষ্ঠার সাথে আত্মনিয়োগ করেন। কোন কোন সূত্র মতে এ প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালিন তাঁর প্রদত্ত ফতোওয়ার সংখ্যা লক্ষাধিক।

১৯৩৭ সালে সরকার মুফতি সাহেবকে মধ্য কলকাতার কাযী পদে নিয়োগ দান করে। ১৯৩৮ সালে তিনি বঙ্গীয় সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হন। ১৯৪০ সালে নিখিল বঙ্গ কারী সমিতির সভাপতি পদে তাঁকে বরণ করা হয়। এ সময় সরকারের অনুরোধে প্রায়শই বিচার বিভাগীয় জুরীতে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হতো। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ইসলামি এবং জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন।

কলকাতা আলিয়া মাদরাসা

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার তৎকালিন অধ্যক্ষ খানবাহাদুর যিয়াউল হক'র অনুরোধে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন। অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের কারণই তিনি সে সময় কামিল ক্লাসে তাফসীরে বাইদাওয়ি, বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পাঠদান করতেন।

মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকা

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয়ে গেলে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তর হয়। অন্যান্য সহকর্মীগণের সাথে মুফতি সাহেবও ঢাকায় চলে এসে নিয়মিত অধ্যাপনা অব্যাহত রাখেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকা'র হেড মৌলভী মনোনীত হন। সে সময় থেকে পাঠদানের পাশাপাশি মাদরাসার প্রাশাসনিক কাজও দক্ষতার সাথে আনজাম দেন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর তিনি মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও জাতীয় ঈদগাহ

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মুফতি সাহেব বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধে পুরানা পল্টন ময়দানে (বর্তমান আউটার স্টেডিয়াম) অবস্থিত জাতীয় ঈদগাহে নিয়মিত ঈদের নামাযে ইমামতি করে আসছিলেন।

মসজিদ সংস্কার

ঢাকার সূত্রাপুর থানার অন্তর্গত কলুটোলা মহল্লায় ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় একটি মসজিদ। মূলত: কলুটোলা মহল্লার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু -মুসলিম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উক্ত মসজিদটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দারা মসজিদ ঘরটিকে আস্তাকুঁড়ে পরিণত করে। দেশ ভাগের পর কলুটোলার হিন্দু বাসিন্দারা ব্যাপকহারে ভারতে পাড়ি জমায়। কিন্তু মহল্লার মসজিদটি ভগ্নপ্রায় অনাবাদ পড়ে থাকে। মুফতি সাহেব তাঁর নিকটাত্মীয় নারিন্দার পীর সাহেব মাওলানা শাহ আবদুস সালাম (ওফাত ১৯৬৭ খ্রী:) সাহেবের সহযেগিতায় উক্ত মসজিদ ঘরটি সংস্কার করে নিয়মিত নামাযের ব্যবস্থা করেন। নিজে মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব গ্রহণ করে মসজিদটির নামকরণ করেন *নকশবন্দী মসজিদ*।

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মুফতি সাহেব মসজিদের ঠিক বিপরীত দিকের বাড়িটি ক্রয় করে সেখানেই নিজের বসত গড়েন।

মুফতি সাহেবের উদ্যোগে নকশবন্দী মসজিদের প্রবেশ ফটকের বাঁ পাশে মীনারের নীচে একটি কক্ষ নির্মিত হয়। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসা ই আলিয়া থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রতিদিন নিয়মিত সেই কক্ষে বসে হাদীস ও ফিকহ'র দারস প্রদান করতেন। এছাড়া মুরিদানকে ইলমে তাসাউফের তা'লিম তারবিয়াতের কাজেও এ কক্ষটি ব্যবহার করতেন।

সংসারজীবন

মুফতি সাহেব স্বীয় মুরশিদ সায়্যিদ বারাকাত আলী শাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কন্যা সায়্যিদা মাইমুনার সাথে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ পত্নীর গর্ভে একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে শিশু বয়সে ইন্তিকাল করেন। প্রথমা পত্নীর ইন্তিকালের পর তিনি দ্বিতীয়বার সায়্যিদা ফাতিমা নাম্নী মহিয়ষী মহিলাকে বিয়ে করেন। এ পত্নীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সায়্যিদা আমিনা নাম্নী সে কন্যা সন্তান প্রাপ্ত বয়স্কা হলে মুফতি সাহেব নিজ হাতে তাঁকে পাত্রস্ত করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর ইন্তিকাল হলে তাঁর বোন সায়্যিদা খাদিজাকে মুফতি সাহেব বিয়ে করেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মুফতি সাহেবের ইন্তিকালের দশ বছর পর ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

ইন্তিকাল

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর মুফতি সাহেব শারীরিক অসুস্থতার কারণে বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীবের দায়িত্ব থেকে চার মাসের ছুটি নেন। ২৭ অক্টোবর শনিবার (১০ শাওয়াল ১৩৯৫ হিজরি) বাদ মাগরিব তিনি নিজ খানেকায় খতমে খাজেগান আদায় করে উপস্থিত মুরিদানকে নিয়ে দীর্ঘ মুনাজাত করেন। নিকটজনেরা তাঁকে ভগ্ন স্বাস্থের কারণে বিশ্রামের কথা বললে তিনি বলেন - *ঠিক আছে, কাল থেকে আমি আর কথা বলবো না*। রাত দু'টার দিকে জাগ্রত হয়ে তিনি তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। মুহতারামা পত্নী সায়্যিদা খাদিজা পাশের রুম থেকে কন্যা ও জামাতোকে ডেকে আনেন। তাঁরা এসে দমনী পরীক্ষা করে দেখেন ইতোমধ্যে তিনি মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

পরদিন ২৮ অক্টোবর রবিবার বায়তুল মুকাররম মসজিদ চত্বরে জানাযা শেষে কলুটোলা মহল্লার নকশবন্দী মসজিদের ঠিক দক্ষিণ পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুফতি সাহেবের ছাত্র

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্রগণের সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। কলকাতা নাখোদা মসজিদ ও মাদরাসা (১৯৩৪-১৯৪৩), কলকাতা আলিয়া মাদরাসা (১৯৪৩-১৯৪৭), মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকায় (১৯৪৭-১৯৫৯) তিনি নিয়মিত হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি কলকাতা এবং ঢাকায় তিনি নিজ গৃহে দারস প্রদান করতেন। মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণের পর ইন্তিকাল পর্যন্ত কলুটোলা নকশবন্দী মসজিদ সংলগ্ন নির্ধারিত কক্ষে নিয়মিত হাদীস এবং ফিকহের কিতাবাদি দারস প্রদান করেছেন। তাই দীর্ঘ এ সময়কালে কত সংখ্যক মানুষ তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেছেন তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা। নিম্নে হাতেগুণা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী
বহুগ্রন্থ প্রণেতা, সাবেক অধ্যক্ষ সৎপুর দারুল হাদীস আলিয়া মাদরাসা, সিলেট।

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান
বহুগ্রন্থ প্রণেতা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইছামতি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, সিলেট। সাবেক বিচারপতি, উম্মুল কুওয়াইন, আরব আমিরাত।

৩. ড. এম. এ. গফুর
প্রাক্তন প্রফেসর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
প্রাক্তন প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. ড. মুস্তাফিজুর রহমান
বহুগ্রন্থ প্রণেতা, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৬. মাওলানা আবদুল মান্নান
সাবেক ধর্ম মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ইনকিলাব গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স।

৭. মাওলানা মুহি উদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদীনা, গবেষক, অনুবাদক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

৮. মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
তাফসীরে নূরুল কুরআন (৩০ খণ্ড)সহ বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

৯. ড. আ. র. ম. আলী হায়দার
সাবেক প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

১০. ড. আনওয়ারুল হক খতীবী
সাবেক প্রফেসর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

রচনাবলি

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ি উলূমুল কুরআন, হাদীস ও উলূমুল হাদীস, সীরাত, ইলমে ফিকহ, ইলমে তাসাউফ প্রভৃতি জীবন ঘনিষ্ট নানা বিষয়ে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আরবি ও উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ২৫০টি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো ছোট বড় এ বিপুল সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ২৭টি। তাও বর্তমানে সহজলভ্য নয়। আর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে। কিছু পারিবারিকভাবে সংরক্ষিত আছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর রচনাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ক. উলূমুল কুরআন

علوم القرآن

১. আল ইত্তিহাফুল আশরাফ বিহাশিয়াতিল কাশশাফ

الاتحاف الاشراف بحاشية الكشاف

আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ ইবন উমার যামাখশারী (৪৬৭-৫২২ হিজরি) রচিত তাফসীর আল কাশশাফ বিশ্বব্যাপী পঠিত ও সমাদৃত। রচয়িতা আল্লামা যামাখশারী মু'তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আরবি ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ তাফসীরকারদের পন্থা অনুসরণ করে অনুপম ভাষাশৈলীতে রচিত এ তাফসীরে আহকামের ক্ষেত্রে মু'তাযিলা মতবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও উন্নত ভাষাশৈলী এবং অসাধারণ ভাবগভীরতার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত অনুসারী উলামা এ তাফসীরের ভূয়সি প্রশংসা করেন। এমনকি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মাদরাসাসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে নিয়েছেন।

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরে কাশশাফের সূরা আলে ইমরান অংশের হাশিয়া বা পার্শ্বটীকা রচনা করেন। তিনি পার্শ্বটীকায় তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত হাদীসসমূহের তাখরীজ করেছেন। সেই সাথে দুর্বোধ্য ও দ্ব্যার্থবোধক শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা, অস্পষ্ট মাসআলা স্পষ্টকরণ, বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত মু'তাযিলা মতবাদ খণ্ডন, তাফসীরে উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করেছেন। সাবলিল আরবি ভাষায় মাত্র ১৮৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ ১৩৬৬ হিজরির রামাদান মাসে রচনা সমাপ্ত হয়। ১৩৬৮ হিজরিতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

২. আল ওয়াসসাফ বিহাশিয়াতিল কাশশাফ

الوصاف بحاشية الكشاف

মুফতি আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরে কাশশাফ'র সূরা ফাতিহা অংশের পৃথক একটি পার্শ্বটীকা রচনা করেন। আল ওয়াসসাফ বিহাশিয়াতিল কাশশাফ নামে উর্দু ভাষায় রচিত এ পার্শ্বটীকায় তিনি সূরা আলে ইমরানের পার্শ্বটীকার

পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কেবল ভাষা ভিন্ন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থ একসময় মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত আলিম শ্রেণির পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিলো।

৩. আততানবীর ফী উসূলিত তাফসীর

التنوير في اصول التفسير

উসূলে তাফসীর বিষয়ে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ'র অনবদ্য রচনা আততানবীর ফী উসূলিত তাফসীর। সংক্ষিপ্ত অথচ অনন্য বৈশিষ্টমণ্ডিত আরবি ভাষায় লেখা এ গ্রন্থ তৎকালীন ইস্টপাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড অনুমোদিত ফাযিল শ্রেণির পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া আরবি ও উর্দু ভাষায় এ গ্রন্থের কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মুফতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম রচিত *আততাকরীর ফী শারহিত তানবীর* ১৩৮৭ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে।

সময়ের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ বাংলা অনুবাদও হয়েছে।

৪. আত তানদীদ ফিত তাজবীদ

التنضيد في التجويد

কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত বিশুদ্ধ না হলে নামায বিশুদ্ধ হবে না। তাই মুসলমান নর নারীর জন্য বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করার জরুরী অনুসঙ্গ হলো ইলমে তাজবীদ। যুগেযুগে বিভিন্ন ভাষায় ইলমে তাজবীদ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ আরবি ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচনা করেন আত তানদীদ ফিত তাজবীদ। তেরোটি فصل বা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ কিতাবের শেষ দিকে মুফতি সাহেব ইলমে কিরাতে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সনদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত হয় এবং একই সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. মা লা ইয়াসআ লিল কারী

ما لا يسع للقاري

ইলমে তাজবীদ বিষয়ে মুফতি সাহেব রচিত এই গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

খ. হাদীস ও উলূমে হাদীস

حديث وعلوم الحديث

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশে হিজরি চতুর্দশ শতকের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাত। হাদীসের সনদ, মতন, আসমাউর রিজাল, জারহ-তা'দীল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিলো মুজতাহিদ সুলভ। দীর্ঘ দিন তিনি হাদীস ও উলূমে হাদীসের বিভিন্ন বিষয় অধ্যাপনা করেছেন সুনামের সাথে। তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বহুসংখ্যক বাংলাদেশে ইলমে হাদীসে প্রাজ্ঞ আলিম হিসেবে স্বীকৃত। হাদীস ও উলূমে হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ-

১. ফিকহুসসুনান ওয়াল আছার

فقه السنن والآثار

মুফতি সাহেবের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হচ্ছে এ হাদীস সংকলন।

৪৪টি كتاب বা পর্ব, ৮৮টি باب বা অনুচ্ছেদ এবং ১২৬৯টি فصل বা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ গ্রন্থে সর্বমোট ১৫৭৯টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ফিকহ গ্রন্থের বিন্যাস রীতিতে বিন্যস্ত এ কিতাবখানা হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীসের কিতাব হিসেবে বিবেচিত। কলকাতা নাখুদা মসজিদে খতীব ও মাদরাসার প্রধান মুফতি হিসেবে দায়িত্বরত অবস্থায় ১৩৫৮ হিজরির (১৯৩৯ খ্রী.) যিলহাজ্জ মাসে এ গ্রন্থের কাজ শুরু করে ১৩৫৯ হিজরির (১৯৪০ খ্রী.) ২৭ রামাদান সমাপ্ত করেন। সে বছরই মুহাম্মাদ মুফাযযাল হুসাইন নামক ব্যক্তির তত্বাবধানে

কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ড. মাওলানা সাইফুল ইসলাম আল আজহারী'র তাহকীক সম্বলিত ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার বৈরুতের বিশ্বখ্যাত প্রকাশনী দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা থেকে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

২. মীযানুল আখবার

ميزان الأخبار

উসূলে হাদীস বা হাদীসের মূলনীতি বিষয়ে আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব মূলত: ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র কিতাব আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি মুফতি সাহেব নিজে মি'আরুল আছার (معيار الآثار) নামে মীযানুল আখবার'র উর্দু শরাহ বা ব্যাখ্যা রচনা করেন। ১৯৫২ সালে এই শরাহ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

শায়খ উসামা সায়্যিদ মাহমুদ আল আযহারী'র মুকাদ্দিমা সম্বলিত মীযানুল আখবার কায়রো'র দারুল বাসায়ির থেকে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে মীযানুল আখবার বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আলিম শ্রেণির পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। বাংলা অনুবাদ সম্বলিত মীযানুল আখবার ইতোমধ্যে ঢাকার কয়েকটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. আল আরবাঈন ফিস সালাহ

الأربعين في الصلاة

বিষয় ভিত্তিক চল্লিশ হাদীস সংকলনের রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে মুহাদ্দিস ইমামগণের মধ্যে প্রচলিত। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনের অনুসরণে কয়েকটি বিষয়ে চল্লিশ হাদীস সংকলন করেন। আল আরবাঈন ফিস

সালাহ কিতাবে তিনি নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ক চল্লিশ হাদীস সংকলন করেন। এ কিতাব প্রকাশিত হয়নি। মুফতি সাহেবের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪. আল আরবাঈন ফিস সালাতি আলান নাবী

الأربعين في الصلاة على النبي

শিরোনাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে এটি দুরূদ শরীফ পাঠের ফযিলত বিষয়ে চল্লিশ হাদীসের সংকলন। মুফতি সাহেব রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ তালিকায় নাম পাওয়া গেলেও এটি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

৫. আল ইসতিবশার বিমু'জিযাতিন নাবিয়্যিল মুখতার

الاستبشار بمعجزات النبي المختار

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আঙ্গুল মুবারকের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, তাঁর সাথে চতুস্পদ জন্তুর কথা বলা ইত্যাদি মু'জিযা বিবৃত হাদীসসমূহ একত্রিত করে একশত পৃষ্ঠার এ সংকলন প্রস্তুত করেন মুফতি সাহেব। বর্তমানে এ পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না।

৬. আল আশারাতুল মাহদিয়্যা ফীমা ওয়ারাদা ফীহিল কালিমাতুত তায়্যিবাহ

العشرة المهدية في ما ورد فيه الكلمة الطيبة

পূর্ণ কালিমা তায়্যিবাহ বিবৃত হয়েছে এমন দশটি হাদীস এ পাণ্ডুলিপিতে সংকলিত হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয়নি।

৭. জামিউ জাওয়ামিউল কালিম

جامع جوامع الكلم

অল্প কথায় অধিক অর্থবোধক বাক্য সম্বলিত হাদীসের সংকলন। এ পাণ্ডুলিপি বর্তমানে নিখোঁজ রয়েছে।

৮. হুসনুল খিতাব ফীমা ওয়ারাদা ফিল খিদাব

حسن الخطاب في ما ورد في الخضاب

খিযাব বা কলপ ব্যবহারের বিধান সম্বলিত হাদীসসমুহের সংকলন। একশত পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপি বর্তমানে নিখোঁজ রয়েছে।

৯. মানাহিজুস সুআদা

مناهج السعداء

সামাজিক জীবনে ইসলামের বিধি বিধান সম্বলিত হাদীসসমুহের সংকলন। চল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত একশত পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপি বর্তমানে নিখোঁজ রয়েছে।

১০. আসমাউল মুদালিসীন

اسماء المدلسين

কোন হাদীস বর্ণনাকারি যখন নিজ উস্তাদ বা শায়খের নাম উহ্য রেখে উর্ধ্বতন শায়খের নাম উল্লেখপূর্বক হাদীস বর্ণনা করেন, রিজাল শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে মুদাল্লিস (مدلس) বলা হয়। মুফতি সাহেব এরূপ হাদীস বর্ণনাকারিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করেছেন এ কিতাবে। সেই সাথে হাদীস পরিচিতি, বর্ণনাকারিগণের শ্রেণি বিভাগ এবং তাদলীস হাদীসের সংজ্ঞা ও বিধান সন্নিবেশিত করেছেন এ গ্রন্থে। লেখকের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ ইলমে হাদীস বিষয়ে আরবি ও উর্দু ভাষার সংমিশ্রণে রচিত এ পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়নি।

১১. কিতাবুল ওয়াদিঈন

كتاب الواضعين

বিভিন্ন বিভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীগণ নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যা হাদীস রচনার সূচনা করে। এরূপ বানোয়াট, মনগড়া হাদীসকে পরিভাষায় মাউদু হাদীস আর রচনাকারিগণকে ওয়াদিঈন (واضعين) বলা হয়।

মুসলিম জাহানের খলীফা হিজরি প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

উমার ইবন আবদুল আযীয (৬৩-১০১ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ'র খিলাফতকালে প্রথম মিথ্যা হাদীস রচনার মতো ঘৃন্য কাজটি প্রকাশ পায়। তাৎক্ষণিক খলীফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাদীসকে সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেন। তখনই বিশেষজ্ঞ ইমামগণ হাদীস রচনাকারি মিথ্যাবাদিদের ষড়যন্ত্র মুকাবেলায় রিজাল শাস্ত্রের সূচনা করেন।

যুগে যুগে হাদীসের ইমামগণ মিথ্যা হাদীস রচনাকারিগণের বিস্তারিত পরিচিতি এবং তাদের রচিত বানোয়াট হাদীস আলাদা গ্রন্থবদ্ধ করে গেছেন। যাতে অনাগতকালের মুসলমানগণ বানোয়াট হাদীসের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তী ইমামগণের অনুসরণে কিতাবুল ওয়াদিঈন রচনা করেন। আরবি ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ এ পাণ্ডুলিপিখানা হারিয়ে গেছে।

১২. উমদাতুল মাজানী বিতাখরিজি আহাদীসি মাকতুবাতি মুজাদ্দিদ আলফে সানি

عمدة المجاني بتخريج احاديث مكتوبات مجدد الألف الثاني

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সিরহিন্দি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর যুগান্তকারী সংস্কার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে আলিম উলামা এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীয় অনুসারীগণের সাথে ব্যাপক পত্র যোগাযোগ রাখতেন। সেসব পত্রে তিনি কুরআন হাদীস থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি পেশ করতেন। মূল ফারসি ভাষায় লিখিত সেই পত্রাবলীর সংগ্রহ পরবর্তীতে *মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী* নামে তিন খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আরবি, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় *মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী*'র অনুবাদ হয়েছে। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী রাহিমাহুল্লাহ *মাকতুবাতে*

*ইমাম রাব্বানী*তে উদ্ধৃত হাদীসসমুহের তাখরীজ তথা কোন হাদীস কোন কিতাবে সংকলিত আছে, সে সকল হাদীসের মান ইত্যাদি বিষয়ে *উমদাতুল মাজানী* নামে আরবি ভাষায় একশত পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে এ পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না।

১৩. আল ইহসানুসসারি বিতাওদীহি তাফসীরিল বুখারী

الإحسان الساری بتوضیح تفسیر البخاري

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারী শরীফে কিতাবুত তাফসীরে যে হাদীসসমুহ সংকলন করেছেন মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত শিরোনামে সে হাদীসসমুহের ব্যাখ্যা রচনা করেন। আরবি ভাষায় রচিত এ পাণ্ডুলিপিখানাও হারিয়ে গেছে।

১৪. মুকাদ্দিমা সুনানে আবু দাউদ

مقدمة سنن ابی داود

সিহাহ সিত্তাহ'র অন্যতম গ্রন্থ ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত *আসসুনান* যা *সুনানে আবু দাউদ* নামে খ্যাত। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় *সুনানে আবু দাউদ*'র একটি মুকাদ্দিমা বা ভূমিকা রচনা করেন। করাচী থেকে প্রকাশিত সুনানে আবু দাউদ'র সাথে সংযুক্ত হয়ে এটা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ এ মুকাদ্দিমা পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রথম في فضل علم الحديث বা ইলমে হাদীসের ফযিলত। দ্বিতীয় في علم الحديث وذكر كتبها وطرق تحمل الحديث وأنواع المصنفات في علم الحديث বা হাদীস শাস্ত্র, হাদীসের গ্রন্থাবলী, হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি এবং ইলমে হাদীস বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলীর পরিচিতি। তৃতীয় في نشاءة الحديث وتدوينه وذكر الصحاح الستة ومزياها বা হাদীসের

উৎপত্তি, সংকলন এবং সিহাহ সিত্তাহ ও এগুলোর বৈশিষ্ট। চতুর্থ في ترجمة امام ابى داود বা ইমাম আবু দাউদ'র জীবন কথা। পঞ্চম في احوال السنن للامام ابى داود বা সুনানে আবু দাউদ'র বৈশিষ্ট।

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ এ মুকাদ্দিমা সম্পর্কে বলেন-

هذه كلمات يسيرة جعلتها تبصرة لمن أراد ان يشتغل بالسنن الامام احد حفاظ الاسلام ابى داود السجيتانى التى هى اجمع كتاب صنفت في السنن

অর্থাৎ এসব এমন কিছু সহজবোধ্য কথা যা ইসলামের অন্যতম সংরক্ষক ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানীর আস সুনান অধ্যয়নে আগ্রহী ব্যক্তির গভীর দৃষ্টিশক্তির প্রসার ঘটাবে। এ সুনান গ্রন্থখানি হাদীসের সর্বাধিক সংরক্ষণকারি কিতাব।

১৫. তা'লিকাতুল বারাকাতী আ'লা মুকাদ্দিমাতিদ দেহলবী

تعليقات البركتى على مقدمة الدهلوي

উপমহাদেশে নিয়মতান্ত্রিক ইলমে হাদীস চর্চার পথিকৃত ইমাম আবদুল হক দেহলবী (৯৫৮-১০৫২ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আরবি ভাষায় প্রণীত উসূলে হাদীসের বিখ্যাত কিতাব مقدمة في اصول الحديث মূলত: ইমাম আবদুল হক দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ *লামআতুত তাফতীহ* নামে *মিশকাতুল মাসাবীহ* নামক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত সেই ব্যাখ্যা গ্রন্থের সূচনায় তিনি উসূলে হাদীস সম্পর্কিত জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশ করেন। যা পরবর্তীতে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং *মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ* নামে পরিচিতি লাভ করে। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ ১৩৫২ হিজরি মুতাবেক ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে উল্লিখিত গ্রন্থের আলোচনাকে বিস্তৃত ও সহজবোধ্য করার মানসে *তা'লিকাতুল বারাকাতী আ'লা মুকাদ্দিমাতিদ দেহলবী* নামে

আরবি ভাষায় তিনশত পৃষ্ঠার সুবৃহৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু উসূলে হাদীস বিষয়ক এ মূল্যবান গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়নি।

১৬. হাওয়াশিউস সা'দী

حواشى السعدي

১৩৫৬ হিজরি মুতাবেক ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ *হাওয়াশিউস সা'দী* নামে আরবি ভাষায় *মুকাদ্দিমাতুশ শায়খ* গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা রচনা করেন। মূল গ্রন্থের সাথে সেই পার্শ্ব টীকা সে সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। শায়খ নূরুল বাশার মুহাম্মাদ নূরুল হক'র টীকা সম্বলিত *হাওয়াশিউস সা'দী* মূল কিতাবের সাথে করাচীর মাকতাবাহ মা'হাদ উসমান বিন আফফান থেকে ১৪৩৭ হিজরি মুতাবেক ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

১৭. ইলমে হাদীস ক্য মাবাদিয়াত

علم حديث کی مبادیات

উর্দু ভাষায় রচিত ১০১ পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপিতে হাদীসের উৎস, যুগে যুগে হাদীস সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং উসূলে হাদীসের মৌলিক বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে এ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছে। মূলত: কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় হাদীস পাঠদানের সময় প্রথম কয়েকদিন এ বিষয়ে মুফতি সাহেব ক্লাসে ব্যাপক আলোচনা করতেন। হাদীসের ছাত্রদের জন্য তা খুবই উপযোগি। ক্লাসের সেই আলোচনা উল্লিখিত কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

মূল্যবান এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়নি। যতটুকু জানা যায় মুফতি সাহেবের ভাই সায়্যিদ নুমান বারাকাতি'র কাছে এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিলো।

১৮. তালখীসু মারাসিলি ইবন আবি হাতিম

تلخيص مراسيل ابن ابی حاتم

ইবন আবি হাতিম নামে খ্যাত ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ (২৪০-৩২৭ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ রচিত সুবৃহৎ গ্রন্থ *কিতাবুল মারাসিল* এর তালখীস বা সংক্ষেপন করেন মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর রচনাবলির তালিকায় এ গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তবে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

গ. ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও রসমুল ইফতা

الفقه واصول الفقه ورسم الإفتاء

১. ফাতাওয়ায়ে বারাকাতিয়া

فتاوى بركتيه

মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী রাহিমাহুল্লাহ'র অনবদ্য কীর্তি ফাতাওয়ায়ে বারাকাতিয়া। মূলত: উর্দু ভাষায় রচিত হলেও প্রয়োজনের তাগিদে লেখক ব্যাপকভাবে আরবি এবং কিছু কিছু ফারসি কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। এ গ্রন্থের রচনাকাল নির্দিষ্ট নয়। কারণ মানুষের প্রয়োজনে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি যখন যে ফাতাওয়া লিখিতভাবে দিয়েছেন তাই সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। প্রাপ্ত তথ্য মতে সাতাশ খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো হাজার। ডাবল ডিমাই সুলভ কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত পাণ্ডুলিপিখানা মুফতি সাহেব নিজ হাতে ফিকহ শাস্ত্রের রীতিতে বিন্যস্ত করেন। মুফতি সাহেব প্রদত্ত ত্রিশ হাজারের অধিক ফাতওয়া এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

অনুসন্ধানের পর মুফতি সাহেবের ভাই সায়্যিদ নুমান বারাকাতীর সংরক্ষণে বারো খণ্ড আছে বলে জানা যায়। বাকি খণ্ডগুলো নিখোঁজ।

বর্তমান সময় পর্যন্ত এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

২. আল কুররাহ ফিল কুররাহ

القرة فى الكرة

জানা যায় এক সময় কলকাতার কতিপয় আলিম ফুটবলসহ সব ধরণের খেলা হারাম বলে ফতোওয়া প্রদান করেন। এরই প্রক্ষিতে কলকাতা মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব কর্তৃপক্ষ মুফতি সাহেবের কাছে ফতোওয়া জানতে চান। তখন তিনি ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ফুটবলসহ চল্লিশ প্রকার খেলার বৈধতা সম্পর্কে ষাট পৃষ্ঠার এ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এটি প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে সন্ধান পাওয়া যায় না।

৩. আল ইযান ওয়াত তাবশির

الايذان والتبشير

এক সময় কলকাতায় মানুষ রামাদান মাসে সেহরির সময় সংকেত হিসেবে আযান দেয়ার প্রথা চালু করে। এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও বাদানুবাদ শুরু হয়। মুফতি সাহেব স্বপ্রণেদিত হয়ে বিষয়টির সমাধান সম্বলিত মাত্র আট পৃষ্ঠার এ রিসালা প্রস্তুত করেন। বর্তমানে এটি নিখোঁজ।

৪. আত তা'রিফাতুল ফিকহিয়্যা

التعريفات الفقهية

মূল্যবান এ কিতাবটি একটি পরিভাষাকোষ। ফিকহ ও উসূলে ফিকহ অধ্যয়ণকারিগণের জন্য ফিকহ ও উসূলে ফিকহ'র পরিভাষা এবং এতদ্বিষয়ক বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লিখিত জটিল শব্দাবলীর ব্যাখ্যা নিয়ে পরিভাষাকোষখানি সংকলন করা হয়েছে। মোট ৪১৭ পৃষ্ঠার এ কিতাবে ৩০৯০টি শব্দ আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য পরিভাষাকোষে আরবি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী কুরাআনুল কারীম, হাদীস, ফিকহ ও আরবি ভাষা বিজ্ঞানের উদ্ধৃতিসহ প্রতিটি শব্দ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শব্দ গঠনের সঠিক

রীতি, উচ্চারণের সঠিক নিয়ম, স্বরচিহ্ন, বচন, লিঙ্গভেদ, বিপরীত শব্দ, শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক ব্যবহার এবং প্রয়োগকৌশল বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে এসব শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে ফিকহবিদ, উসূলবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানীগণের মতানৈক্য পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কিতাব প্রকাশিত হলে উপমহাদেশ এবং বহির্বিশ্বে বোদ্ধাগণের কাছে ব্যাপক আলোচিত হয়। বৈরুতের দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৫. আল কাওয়াঈদুল ফিকহিয়্যা

القواعد الفقهية

শরীয়তের মাসআলা মাসাঈল নিরূপণের মূলভিত্তি চারশ ছাব্বিশটি বিধি বিধান ও নিয়ম রীতি বিভিন্ন প্রামান্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ প্রতিটি বিষয়কে সহজবোধ্য করতে উপমা সংযুক্ত করে এ কিতাব সংকলন করেন।

আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে করাচী থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে।

৬. আদাবুল মুফতি

أدب المفتى

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আরবি ভাষায় স্বল্প পরিসরে রচিত এ কিতাবে ফাতাওয়া প্রদানের নিয়মকানূন উল্লিখিত হয়েছে।

ফাতাওয়া প্রদানকারিগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কিতাব মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকার প্রকাশনা বিভাগ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে করাচী থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের শায়খ আদিল

আইউব'র পার্শ্বটীকা সম্বলিত আদাবুল মুফতি ১৪৩৮ হিজরিতে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের দারুল উলূম করাচি, ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ফিকহ বিভাগের উচ্চতর শ্রেণিতে এ কিতাব গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা হয়।

৭. লুব্বুল উসূল

لب الأصول

আরবি ভাষায় খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখা এ কিতাবের পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে মুফতি সাহেব বলেন-

هذا متن متين وجزء وموجز في علم اصول الفقه الذى مبنى للشرائع والأحكام وأساس لعلم الحلال والحرام

অর্থাৎ এটি ইলমে ফিকহ'র সেসব মূলনীতির সংক্ষিপ্ত ও সুক্ষ্ম পাঠ, যে মূলনীতিসমুহ শরীয়ত ও এর বিধানের মূলভিত্তি এবং হালাল হারাম জ্ঞানের বুনিয়াদ।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় এ কিতাব রচিত এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৮. উসূলুল মাসাঈলিল খিলাফিয়্যা

اصول المساءل الخلافية

শরীয়তের মাসআলা মাসাঈল নিরূপণে বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহ ও ইমামগণের মতানৈক্যের উসূল বা মূলনীতিসমূহ সংক্ষিপ্ত পরিসরে মুফতি সাহেব সংকলন করেছেন এ কিতাবে। মোট ৭৩ টি মূলনীতি আলোচনা করে পাদটীকায় প্রতিটি মূলনীতি সংশিষ্ট উদাহরণ গ্রন্থিত করা হয়েছে।

আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে করাচি থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে।

৯. আততানবিহ লিল ফকীহ

التنبيه للفقيه

আরবি ভাষায় মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠার এ রিসালাখানাও মুজতাহিদ ইমামগণের পাস্পরিক মতানৈক্যের মূলনীতি বিষয়ক রচনা।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত এ রিসালা সে সময়ই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১০. আল ইফসাহ আন নূরিল ইদাহ

الإفصاح عن نور الايضاح

ইমাম হাসান ইবন আলী আশশুরুম্বুলালি (৯৯৪-১০৬৯ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ রচিত নূরুল ইদাহ ফিকহে হানাফীর প্রাথমিক স্তরের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামান্য একটি কিতাব। তৎকালিন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সিলেবাসভূক্ত করা হলে ছাত্রদের জন্য কিতাবখানা সহজবোধ্য করতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুফতি সাহেব আল ইফসাহ আন নূরিল ইদাহ নামে সে কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব প্রকাশিত হয়নি। ডাবল ডিমাই সাইজের রুল করা কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় মুফতি সাহেবের স্বহস্ত লিখিত বাঁধাই করা পাণ্ডুলিপিখানা তাঁর ভ্রাতস্পুত্র সায়্যিদ সাফওয়ান আল বারাকাতির কাছে সংরক্ষিত আছে।

১১. তরিকায়ে হাজ্জ

طريقه حج

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মুফতি সাহেব উর্দু ভাষায় হজ্জের বিস্তারিত মাসআলা মাসাঈল সম্বলিত এ কিতাব রচনা করেন। একই সালে আন্তর্জাতিক অনুবাদ বোর্ড ঢাকা থেকে কিতাবখানা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুফতি সাহেবের অনুমতি নিয়ে তাঁর ছাত্র মাওলানা এ. এইচ. এম লুৎফুর রাহমান এ কিতাবখানা বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন।

১২. মশকে ফারাইয

مشق فرائض

ফিকহ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ফারাইয বা উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন বিজ্ঞান। এ বিষয়ে উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে বহুল পঠিত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসভূক্ত কিতাব হলো ইমাম আবু তাহির সিরাজুদ্দীন ইবন মুহাম্মাদ আবদুর রাশীদ (ওফাত ৬০০ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আরবি ভাষায় রচিত *আসসিরাজি ফিল মিরাছ*। মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষায় প্রশ্নোত্তর আকারে রচনা করেন মশকে ফারাইয। একই সালে ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সলেশন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৩. হিদায়াতুল মুসাল্লিসন

هداية المصلين

সহজ সরল উর্দু ভাষায় রচিত এ কিতাবে নামাযের যাবতীয় মাসআলা মাসাঈল, নিয়ম পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি শেষদিকে জুমুআ, দুই ঈদ ও বিয়ের খুতবা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আমল করার উপযোগি সহীহ হাদীস সমর্থিত কতিপয় ওযিফা, মাসনুন দোয়াও সংযুক্ত করা হয়েছে।

উর্দু কিতাবখানা প্রকাশিত হয়নি। তবে মুফতি সাহেবের অনুমতি নিয়ে তাঁর দু'জন ছাত্র মাওলানা লুকমান আহমদ আমীমী ও মাওলানা আ. হ. ম. লুৎফুর রাহমান পাণ্ডুলিপি থেকে কিতাবখানা বাংলা অনুবাদ করেন। লিখকের জীবদ্দশায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে অনুদিত কিতাবখানা ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৩ পৃষ্ঠার এ কিতাব ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মুদ্রণ করা হয়েছে এ কিতাবে।

ঘ. সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাম

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

১. আওজাযুস সিয়ার

أوجز السير

খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত এ রিসালা সীরাত প্রেমীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মৌলিক দিকগুলো প্রামান্য সূত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ছারছিনা দারুস সুন্নাত মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির কর্তৃক এক নজরে সীরাতুন্নবী শিরোনামে এ রিসালার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

২. আনফাউস সিয়ার

انفع السير

মুফতি সাহেবের রচনাবলির তালিকায় সীরাত বিষয়ক এ কিতাবের নাম পাওয়া যায়। এটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না।

ঙ. ইলমে তাসাউফ

علم التصوف

১. আততাশাররুফ লিআদাবিত তাসাউফ

التشرف لآداب التصوف

মুফতি সাহেব স্বীয় উস্তাদ শামসুল উলামা মাওলানা বিলায়েত হোসাইন বীরভূমী রাহিমাহুল্লাহ'র নির্দেশনায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এ কিতাব রচনা করেন।

এ কিতাবের প্রথম অংশে ইলমে তাসাউফের পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও বিধি বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ, বাইআতের নিয়ম পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা এবং

সূফিগণ প্রবর্তিত বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন আমল করার নিয়ম আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অংশে মুজাদ্দিদিয়া, নকশবন্দিয়া, কাদিরিয়া, চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার পরিচিতি এবং এ পাঁচ তরীকায় মুফতি সাহেব নিজের শাজরা লিপিবদ্ধ করেছেন। পাদটীকায় সূফিতত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাবের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে এ কিতাব প্রকাশিত হয়।

২. রিসালায়ে তরীকা

رساله طريقه

মুফতি সাহেবের রচনাবলির তালিকায় উর্দু ভাষায় রচিত ইলমে তাসাউফ বিষয়ক এ কিতাবের নাম পাওয়া যায়। বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না।

চ. ইসলামের ইতিহাস

تاريخ الإسلامي

১. তারীখে ইসলাম

تاريخ اسلام

উর্দু ভাষায় রচিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০৮। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কুরআন মনজিল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড খিলাফাতে রাশিদা ও বনু উমাইয়্যা সালতান পর্যন্ত। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার একই প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় খণ্ড আব্বাসি সালতানাত, মিশর কেন্দ্রীক ফাতিমী সালতানাত, স্পেনে মুসলিম শাসন, তুরস্ক কেন্দ্রীক উসমানী সালতানাতের পতন পর্যন্ত। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সলেশন বোর্ড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মুফতি সাহেব তাঁর এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম'র শুভ জন্মের পূর্ব থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানী সালতানের পতনের সূচনাকাল পর্যন্ত ইতিহাস বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থের আংশিক বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

২. তারীখে ইলমে হাদীস

تاريخ علم حديث

কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণিতে সাধারণ ইতিহাসের পাশাপাশি ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ এর ইতিহাস পাঠদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহকে এ দু'টি বিষয় পাঠদানের অনুরোধ করা হয়। তিনি সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন পূর্বক ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে নিয়মিত পাঠদান শুরু করেন। মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তর হবার পরও এ ধারা অব্যাহত রাখা হয়।

মুফতি সাহেব ইলমে হাদীসের ইতিহাস পাঠদানের সুবিধার্থে যে নোট তৈরি করেন তাই পরবর্তীতে তারীখে ইলমে হাদীস শিরোনামে গ্রন্থরূপ লাভ করে। উর্দু ভাষায় রচিত ১৫৯ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে করাচী থেকে প্রথম প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৯৬০ এবং ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলা অনুবাদ হয়ে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস নামে মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান অনূদিত তারীখে ইলমে হাদীস চট্টগ্রামের নিশান প্রকাশনী থেকে ২০১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. তারীখে ইলমে ফিকহ

تاريخ علم فقه

এ গ্রন্থে ইলমে ফিকহ'র উৎপত্তি ও ক্রমবিকশের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ ১৯৫৫

খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর মাকতাবায়ে বুরহান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে আবু সায়ীদ আব্দুল্লাহ কর্তৃক এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ছ. বিবিধ বিষয়

১. মিন্নাতুল বারী

منة الباری

আরবি ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত এ কিতাব হলো মুফতি সাহেবের ছাবাত। মুফতি সাহেব তাঁর উস্তাদগণের কাছ থেকে ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাসাউফের যে সনদ লাভ করেছিলেন তা এ কিতাবে গ্রন্থিত হয়েছে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে এ কিতাব প্রকাশিত হয়।

২. সিরাজে মুনীর মীলাদনামা

سراج منیر میلاد نامه

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের বারাকাত ও মর্যাদা এবং মাহফিলে পাঠ উপযোগী শুভ জন্মকালে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী, নসবনামা ইত্যাদি গ্রন্থিত হয়েছে এ রিসালায়। মূলত: উর্দু ভাষায় রচিত হলেও বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আরবি উদ্ধৃতি রয়েছে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত রিসালাখানা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. আল খুতবাত লিল জুমুআত

الخطبات للجمعات

মুফতি সাহেব কলকাতা নাখোদা মসজিদ ও ঢাকা বায়তুল মুকাররম মসজিদে খতীব থাকাকালীন জুমুআয় যে খুতবাহ প্রদান করেন তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। প্রাপ্ত তথ্য মতে এ

খুতবা গ্রন্থ তিন খণ্ডে সমাপ্ত। তবে তাঁর ভাই সায়্যিদ নুমান বারাকাতির কাছে সংরক্ষিত ডাবল ডিমাই সাইজের সাদা কাগজে হস্তলিখিত ১৪৫ পৃষ্ঠা বাঁধাই করা একটি খণ্ড আছে। এতে মোট ৬৫টি খুতবা স্থান পেয়েছে।

এ খুতবা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

৪. শরহে শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া

شرح شكوه وجواب شكوه

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত বহুল পঠিত ও সমাদৃত দু'টি দীর্ঘ কবিতা শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুফতি সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ফাযিল শ্রেণিতে শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া পাঠদান করেন। এ সময় তিনি ছাত্রদের জন্য এ দুই কবিতার শরাহ বা ব্যাখ্যা রচনা করেন।

মুফতি সাহেব প্রণীত এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

৫. ওসিয়ত নামা

وصيت نامه

মুফতি সাহেব উর্দু ভাষায় পত্রাকারে আপন উত্তরাধিকারী, বন্ধু বান্ধব, ছাত্র ও মুরিদানের প্রতি শেষ ওসিয়তনামা লিখে যান। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এ ওসিয়তনামা প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীতে মুফতি সাহেবের ছাত্র ও মুরীদ মাওলানা লুকমান আহমদ আমীমী এ ওসিয়তনামা বঙ্গানুবাদ করেন। অনুদিত ওসিয়ত নামায় মুফতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করে সায়্যিদ নুমান বারাকাতী ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন।

তথ্য সূত্র

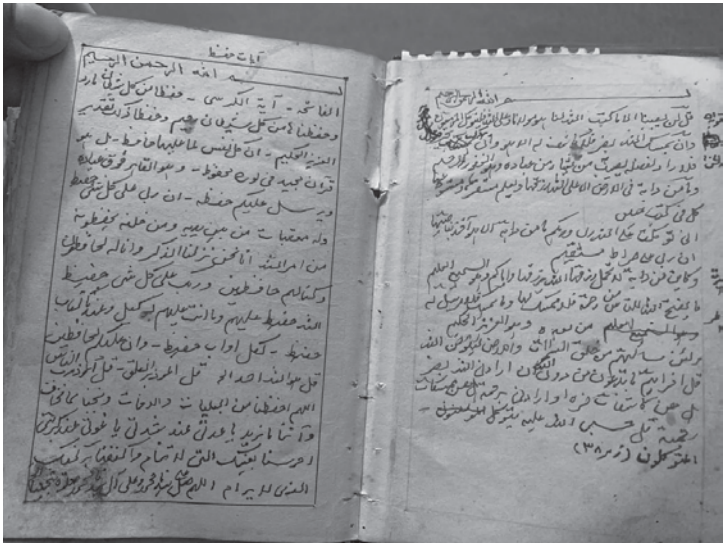
১. মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান
ড. এ. এফ.এম. আমীনুল হক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।

২. একটি পূণ্যময় জীবন
আবুল কাসেম ভূঁইয়া
তাওহীদ প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৮।

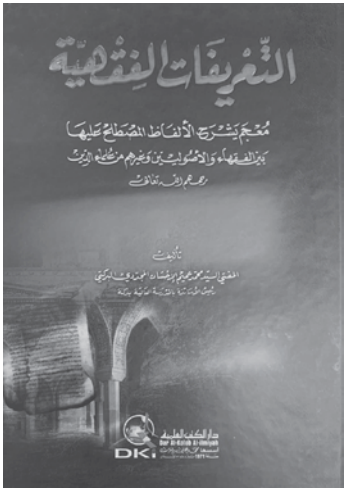
৩. ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার
পার্শ্বটীকা : মাওলানা ড. সাইফুল ইসলাম আল আযহারী
দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন ২০১০।

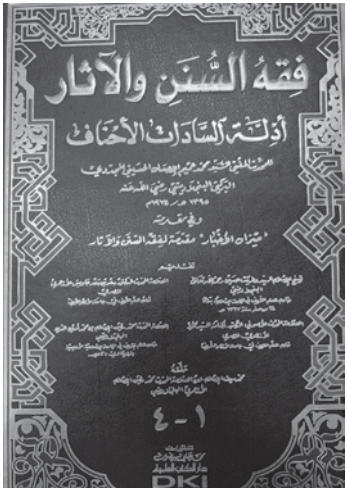
৪. হাওয়াশিউস সা'দী
পার্শ্বটীকা : শায়খ নুরুল বাশার
মাকতাবা মা'হাদ উসমান বিন আফফান, করাচী- পাকিস্তান ২০১৬।

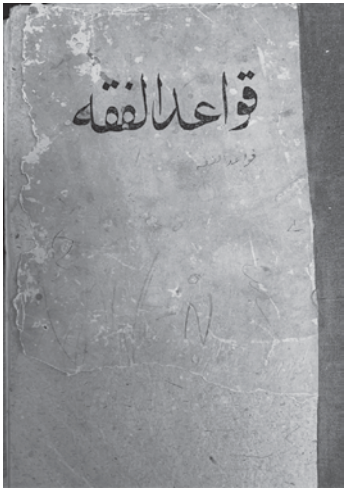
৫. আদাবুল মুফতি
পার্শ্বটীকা : শায়খ আদিল আইউব
করাচী, পাকিস্তান, ১৪৩৮ হিজরি।

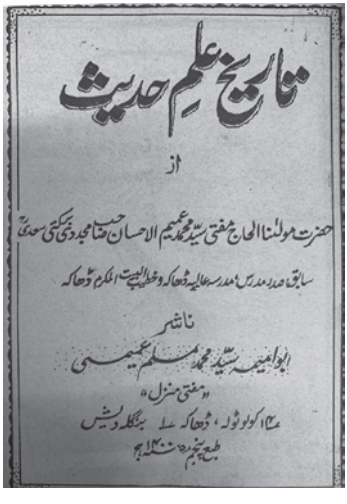


মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লা'র হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির দুই পৃষ্ঠা।









প্রকাশিত কয়েকটি কিতাবের প্রচ্ছদ চিত্র।



মাযার শরীফের বাহির দেয়াল।



মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লা'র মাযার শরীফ।





২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ ঢাকার কলুটুলাস্থ মুফতি মনজিলে মুফতি সাহেবের বর্তমান উত্তরাধিকারীগণের সাথে।

মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ

১৯৪৬-২০০৪



হুজ্জাতুল ইসলাম, মুহাদ্দিসুল হিজায, ইমামু দারিল বা'ছাহ প্রভৃতি অভিধায় ভূসিত আওলাদে রাসূল সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী ছিলেন এ যুগের এক বিস্ময়কর প্রতিভাধর আলিম। সীমাহীন প্রতিকুলতা ও রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে যিনি পবিত্র মক্কা মুকাররামাসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের বুকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঝান্ডা সমুন্নত রেখেছিলেন। তাঁর দারস ও তাদরীস এবং প্রামান্য বক্তব্যের সামনে বিরুদ্ধবাদিরা চুপ মেরে যেতো। রাষ্ট্র যন্ত্র ব্যবহার করে যার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে না পেরে গুপ্ত ঘাতক লেলিয়ে দিয়ে প্রাণ সংহারের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে বহুবার।

জন্ম ও শিক্ষা

মক্কা শরীফে ইলম ও কামালে খ্যাতিমান *আল মালিকী* পরিবারে ১৩৬৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ। পিতৃ ও মাতৃ উভয় দিক থেকে নবী বংশের সন্তান সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সায়্যিদিনা ইমাম হাসান রাদিয়ালাহু আনহুর পুত্র ইমাম সায়্যিদ হাসান আল মুসান্না রাহিমাহুল্লাহ'র অধ:স্তন পুরুষ। তাঁর পিতা মক্কা শরীফের বিখ্যাত আলিম মুহাদ্দিসুল হারামাইন সায়্যিদ আলাওয়ী ইবন আব্বাস আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ (১৩২৮-১৩৯১ হিজরি) দীর্ঘ দিন মসজিদে

হারামে মুদাররিস ছিলেন। মসজিদে হারামে তিনি হাদীস ও ফিকহে মালিকী নিয়মিত দারস প্রদান করতেন। তাঁর দাদা সায়্যিদ আব্বাস ইবন আবদুল আযীয আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মসজিদে হারামের ইমাম ও খতীব এবং উসমানী খিলাফতের শেষ পাদে মক্কা শরীফের কাযী বা বিচারপতি। উসমানী খিলাফতের অপ্রত্যাশিত পতনের পরও তাঁকে বিচারকের পদে বহাল রাখা হয়। মালিকী পরিবারের মূল বসত ছিলো মসজিদে হারামের বাবুস সালামের কাছাকাছি। মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সরকার তাঁদের পরিবারকে মক্কা শরীফের রুসাইফা নামক স্থানে স্থানান্তর করে। মালিকী পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে রুসাইফার সে সড়কের নামকরণ করা হয় شارع المالكي বা মালিকী রোড।

সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আলিম পিতার কাছেই শিক্ষার সূচনা করেন। বাল্য বয়সে তিনি কুরআনুল কারীম হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর পিতা তাঁকে নিজ গৃহ এবং মসজিদে হারামে আরবি সাহিত্য, নাহু, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দান করেন। পাশাপাশি মক্কা শরীফের বিখ্যাত দুই প্রতিষ্ঠান মাদরাসা আল ফালাহ ও মাদরাসা সওলতিয়্যায় অধ্যয়ন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে তিনি মক্কা ও মদীনা শরীফের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরামের কাছে উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস, ফিকহ ও উসূল প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রখর মেধা ও কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতা এবং অন্যান্য উস্তাদগণের কাছ থেকে ইজাযাত ও সনদ লাভে সক্ষম হন। পিতার নির্দেশে এসময় তিনি মসজিদে হারামে হাদীস এবং ফিকহ বিষয়ে বিশেষ দারস প্রদান শুরু করেন।

কয়েক বছর পর তাঁর পিতা উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূলুদ দীন বিভাগে তিনি সুনামের সাথে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।পরবর্তীতে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি সম্পন্ন করেন।

জ্ঞান অন্বেষণে সফর

ইলমের সন্ধানে সফর করা সালফে সালিহীন'র একটি সুবিদিত পন্থা। মুহাদ্দিসুল হিজায সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তীদের অনুসরণে ইলমের অন্বেষণে মিশর, ইরাক, সিরিয়া, ইয়ামান, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, সুদান, লিবিয়া, পাকিস্তান ও ভারত সফর করেন। প্রতিটি দেশের খ্যাতিমান আলিমগণের কাছ থেকে ইলমি ফায়দা হাসিল করে তিনি সনদ প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন দেশের যেসকল উলামার কাছ থেকে তিনি ইজাযাত ও সনদ লাভ করেন তাঁরা হলেন-

হিজায (মক্কা ও মদীনা শরীফ)

১. তাঁর পিতা মুহাদ্দিসুল হারামাইন শায়খ সায়্যিদ আলাওয়ী ইবন আব্বাস আল মালিকী আল মাক্কী (ওফাত ১৩৯১ হিজরি)।

২. শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আল আমান মাক্কী (ওফাত ১৩৮৭ হিজরি)।

৩. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল আরাবি আত তাব্বানি (ওফাত ১৩৯০ হিজরি)।

৪. শায়খ হাসান সায়্যিদ আল ইয়ামানি আল মাক্কী (ওফাত ১৩৯১ হিজরি)।

৫. শায়খ হাসান আল মাশশাত (ওফাত ১৩৯৯ হিজরি)।

৬. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আমিন কুতবি (ওফাত ১৪০৪ হিজরি)।

৭. শায়খ হাবীব আবদুল কাদীর আল বার।

৮. শায়খ হাবীব হাসান ইবন মুহাম্মাদ ফাদাক।

৯. শায়খ ইয়াসিন আল ফাদানি (ওফাত ১৪১০ হিজরি)।

১০. শায়খ নূর সাইফ ইবন হিলাল (ওফাত ১৪০৩ হিজরি)।

১১. শায়খ আবদুল্লাহ আল লাহজি (ওফাত ১৪১০ হিজরি)।

১২. শায়খ হাসান আশ শায়ির(ওফাত ১৪০০ হিজরি)।

১৩. শায়খ দিয়াউদ্দীন আহমাদ আল কাদিরী আল মাদানী (ওফাত ১৪০১ হিজরি)

১৪. শায়খ আহমাদ ইয়াসিন আল খিয়ারি

১৫. শায়খ মুহাম্মাদ আশশানকিতি আল মাদানী

১৬. শায়খ ইবরাহীম আল কাত্তানী বুখারি আল মাদানী

১৭. শায়খ আবদু গফুর আল আব্বাসি নকশবন্দী

ইয়ামান ও হাদারামাউত

১. শায়খ হাবীব উমার ইবন আহমাদ আস সুমায়িত

২. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ জাবারা

৩. শায়খ সায়্যিদ ইবরাহীম ইবন আকীল আল বা'লাবী

৪. শায়খ সায়্যিদ আলী ইবন আবদুর রাহমান আল হাবশী

৫. শায়খ সায়্যিদ হাসান ইবন আবদুল বারী আল আখদাল

৬. শায়খ হাবীব আলাওয়ী ইবন আবদুল্লাহ

৭. শায়খ ফাদাল ইবন মুহাম্মাদ বাফাদাল

৮. শায়খ হাবীব আবদুল্লাহ ইবন আলাওয়ী আল আত্তাস

৯. শায়খ হাবীব মুহাম্মাদ ইবন সালীম

১০. শায়খ হাবীব আহমাদ মাশহুর আল হাদ্দাদ

১১. শায়খ হাবীব আবদুল কাদির সাক্কাফ

সিরিয়া

১. শায়খ আবুল ইয়াসার ইবন আবিদীন

২. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল মাক্কী আল কাত্তানি

৩. শায়খ মুহাম্মাদ আসাদ আল আবাদি

৪. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ সালিহ আল ফারফুর

৫. শায়খ হাসান হাবান্নাকা আল মায়দানি

৬. শায়খ আবদুল আযীয উয়ুন আল সুদ আল হিমসি

৭. শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ আল আলাওয়ী আল রিফাঈ

মিশর

১. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল হাফিয আত তিজানি

২. শায়খ হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ

৩. শায়খ সালিহ আল জা'ফরি

৪. শায়খ আমীন মাহমুদ সুবকি

৫. শায়খ মুহাম্মাদ আল আকারি

৬. শায়খ হাসান আল আদাবি

৭. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ আবুল উয়ুন আল খালওয়াতি

৮. শায়খ ড. আবদুল হালীম মাহমুদ

মরোক্ক, আলজেরিয়, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া

১. শায়খ সায়্যিদ আবদুল কাবীর সাকালি আল মাহি

২. শায়খ সায়্যিদ আবদুল্লাহ ইবন সিদ্দীক আল গুমারি

৩. শায়খ সায়্যিদ আবদুল আযীয ইবন সিদ্দীক আল গুমারি

৪. শায়খ শরীফ ইদরীস সান্নুসি

৫. শায়খ মুহাম্মাদ তাহির ইবন আহুর

৬. শায়খ তায়্যিব আল মুহাজির জাযায়িরি

৭. শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল মুনতাসির আল কাত্তানি

সুদান

১. শায়খ মুদ্দাসসির ইবরাহীম

২. শায়খ ইউসুফ হামাদ আল নীল

৩. শায়খ তায়্যিব আবু কিনায়া

ভারত ও পাকিস্তান

১. শায়খ যাকারিয়্যা কান্দুলবী আল মাদানী

২. শায়খ হাবীবুর রাহমান আযমি

৩. শায়খ মুফতি মুহাম্মাদ শফি

৪. শায়খ মুফতি মুস্তাফা ইবন আহমাদ রেদা খান বেরলবী

৫. শায়খ সায়্যিদ ইউসুফ বিন্নুরি

শিক্ষকতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে স্বীয় উস্তাদগণের নির্দেশে মসজিদে হারামে হাদীস ও ফিকহ'র বিশেষ দারস প্রদান শুরু করেন সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী। তবে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষকতা শুরু হয় আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তনের পর। ১৩৯০ হিজরির মধ্যভাগে তিনি কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে কুল্লিয়াতুশ শরীয়াহ বিভাগে সরাসরি প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

১৩৯১ হিজরি মুতাবিক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার ইন্তিকালের তিন দিন পর মক্কা শরীফের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম তাঁদের বাড়িতে সমবেত হন। পিতার স্থলাভিসিক্ত হয়ে মসজিদে হারামে নিয়মিত দারস প্রদানের অনুরোধ জানান তাঁরা। প্রায় ছয় শতাধিক বছর ধরে তাঁর পরিবারের উর্ধতন পুরুষগণের ঐতিহ্য মসজিদে হারামে দারস প্রদানের এ ধারা অব্যাহত রাখতে ১৩৯১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মসজিদে হারামে নিয়মিত দারস প্রদান শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জ্ঞানগর্ভ দারসের খ্যাতি সৌদিআরবের গণ্ডি পেরিয়ে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কেবল সৌদি আরব নয় বরং বিভিন্ন দেশের জ্ঞান

পিপাসুরা ভীড় করতে থাকে দারসে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তিউনিসিয়া, সুদান, ইয়ামান, মিশর ও আরব আমিরাতের বিপুল সংখ্যক ছাত্র তাঁর দারসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকে। হাদীস, ফিকহ ও সীরাতের দারসে তিনি আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকীদাসমূহ প্রামান্যভাবে জোরালো উপস্থাপন করতেন। ফলে বোদ্ধা মহলে তাঁর দারস ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। সে সময় থেকেই কথিত সালাফি উলামার কপালে চিন্তার ভাজ পড়তে থাকে, শুরু হয় নানামূখি ষড়যন্ত্র।

আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র বলিষ্ঠ অবস্থান কেবল দারস ও তাদরীসে সীমিত থাকেনি। বরং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও লিখনীর মাধ্যমে তিনি তা জোরালো প্রচার শুরু করেন। পবিত্র নগরীর রুসাইফায় অবস্থিত নিজ বাড়িকেও তিনি ইলমি মারকায হিসেবে গড়ে তুলেন। মসজিদে হারামে দারস অব্যাহত রেখে তিনি নিজ বাড়িতেও হাদীসের দারস, যিকির মাহফিল, কাসীদা ই বুরদা'র মাহফিল, মীলাদ মাহফিল শুরু করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত বিশেষ মাহফিল চলতো তাঁর বাড়িতে। প্রথমে কুরআনুল কারীম থেকে তিলাওয়াত হতো,তারপর কিছু সময় কাদিরিয়া তরীকানুযায়ি যিকির হতো। যিকির শেষে মক্কা শরীফের শ্রেষ্ঠ মুনশিদগণ সমবেত কণ্ঠে কাসীদা ই বুরদা পরিবেশন করতেন। সবশেষে ইমাম বরযিনজি রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত মওলুদে বরযিনজি খ্যাত ইকদুল জাওহার ফী মাওলিদিননাবীয়্যিল আযহার কিতাব পূর্ণ পড়া হতো। কিয়ামরত অবস্থায় দীর্ঘ সময় সালাত সালাম পেশ করে মুনাজাত হতো। তারপর আগত মেহমানদের খাবার পরিবেশন করা হতো (ওয়ালিদ কিবলার সাথে এক বৃহস্পতিবার উনার মাহফিলে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিলো)।

ইলমে তাসাউফের খিদমাত

সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী তাঁর সময়ে ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও শ্রেষ্ঠ ওলি। তাসাউফে তিনি কাদিরিয়া এবং নকশবন্দিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। তিনি তরীকতের বাইআত গ্রহণ

করতেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তাঁর অসংখ্য মুরিদান রয়েছেন। তিনি নিজ বাড়িতে নিয়মিত মুরিদানকে তালিম তারবিয়াত প্রদান করতেন। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর বিপুল সংখ্যক মুরিদান রয়েছেন। প্রতি বছর তিনি ইন্দোনেশিয়া সফর করতেন। কয়েকদিন ব্যাপী তারবিয়াতি মাহফিল হতো সেখানে।

অন্যান্য দায়িত্ব

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, মসজিদে হারাম ও নিজ বাড়িতে দারস প্রদানের পাশাপাশি বাদশার অনুরোধে তিনি ১৩৯৯ হিজরি থেকে ১৪০১ হিজরি পর্যন্ত মক্কা শরীফে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হিফযুল কুরআন প্রতিযোগীতায় সপাপতিত্ব করেন।

১৩৯১ হিজরিতে তাঁকে রাবেতা আলম আল ইসলামীর সম্মানিত সদস্য মনোনীত করা হয়। সে বছর থেকে ১৪০২ হিজরি পর্যন্ত তিনি রাবেতা আলম আল ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। মরক্কোতে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ইমাম মালিক কনফারেন্সে মূল আলোচক থাকতেন তিনি। ১৪১৬ হিজরির প্রথম থেকে তাঁকে মালয়েশিয়া ইসলামি ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর মনোনীত করা হয়। ১৪২১ হিজরি মোতাবেক ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মিশরের আল আযহার ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর মনোনীত করা হয়।

ষড়যন্ত্রের শিকার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ'র দারস ও তাদরীস এবং লিখিত প্রামান্য কিতাবাদি বোদ্ধা মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে কথিত সালাফী উলামা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এমনকি বহুমূখি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিগত শতকের আশির দশকে প্রথমে কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটি পরে মসজিদে হারাম'র শিক্ষকতা থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। এসময়েই তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয়। এমন কি নজদি সালাফী আলিম শায়খ আবদুল্লাহ ইবন সুলাইমান ইবন মানি *হিওয়ার মাআল মালিকী ফী রাদ্দি*

দালালাতিহি ওয়া মুনকারাতিহি নামে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রন্থ লেখে প্রচার করেন। সে গ্রন্থে সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদা বিশ্বাসে শিরক বিদআত আছে বলে প্রচার করা হয়। ইসতাওয়া আলাল আরশ (استوى على العرش), উসিলা (التوسل بالنبى والصالحين), যিয়ারতের নিয়তে সফর (شد الرحال) মীলাদুন্নাবী মাহফিল (الاحتفال بالمولد) প্রভৃতি মাসআলায় তাঁর অবস্থান ভুল এমন কি কোন কোনটিতে তিনি শিরকের মধ্যে আছেন প্রমানের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর বংশ অর্থাৎ খান্দানে রাসূল সম্পর্কেও কটুক্তি করা হয় সে গ্রন্থে।

শায়খ আবদুল্লাহ ইবন সুলাইমান ইবন মানি লিখিত উল্লিখিত গ্রন্থের জবাব সৌদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, রিফাঈয়্যা তরীকার প্রখ্যাত বুযুর্গ আলিম কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী সায়্যিদ ইউসুফ ইবন হাশিম আররিফাঈ (১৯৩২-২০১৮ খ্রি.) রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত জবাবী গ্রন্থ ادلة اهل السنة الجماعة المسمى الرد المحكم المنيع শায়খ রিফাঈ তাঁর গ্রন্থে সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদা সম্পর্কে উত্থাপিত প্রতিটি অভিযোগের প্রামান্য জবাব দিয়েছেন। কয়েক বছর আগে এ গ্রন্থখানা বঙ্গানুবাদ করেছেন ড. আবদুল্লাহ আল মা'রূফ।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সুবিধা বঞ্চিত মুসলিম শিশু কিশোরদের জন্য সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী বেশ কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ৭০টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এসকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি তাঁর আর্থিক অনুদানে পরিচালিত হয়।

ইন্তিকাল

১৪ রামাদান ১৪২৫ হিজরি মোতাবেক ২৮ অক্টোবর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার তারাবীহ নামাযের পর তিনি নিজ বাড়িতে সংক্ষিপ্ত দারস

প্রদান করেন। সেহরির সময় ঘনিয়ে এলে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অল্প সময়ের মধ্যে পরপারে পাড়ি জমান যুগের নকীব এ মনীষী।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ডায়বেটিস ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন রোগ তাঁর ছিলো না। ২৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিনের বেলা প্রচণ্ড জ্বরের প্রকোপে প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা হয়। হাসপাতালে নেয়া হলে সামান্য কিছু চিকিৎসা নিয়ে ডাক্তারদের নিষেধ অমান্য করে তিনি বাড়ি ফিরতে চান। বেশি পীড়াপীড়ি করলে জোরালোভাবে বলেন, *আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি আমার ছাত্রদের সাথে থেকে মরতে চাই*। অগত্যা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

ইন্তিকালের তিন দিন আগে তিনি টেলিফোনে ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর একজন সাবেক ছাত্রের সাথে কথা বলেন। জিজ্ঞেস করেন, *তুমি কি এবার রামাদানে মক্কা শরীফ আসবে না?* উনি না সূচক জবাব দিলে বলেন, *তাহলে তুমি কি আমার জানাযায় শরীক হবে না।*

১৫ রামাদান শুক্রবার প্রথমে রুসাইফায় তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন তাঁর ভাই শায়খ সায়্যিদ আব্বাস ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ১৪৩৬ হিজরি)। দ্বিতীয় জানাযা হয় মসজিদে হারামে বাদ ইশা। ইমামতি করেন মসজিদে হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আস সুবায়িল (১৯২৪-২০১২)। মক্কা শরীফের কেন্দ্রীয় গোরস্থান আল মুআল্লায় উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়ালাহু আনহার কবরের পাশে তাঁর পিতার কবরের সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত ইংলিশ পত্রিকা আরব নিউজ সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র ইন্তিকাল সংবাদ শিরোনাম করে *মক্কা তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বিদায় জানালো*। আক্ষরিক অর্থেই এ মনীষী ছিলেন সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

উল্লেখ্য যে, সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুলা'র বড় সন্তান শায়খ সায়্যিদ আহমাদ হাফিযাহুল্লাহ পিতার স্থলাভিসিক্ত হয়ে নিজ বাড়িতে দারস তাদরীস, তালিম তারবিয়াত অব্যাহত রেখেছেন। সম্প্রতি তিনি মিশরের আল আযহার ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন।

রচনাবলি

মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে মোট একশ বিশটি কিতাব প্রণয়ন করেছেন। অধিকাংশই আরব আমিরাত, মিশর, জর্দান ও লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈরুতের বিখ্যাত প্রকাশনী মাকতাবাতুল আসরিয়্যা থেকে তাঁর বিভিন্ন কিতাব নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

নিম্নে তাঁর রচিত কয়েকটি কিতাবের নাম দেয়া হলো।

উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদীস বিষয়ক রচনা

১ القواعد الأساسية في علوم القرآن

২ حول خصاءص القرآن

৩ زبدة الاتقان في علوم القرآن

৪ القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث

৫ المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف

৬ العقد الفريد المختصر من الاثبات والأسانيد

৭ فهرست الشيوخ والأسانيد للامام السيد علوي بن عباس المالكي الحسني

৮ انوار المسالك في المقارنة بين روايات الموطأ للامام مالك

৯ فتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب والترهيب

১০ الموطأ برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي

ইলমুল আকাঈদ ও উসূলে ফিকহ বিষয়ক রচনা

১১ منهج السلف في فهم النصوص

১২ هو الله

১৩ قل هذه سبيلي

১৪ جلاء الأفهام شرح عقيدة العوام

১৫ مفاهم يجب ان تصحح

১৬ القواعد الأساسية في أصول الفقه

১৭ شرح منظومة الورقات في أصول الفقه

সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ক রচনা

১৮ تاريخ الحوادث وأحوال النبوية

১৯ الفية السيرة النبوية

২০ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

২১ محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل

২২ الأنوار البهية من اسراء ومعراج خير البرية

২৩ وهو بالأفق الأعلى

২৪ جوهرة التاج على تبصرة المحتاج إلى بحوث صاحب المعراج

বইতুল্লাহ শরীফের ইতিহাস, হাজ্জ ও যিয়ারাতুন্নবী বিষয়ক রচনা

২৫ من رحاب البيت الحرام

২৬ في رحاب البيت الحرام

২৭ لبيك اللّٰهُمَّ لبيك

২৯ الحج فضاءل واحكام

৩০ شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد صلى الله عليه وسلم

৩১ الزيارة النبوية بين الشرعية والبدعية

ইলমে তাসাউফ, আযকার এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ক রচনা

৩২ تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال

৩৩ كشف الغمة في اصطناع المعروف ورحمة الامة

৩৪ خصاءص الامة المحمدية

৩৫ ما لا عين رأت

৩৬ في سبيل الهدى والرشاد

৩৭ ما ذا في شعبان

৩৮ أبواب الفرج

৩৯ من شوارق الأنوار

৪০ خلاصة شوارق الأنوار

৪১ مخ العبادة لأهل السلوك والإرادة

৪২ الواردة القلبية

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের বৈধতা বিষয়ক রচনা

৪৩ حول الاحتفال بذكرى المولد الشريف

৪৪ التحقيق والتعليق على مولد الحافظ ابن الديبع

৪৫ التحقيق والتعليق على المورد الراوي في مولد النبوي للأمام على القاري

৪৬ الإعلام بفتاوى اءمة الاسلام حول مولده عليه الصلاة والسلام

অরিএন্টালিজম এবং অন্যান্য বিষয়ক রচনা

৪৭ المستشرقون بين الإنصاف والعصبية

৪৮ القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله

৪৯ الرسالة الإسلامية كمالها وخلودها وعالميتها

৫০ شريعة الله الخالدة

৫১ الغلو وأثره في الإرهاب وإفساد المجتمع

৫২ مفهوم التطور والتجديد في الشريعة الإسلامية

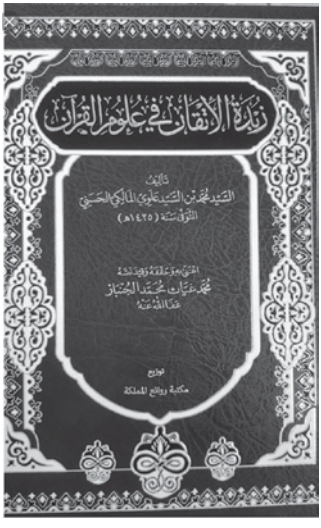
জীবনী বিষয়ক রচনা

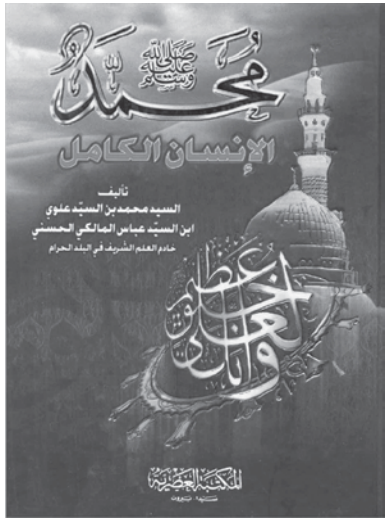
৫৩ ام المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله عنها

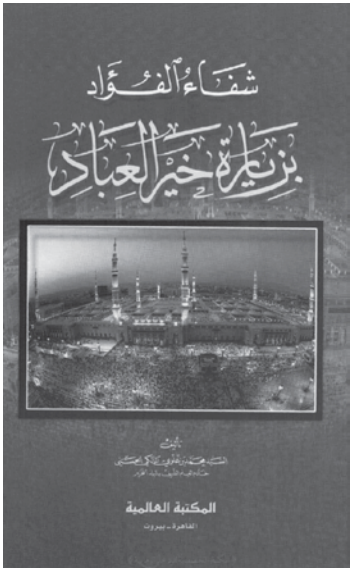
৫৪ امام دار الهجرة مالك بن انس

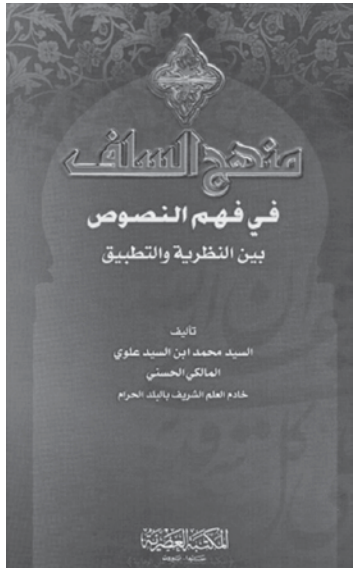
তথ্যসূত্র

- امام دار البعثة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وآثاره في فكر الإسلامي
  الدكتور السيد حمد عبد الكريم رواح الحسيني
- رجال من مكة المكرمة الجزء الثاني
  الشيخ زهير محمد جميل كتبي
- ترجمة فضيلة السيد العلامة محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى
  الشيخ السيد ابي الفضل احمد بن منصور قرطام الحسيني التونسي الفلسطيني
- محدث الحجاز السيد محمد بن علوي المالكي وجهوده الكلامية
  الشيخ اشرار ثامر هادي العبيدي

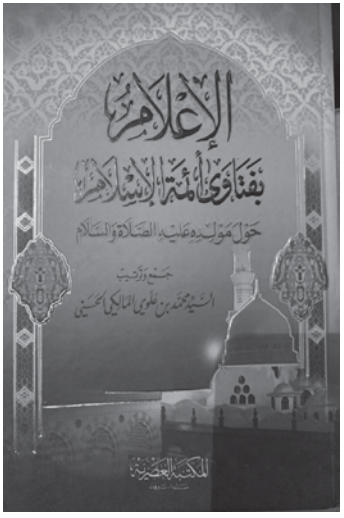




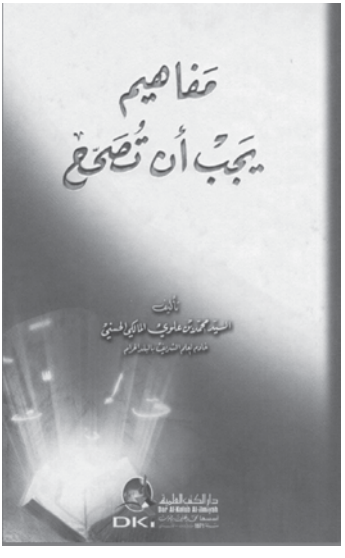


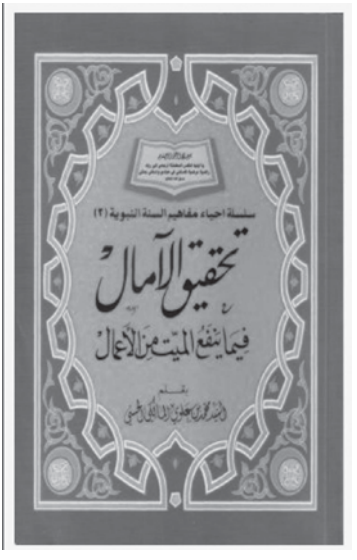


মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ'র প্রকাশিত কয়েকটি কিতাবের প্রচ্ছদ চিত্র।









মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী রাহিমাহুল্লাহ'র প্রকাশিত কয়েকটি কিতাবের প্রচ্ছদ চিত্র।

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহ

জন্ম: ১৯৩৪



সিলেটের জকিগনজ উপজেলার রারাই গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন সর্বসাধারণের কাছে *মুহাদ্দিস ছাহেব* খ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান। তাঁর পিতা এলাকার খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন মরহুম মাওলানা মুমতায আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মাতা মরহুমা আমিনা খাতুন। সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়।

শিক্ষা জীবন

এলাকার প্রাইমারি স্কুলে কিছু দিন লেখা পড়া করে বাল্য বয়সেই তিনি বড় ভাই মরহুম মাওলানা নজিবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে বর্তমান ভারতের বদরপুর সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে কিছু দিন লেখা পড়া করে ফিরে এসে কানাইঘাট উপজেলাধিন সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। সড়কের বাজার মাদরাসার ছাত্র থাকাকালীন শিক্ষকগণের উৎসাহে পার্শ্ববর্তী প্রাইমারি স্কুল থেকে জেলা ভিত্তিক প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে সিলেটের অন্যতম প্রাচীন ইসলামী বিদ্যাপিঠ গাছবাড়ি জামেউল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডের অধিন আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একই মাদরাসা থেকে ১৯৫৭ সালে ফাযিল পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায়

তৃতীয় স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯ সালে হাদীস বিভাগে কামিল পরীক্ষায় বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, গাছবাড়ি মাদরাসার ইতিহাসে বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী প্রথম ছাত্র তিনি।

উস্তাদগণ

ইলমে কিরাত, ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ, ইলমে তাসাউফ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন-

১. শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা (১৯১৩-২০০৮)

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আলী (১৯০৭-১৯৬৪)

৩. শায়খুল হাদীস আল্লামা শফিকুল হক (১৯২৭-২০০১)

৪. শায়খুল হাদীস আল্লামা ইদরীস আহমাদ (১৯২৪-২০০৭)

৫. শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল গণি (১৯২০-১৯৮৭)

৬. শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল ওয়াহিদ (১৯০৮-১৯৮১)

৭. বাহরুল উলূম আল্লামা মুহাম্মাদ হুসাইন (১৮৯০-১৯৭২)

৮. মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী (১৯১১-১৯৭৪)

৯. মুহাদ্দিসুল হিজায সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী (১৩৬৫-১৪২৫ হিজরি)

১০. সুলতানুল উলামা সায়্যিদ সালিম ইবন আবদুল্লাহ শাতিরী শাফিঈ ইয়ামনী (১৩৫৯-১৪৩৯ হিজরি)

কর্ম জীবন

১৯৫৯ সালের তিন আগস্ট ইছামতি দারুল উলূম সিনিয়র মাদরাসায় সহকারী মাওলানা পদে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালের দশ এপ্রিল সিলেটের প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদরাসায় যোগ দেন। স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব

কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে ১৯৬৩ সালের তেইশ নভেম্বর সৎপুর দারুল হাদীস মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালের চৌদ্দ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেন। পনেরো জানুয়ারি ইছামতি দারুল উলূম মাদসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে সৎপুর দারুল হাদীস মাদরাসার অধ্যক্ষ নিয়ে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা নিরসন কল্পে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে ১৯৭৬ সালের এগারো অক্টোবর সেখানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে অল্প দিনের মধ্যে মাদরাসার স্থিতিশিলতা ফিরে এলে ১৯৭৭ সালের দুই এপ্রিল সেখান থেকে চলে আসেন।

আরব আমিরাতে

১৯৭৭ সালে সৎপুর মাদরাসা থেকে চলে আসার কিছু দিন পর তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গমন করেন। প্রথমে উম্মুল কুওয়াইন শহরে একটি মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসেবে কাজ করেন। অল্প দিনের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সে দেশের বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি উম্মুল কুওয়াইন কোর্টে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পাশাপাশি পূর্বোল্লোখিত মসজিদে খতীব'র দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, আরব আমিরাতের কর্মজীবনে সরকারি ছুটির দিনে তিনি মরুচারী বেদুঈনদের অবৈতনিক শিক্ষাদান করতেন। বিশেষ করে বয়স্ক বেদুঈনদের কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখাতেন।

আবারো ইছামতিতে

১৯৮২ সালের চৌদ্দ সেপ্টেম্বর আবারো তিনি ইছামতি মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের ফলে তিলে তিলে ইছামতি মাদরাসা পূর্ব সিলেটের শ্রেষ্ঠতম ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁর

একক প্রচেষ্টায় মাদসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। আলিম, ফাযিল ও কামিল ক্লাসের সরকারি মঞ্জুরী এবং স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মাদরাসার বিল্ডিং এবং সুবিশাল মসজিদ তাঁর নীরব সাধনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বর্তমানেও তিনি ইছামতি মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং গভর্ণিংবডির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অর্ধ শতাব্দিরও অধিককাল ধরে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত এ মনীষী অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে কুরআন হাদীসের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশ বিদেশে বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান পেশ করে আসছেন।

বিভিন্ন দেশে দাওয়াতি সফর

যুক্তরাজ্যঃ ১৯৮১ সালে স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে তিনি আরব আমিরাত থেকে প্রথমবারের মত যুক্তরাজ্য সফর করেন। মাত্র পনেরো দিনের সফরে তিনি ছাহেব কিবলার সাথে সে দেশের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত মাহফিলে বয়ান পেশ করেন। স্বল্পদিনের সফর শেষে ছাহেব কিবলার সাথে হজ্জ পালন করে আপন কর্মস্থল আমিরাতে ফেরত যান।

এরপর থেকে তিনি প্রায় প্রতি বছরই যুক্তরাজ্য সফর করেন। এসব সফরে তিনি গ্রেট বৃটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে বিভিন্ন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করছেন। বৃটেনে বসবাসরত তাঁর ছাত্রগণের অনুরোধে ২০০৯ সালে তিনি একাধারে প্রায় নয় মাস সে দেশে অবস্থান করেন। সে সময় প্রতি শনিবার লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ায় *শামাঈলে তিরমিযী* নামক বিখ্যাত হাদীসের কিতাব সম্পূর্ণ দারস পেশ করেন। নিয়মিত সে দারসে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর সংখ্যক উলামা এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। দারস পূর্ণ হলে দুই শতাধিক আলিমকে শামাঈলে তিরমিযীর সনদ প্রদান করেন।

বর্তমানেও বৃটেন সফরকালে বিভিন্ন শহরে *রিয়াদুস সালিহীন* এবং *আল আদাবুল মুফরাদ* নামক হাদীসের কিতাব দারস প্রদান করেন।

যুক্তরাষ্ট্র : ১৯৯৫ সালে আমেরিকায় অবস্থানরত তাঁর ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সে সময় বিভিন্ন শহরে মাহফিল সমূহে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য যে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভন্ন শহরে তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনায় বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সিরিয়া: ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সিরিয়া সফর করেন। সে সময় দামেশক'র বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদগণের সাথে ব্যাপকভাবে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। সে সফরে দামেশকের প্রখ্যাত হানাফী আলিম, *আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিলাতুহু* সহ বহু মূল্যবান কিতাব প্রণেতা শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মাদ সাঈদ সাগিরজী তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। সনদ গ্রহণ উপলক্ষে শায়খ সাগিরজী দামেশকের উল্লেখযোগ্য উলামার উপস্থিতিতে ২৯ অক্টোবর নৈশভোজের আয়োজন করেন। এ ছাড়া বহুগ্রন্থ প্রণেতা শায়খ ড. আজ্জাজ আল খাতীব, শায়খ হিশাম বুরহানী, শায়খ আবদুর রাহমান হাম্মামী প্রমূখ তাঁর সাথে একান্তভাবে ইলমি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে শায়খ হাম্মামী পুরো সফরে নিজে ড্রাইভ করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যান।

মরক্কো: ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মরক্কো সফর করেন। এ সময় *মদিনাতুল আউলিয়া* নামে খ্যাত মারাকাশ শহরে *দালাইলুল খাইরাত* প্রণেতা ইমাম জাযুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম সুহাইলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমূখের মাজার যিয়ারত করেন।

ভারত: ভারতের আসাম প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক সফর করেন। সেসব সফরে মাহফিলে যোগদান ছাড়াও উলামায়ে কিরামের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে হাদীস শরীফের দারস প্রদান করেন।

মিশর : ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মিশর সফর করেন। সেই সফরে কায়রো শহরে সাহাবি উকবা ইবন আমির রাদিয়ালাহু আনহুর মাযার প্রাঙ্গন, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার

প্রাঙ্গন এবং ইতিহাস খ্যাত আল আজহার মসজিদে হাদীস শরীফের দারস প্রদান করেন।

রাজনৈতিক জীবন

শিক্ষকতা ও দাওয়াতি কার্যক্রমের পাশাপাশি একসময় তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীতে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সিলেটের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নেজামে ইসলামের মনোনয়নে তিনি বই প্রতীক নিয়ে তখনকার সিলেট ৭ আসনে (জকিগনজ, বিয়ানীবাজার ও কানাইঘাট) এমএনএ পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে সম্মানজনক ভোট পান। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ আনজুমানে ইসলাহ'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আনজুমানে আল ইসলাহ মনোনীত ও সন্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তিনি জাতীয় নির্বাচনে দেয়াল ঘড়ি প্রতীক নিয়ে সিলেট পাঁচ আসনে (জকিগনজ-কানাইঘাট) প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন।

পত্রিকা প্রকাশ

১৯৯১ সালে জানুয়ারি মাসে তাঁর সম্পাদনায় সিলেট শহর থেকে *মাসিক শাহজালাল* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ে সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা লাভ করেও ১৯৯৩ সালে নানা কারনে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

এ পর্যন্ত তাঁর লিখিত ও সংকলিত সতেরোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন-

১. আল কাউলুল মাকবুল ফী মীলাদির রাসূল
القول المقبول في ميلاد الرسول

মাহফিলে মীলাদের ইতিহাস বিষয়ে উর্দু ভাষায় লেখা এ কিতাব ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ এ কিতাবখানা বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক মো. আবদুর রব বিলাল।

২. দোয়ায়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য হাদীসে শরীফে বর্ণিত দোয়ার সংকলন।
২০১০ সালে বাংলা ভাষায় লেখা এ কিতাবের ১৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০১২ সালে লন্ডন থেকে এ কিতাবের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক মাওলানা ইউসুফ আহমাদ।

৩. মাসআলায়ে উশর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
শরীয়াতের দৃষ্টিতে ভূমি দুই প্রকার, উশরী ও খিরাজী। উশরী ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরজ। বাংলাদেশের ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের হুকুম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে এ বইয়ে। ২০০৫ সালে বৃটেন সফরকালে রচিত এ বই ২০০৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

৪. দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা
এ বইখানা ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত দ্বিতিয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালে।

৫. যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম)

১৯৯৯ সালে এ বই প্রকাশিত হয়। পরিমার্জিত ও বর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৬. আসহাবে বদর
ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারি ৩১৩ জন সাহাবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বলিত এ গ্রন্থ ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫ সালে।

৭. ওযীফা

কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে বর্ণিত দোয়া সম্বলিত পকেট সাইজের এ বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৮. হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম)
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ সালে।

৯. হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব
هدية اللبيب في نبذة من سيرة النبي الحبيب

আরবি ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত সীরাতের কিতাব। ২০১১ সালে বৃটেন সফরকালীন সময়ে তিনি এ কিতাব রচনা করেন। ২০১২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। *সীরাতে হাবীবে খোদা* নামে এ কিতাবের বাংলা অনুবাদ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে। মো. আবদুল আউয়াল হেলাল কর্তৃক অনূদিত *সীরাতে হাবীবে খোদা* বর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

১০. যাখীরাতুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন
ذخيرة الأحاديث الأربعين في فضاءل سيد المرسلين

বঙ্গানুবাদসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র ফযিলত বিষয়ক চল্লিশ হাদীস। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১১. কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন
كنز الأحاديث الأربعين في مناقب اهل بيت النبي الأمين

বঙ্গানুবাদসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইত তথা পরিবার পরিজনের মানাকিব বিষয়ক চল্লিশ হাদীস। প্রথম প্রকাশ ২০১১ সাল।

২০১০ সালে বৃটেন সফরকালীন সময়ে চল্লিশ হাদীসের এ দুই কিতাব তিনি সংকলন করেন।

১২. তুহফাতুল লাবীব বিআসানীদিল হাবীব
تحفة اللبيب بأسانيد الحبيب

আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালে পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ

কিতাবে তাঁর সনদ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ, ইলমে তাসাউফ ও ইলমে তাফসীরে তাঁর উস্তাদ ও শায়খগণ প্রদত্ত সনদ এ কিতাবে গ্রন্থিত হয়েছে।

১৩. আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ
التحفة اللطيفة في احاديث المسلسلة المنيفة

আরবি ভাষায় রচিত এ কিতাব ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ কিতাবে তাঁর শায়খগণ প্রদত্ত মুসালসাল হাদীসসমূহের সনদ গ্রন্থিত হয়েছে।

১৪. দালাইলুল খাইরাত

ইমাম জাযুলী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত দুরূদ শরীফের এ কিতাবখানা তাহকীক এবং ওযীফা আকারে পড়ার বিন্যাস করেছেন শায়খুল হাদীস ছাহেব। ২০১০ সালে এটা প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. আল হিযবুল আযম

ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত এ কিতাব তাহকীক করেছেন তিনি। ২০১৬ সালে কিতাবখানা প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. দারসে হাদীস-১

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছে দারসে হাদীস সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। এতে হাদীসে নিয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নসব তথা বংশমর্যাদা বিষয়ক একটি হাদীসের উপর প্রদত্ত দারস গ্রন্থিত হয়েছে।

১৭. সালাতুত তারাবীহ
القول الراجح في صلاة التراويح

এ গ্রন্থে বিশ রাকাত তারাবীহ প্রমানাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কথিত আহলে হাদীস তথা লা মাযহাবীদের ছড়ানো ফিতনা নিরসনে গ্রন্থখানি সহায়ক হবে। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত

বারাকাতুহু প্রণীত গ্রন্থাবলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এককভাবে আল হাবীব ফাউন্ডেশন'র প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সিলেটের নুমানিয়া লাইব্রেরি, সাইমুন লাইব্রেরি, ঢাকা বায়তুল মুকাররম মার্কেটে মুজাদ্দেদিয়া কুতুবখানাসহ অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে পাওয়া যায়। এছাড়া দেশের যেকোন প্রান্ত এবং বহির্বিশ্বের যেকোন দেশ থেকে অন লাইন ক্রেতাদের জন্য www.rokomairi.com থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে।

অপ্রকাশিত গ্রন্থ

১. নির্বাচিত প্রবন্ধ
বিভিন্ন সময়ে লিখিত এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন সাময়িকীতে প্রকাশিত বত্রিশটি প্রবন্ধ এ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থখানা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

২. নির্বাচিত তাফসীর
সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান (আংশিক), সূরা ইউসুফ, সূরা দুহা থেকে নাস পর্যন্ত সূরা সমুহের তাফসীর এ গ্রন্থে সংকলিত হবে। মূলতঃ সিলেটের বিয়ানীবাজার উত্তর জামে মসজিদে প্রদত্ত ধারাবাহিক তাফসীর ধারণকৃত অডিও থেকে অনুলিখনের কাজ চলছে।

২. দারসে শামাঈলে তিরমিযী
২০০৯ সালে কয়েক মাসব্যাপী সপ্তাহের প্রতি শনিবার তিনি লন্ডনের দারুল হাদীস লতিফিয়ায় ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত শামাঈলুল মুহাম্মাদিয়্যা (শামাঈলে তিরমিযী নামে খ্যাত) নামক হাদীসের কিতাব পূর্ণাঙ্গ দারস প্রদান করেন। ধারাবাহিক সে দারস ধারণকৃত ভিডিও থেকে অনুলিখনের কাজ চলছে।

৩. দারসে রিয়াদুস সালিহীন (প্রথম খণ্ড)
ইমাম নববী প্রণীত হাদীসের কিতাব রিয়াদুস সালিহীন প্রায় অর্ধাংশের দারস লন্ডনের দারুল হাদীস লতিফিয়ায় সম্পন্ন হয়। ধারাবাহিক সে দারস ধারণকৃত ভিডিও থেকে অনুলিখনের কাজ চলছে।

হিফযুল কুরআন মাদরাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা

২০০০ সালে থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া দাখিলমাদরাসা সংলগ্ন স্থানে তিনি জমি ক্রয় করে একটি হিফযুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মাদরাসার নামকরণ করা হয় থানাবাজার হাবিবিয়া হিফযুল কুরআন মাদরাসা।

২০১১ সালে তিনি হিফযুল কুরআন মাদরাসার সাথে একটি এতিমখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালে হিফযুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর তিনি থানাবাজার দাখিল মাদরাসার দুইটি একাডেমিক ভবন, শিক্ষক মিলনায়তন, সুপার ও অফিস সহকারীর পৃথক অফিস রোম, ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট এবং অজু ও নামাজের কক্ষ নির্মাণ করে দেন।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা

ইছামতি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার পশ্চিম দিকের একাডেমিক ভবনের দক্ষিণ পাশে ছোট মসজিদ ছিলো দীর্ঘদিন। মাদরাসা চলাকালীন নামাযের সময় ছাত্র শিক্ষকগণের স্থান সংকুলান হতো না। এই চাহিদার প্রেক্ষিতে এককভাবে তিনি উদ্যোগী হয়ে গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকায় অবস্থানরত তাঁর ছাত্র এবং শুভাকাঙ্খিগণের অনুদানে মাদরাসার পূর্ব দিকে ঈদগাহের জন্য নির্ধারিত স্থানে সুপরিসর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২০০০ সালে এলাকাবাসী এবং মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকের চাহিদার প্রেক্ষিতে তিনি থানাবাজার লতিফিয়া ফুরকানিয়া দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন পুরাতন ছোট মসজিদের স্থলে সুপরিসর বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

২০১৬ সালে নিজ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে তিনি নতুন একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে আল হাবীব জামে মসজিদ।

এই মসজিদের পাশে বর্তমানে একটি তিনতলা বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। এই বিল্ডিংয়ের নীচ তলায় থাকবে কনফারেন্স হল, অফিস, কিচেন ও ডাইনিং। উপরে হবে আল হাবীব গবেষণা গ্রন্থাগার। এই

গ্রন্থাগারে আরবি, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত নতুন পুরাতন বিপুল সংখ্যক বই কিতাবের সংগ্রহ থাকবে।

উল্লেখ্য যে, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহুর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা তিন হাজারের অধিক কিতাবাদি নিয়ে এই গবেষণা গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হবে।

সংসার জীবন

সংসার জীবনে তিনি চার পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক।

তথ্য সূত্র

১. জালালাবাদের কথা
দেওয়ান নুরুল আনওয়ার হোসেন চৌধুরী
বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. হাদীস চর্চায় বাংলাদেশী মুহাদ্দিসগণের অবদান
ড. মাওলানা মোরশেদ আলম সালেহী
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৩. চলমান জালালাবাদ: ইসলামী রেনেসাঁর অনন্য যারা
শায়খ তাজুল ইসলাম আউয়াল মহল্লী

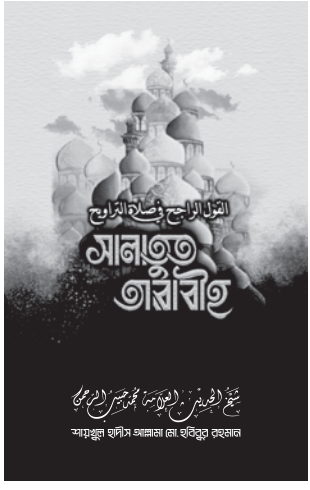
৩. প্রসঙ্গ জকিগনজ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য
মো: হান্নান মিয়া (সম্পাদক)

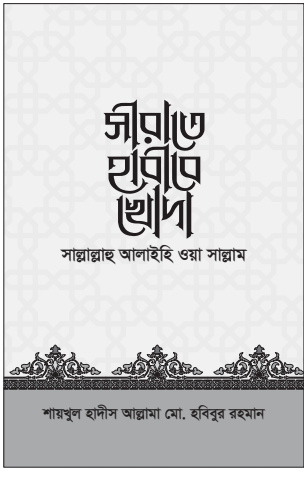
৪. জকিগনজ মনীষা
মো. আবদুল আউয়াল হেলাল, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম (যৌথ সম্পাদনা)

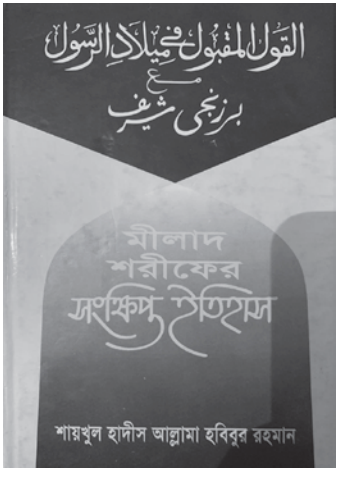
৫. সিলেট বিভাগের লেখক অভিধান
মুস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন, ঢাকা

৬. আহবাব (সনদ বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ২০০৮)
অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুন নূর (সম্পাদক)









শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহ এর প্রকাশিত কিছু গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র।

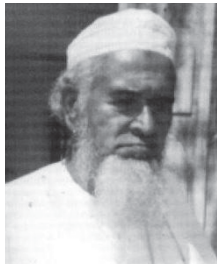


শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান দামাত বারাকাতুহ এর প্রকাশিত কিছু গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র।



আল হাবীব জামে মসজিদ, রারাই, থানা বাজার, জকিগঞ্জ, সিলেট।
প্রতিষ্ঠাকাল : ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

অনুসরণীয় এক আলিমে দ্বীন
আল্লামা আবদুর রাহমান বর্ণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৯৩২-২০০২



আবাল্য ধর্মানুরাগী, সদা হাস্যোজ্জল, বন্ধুবৎসল, সদালাপী ও সুবক্তা এক মহান মানুষ ছিলেন আল্লামা আবদুর রাহমান বর্ণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। পরহিতৈশি মনোবৃত্তি ও আকাশ-ছোঁয়া ব্যক্তিত্ব তাঁকে অমর করে রেখেছে। কৌতুকপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনের কারণে মানুষ তার বয়ান শুনতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। বৃহত্তর সিলেটের মানুষ তাকে চিনতো *বর্ণীর ছাব* নামে।

জন্ম : ১৯৩২ সালে বিয়ানীবাজার উপজেলার লাউতা ইউনিয়নের টিকরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আল্লামা আবদুর রাহমান বর্ণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইছরাব আলী, মাতা কারিজা বিবি। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে আল্লামা বর্ণী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৪৪ সালে পিতা ইছরাব আলী টিকরপাড়া গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে পার্শ্ববর্তী এলাকা মৌলবীবাজার জেলাধীন বড়লেখা উপজেলার *বর্ণী* গ্রামে বসত গড়ে তুলেন। ১৯৪৯ সালের ৫ মে আল্লামা বর্ণী ১৭ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। পরিণত বয়সে তিনি সুনাই নদীর তীরবর্তী টুকা গ্রামে নতুন বাড়ি করেন। ততদিনে জনমানসে এ মনীষী *বর্ণী'র ছাব* নামে খ্যাত হয়ে আসছিলেন।

শিক্ষা জীবন : টিকরপাড়া মক্তবে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতে খড়ি। পরবর্তীতে বাহাদুরপুর ওয়াহিদিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক স্তর এবং বিয়ানীবাজার সিনিয়র মাদরাসায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

প্রখর মেধাবী এবং খুবই বিনয়ী ছাত্র হিসেবে তখন তিনি শিক্ষকগণের সুদৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। ১৯৫১ সালে তিনি সিলেটের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কানাইঘাট উপজেলার ঝিঙ্গাবাড়ি সিনিয়র মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠা সন : ১৮৮২) আলিম ক্লাসে ভীত হন। সেখান থেকে ১৯৫৩ সালে আলিম ও ১৯৫৫ সালে ফাযিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠা সন : ১৯১৩) কামিল ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে কামিল (হাদীস) পাশ করেন। কামিল ক্লাসে অধ্যয়নকালীন অন্যান্য সুযোগ্য উসতাদগণের পাশাপাশি তিনি উপমহাদেশের অন্যতম হাদিস বিশারদ আল্লামা হরমুজউল্লাহ শায়দা ছাহেব (১৯০০-১৯৯০) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে উপস্থিত থেকে জ্ঞানাহরণে ব্যাপৃত থাকতেন। এ জন্য তিনি ইলমে হাদীসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক জীবন : ১৯৫৩ সালে ঝিঙ্গাবাড়ি মাদরাসায় আলিম ক্লাসে অধ্যয়নকালীন সময়ে তিনি মুজাদ্দিদে যামান, শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (১৯১৩-২০০৮) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে বাইআত হন। উল্লেখ্য যে, হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ সে সময় গাছবাড়ি জামীউল উলুম কামিল মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠা সন : ১৯০১) কর্মরত ছিলেন। বর্ণী'র ছাহেব মুর্শিদ নির্দেশিত পন্থায় কঠোর মেহনত করে ইলমে তাসাউফে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। আল্লামা বর্ণী হচ্ছেন হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রবীণ খলীফাগণের অন্যতম। উল্লেখ্য যে, আল্লামা বর্ণী হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর কাছ থেকে ইলমে তাসাউফ ছাড়াও ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, দালাইলুল খাইরাত ও হিযবুল বাহার এর ইজাযত (তাসাউফভিত্তিক আমলের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমতি) লাভ করেন।

কর্মজীবন : ১৯৫৭ সালে কামিল পাশের অব্যবহিত পরেই আল্লামা বর্ণী সিলেট সদর (দক্ষিণ সুরমা) উপজেলার অন্তর্গত রাখালাগঞ্জ দারুল কুরআন মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠা সন : ১৯৪৮) শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সে সময় মাদরাসাটি ইবতেদায়ী স্তর পর্যন্ত ছিলো। আল্লামা বর্ণী'র অক্লান্ত

পরিশ্রম ও অবিরাম প্রচেষ্টায় এ মাদরাসা অবকাটামোগত উন্নয়ন ছাড়াও পর্যায়ক্রমে দাখিল ও আলিম স্তরে উন্নীত হয়ে সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে।

১৯৭২ সালে বড়লেখা উপজেলার চান্দগ্রাম নিবাসী বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত হাফিয আবদুল বারী (বড় হাফিয-ছাব)'র অনুরোধ এবং স্বীয় মুর্শিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলার নির্দেশে রাখালগঞ্জ মাদরাসার প্রিন্সিপাল' পদ ছেড়ে চান্দগ্রাম ইবতেদায়ী মাদরাসার প্রধান পদে যোগ দেন। দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়'র ফলে চান্দগ্রাম আনওয়ারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসাকে (প্রতিষ্ঠান সন : ১৯৫৯) প্রাথমিক স্তর থেকে ফাযিল স্তরে উন্নীত ও সরকারি মঞ্জুরী আদায়ে সক্ষম হন আল্লামা বর্ণী। তিলে তিলে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ২৬ বছর প্রিন্সিপাল'র দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৮ সালে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবসর গ্রহণ করেন।

পারিবারিক জীবন : ১৯৬০ সালে আল্লামা বর্ণী বড়লেখা উপজেলার কাজিরবন্দ গ্রামের আলহাজ বশারত আলী সাহেবের প্রিয় কন্যা মুহতারামা আনোয়ারা বেগমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি চার পুত্র ও চার কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর পুত্র ও জামাতাগণ সকলেই আলিমে দ্বীন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

মসজিদ সংস্কার ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : রাখালগঞ্জ মাদরাসায় কর্মরত থাকাবস্থায় আল্লামা বর্ণী হাওরের পথ ধরে পায়ে হেঁটে চলাচল করতেন। ভাদেশ্বর বুধবারী বাজারে তখন অব্যবহৃত মসজিদ ছিলো। প্রায়ই গরু ছাগল প্রবেশের ফলে মসজিদটির পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছিলো। চলার পথে আল্লামা বর্ণী নিজ হাতে মসজিদটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নামায আদায় করতেন। একদা তিনি অত্র এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বী জনাব নূর মিয়ার সাথে কথা বলে লোকজন সমবেত করে মসজিদটির হেফাযত এবং স্থায়ীভাবে নামায আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমবেত জনতা মসজিদে স্থায়ীভাবে নামায আদায়ে তাঁর নির্দেশনা চাইলো। তিনি বললেন, এখানে একটি হাফিযি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা গেলে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ নিয়মিত ব্যবহারের ফলে

মসজিদটি যথাযথ হেফাযত করা যাবে। তাঁর নির্দেশনা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় এলাকাবাসী প্রতিষ্ঠা করেন ভাদেশ্বর হাফিযিয়া মাদরাসা। এ মাদারাসা বর্তমানে বৃহত্তর সিলেটের একটি বিখ্যাত হাফিযিয়া মাদরাসা হিসেবে পরিগণিত। এখান থেকে শত শত ছাত্র কুরআন শরীফের হিফয সম্পন্ন করে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। ভাদেশ্বর হাফিযিয়া মাদরাসা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তার প্রচেষ্টায় অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন- কাজিরবন্দ হাফিযিয়া মাদরাসা, বড়লেখা। শেওড়াডিগা হাফিযিয়া মাদরাসা, বড়লেখা। শাহখাজা ইবতেদায়ী মাদরাসা, বড়লেখা। রহমানিয়া টুকা হাফিযিয়া মাদরাসা, বড়লেখা।

দারুল কিরাতের শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা : হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভের পর থেকে আল্লামা বর্ণী বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতি বছর রামাদান মাসে তিনি নিয়মিত দারুল কিরাতের খিদমতে আত্মনিয়োগ করতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট অনুমোদিত শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন- কাজিরবন্দ হাফিযিয়া মাদরাসা শাখা, বড়লেখা। বণী ইউনিয়ন শাখা, বড়লেখা। গজারাই জামে মসজিদ শাখা, বিয়ানীবাজার। বারইগ্রাম জামে মসজিদ শাখা, বিয়ানীবাজার। হাকালুকি হালাহ জামে মসজিদ শাখা, বড়লেখা। ভাউরভাগ শাখা, বিয়ানীবাজার। রহমানিয়া টুকা হাফিযিয়া মাদরাসা শাখা, বড়লেখা।

খানেকা পরিচালনা : মুর্শিদ কিবলাহর নির্দেশে আল্লামা বর্ণী জীবনের একটা বড় অংশ মানুষের মাঝে ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারকল্পে ওয়ায নসীহত করে কাটিয়েছেন। এছাড়া বিশেষ তালিম তারবিয়াতের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে খানেকা পরিচালনা করতেন। তাঁর পরিচালিত খানেকা (ইলমে তাসাউফের শিক্ষা কেন্দ্রীক বিশেষ মাহফিল) সমূহ হলো চন্দ্রগাম আলহাজ্জ মহব্বত মিয়ার বাড়ি, বড়লেখা। রহমানিয়া টুকা হাফিযিয়া মাদরাসা, বড়লেখা। নালবহর আলহাজ্জ দুদু মিয়ার বাড়ি, বিয়ানীবাজার। মুল্লাপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব আজির উদ্দীন সাহেবের বাড়ি, বিয়ানীবাজার।

ইন্তিকাল : ২০০২ সালের ১২ মার্চ শুক্রবার পূর্ব নির্ধারিত একটি মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য আল্লামা বর্ণী সকাল ১১টায় বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়ে দাসেরবাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব কমর উদ্দীন সাহেবের বাড়িতে পৌঁছেন। জুমুআর নামাযের জন্য সঙ্গী সাথীসহ যথাসময়ে মসজিদে গেলেন। অযু শেষ করে উঠতে গিয়ে সহসাই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করে তাকে সিলেট শহরের লামাবাজার আয়শা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ চিকিৎসা শেষে অবস্থা কিছুটা ভালো হলে তাঁকে শহরের মুনশিপাড়াস্থ বড় জামাতা মাওলানা খলিলুর রহমান সাহেবের বাসায় নেয়া হয়। ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার রাত ১০টায় পরপারে পাড়ি জমান আল্লামা বর্ণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। রাতেই তাঁর মরদেহ বাড়িতে নেয়া হয়।

জানাযা ও দাফন : ১০ এপ্রিল বুধবার বিকাল ৩টায় প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত তাঁর নামাযে জানাযা। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর মুর্শিদ শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রহমানিয়া টুকা হাফিযিয়া মাদরাসার পার্শ্ববর্তী স্থানে নিজ মালিকানাধীন ভূমিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. ওয়াজে আল্লামা আবদুর রাহমান বর্ণী রহঃ, ২০০৩
হাফিয মাওলানা হেলাল উদ্দীন।

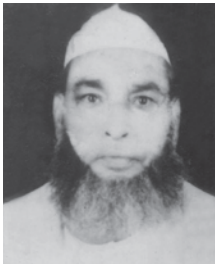
২. কিশোরদের আল্লামা বর্ণীর ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২০০৭
মোহাম্মদ আবদুল মুক্তাদির।

৩. আল্লামা আবদুর রাহমান বর্ণী রহ. জীবন ও কর্ম শীর্ষক সেমিনার স্মারক,
১০ এপ্রিল ২০১০।

৪. ইয়াদগার, বিশেষ স্মারক, ২০০৬
ছাত্র সংসদ, রহমানিয়া টুকা হাফিযিয়া মাদরাসা।

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

১৯৩৪-১৯৯৩



বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চার অব্যাহত ধারায় প্রাতঃ স্মরণীয় এক নাম শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ক্ষণজন্মা এ মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, সদালাপী ও বন্ধু বৎসল। খুবই অনাড়ম্বর ও সাধারণ জীবন যাপন করতেন তিনি। দক্ষ একজন মুহাদ্দিস হিসেবে আজীবন তিনি ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনমুগ্ধকর। সহজ সরল ভাষা, প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ও যৌক্তিক আলোচনা দ্বারা তিনি ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস এবং ইলমে ফিকহ'র জটিল বিষয়গুলো ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্রও সহজে বুঝে নিতে পারতো। এ কারণে তাঁর ক্লাসে অংশ নিতে ছাত্রগণ উদগ্রীব থাকতো।

জন্ম : সিলেটের জকিগন্জ উপজেলার কাজলসার ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী গোটারগ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর পিতা- মরহুম কেরামত আলী। মাতা- লতিফা বেগম।

শিক্ষাজীবন : বাড়ির পাশের পাঠশালায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখা পড়া করেন সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদরাসায়। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি শিক্ষকগণের মনযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন। গাছবাড়ি জামীউল উলুম মাদরাসা (প্রতিষ্ঠাসন

১৯০১) থেকে ১৯৫৮ সালে আলিম ও ১৯৬০ সালে ফাযিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তৎকালীন ইস্টপাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬২ সালে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা (প্রতিষ্ঠাসন ১৯১৩) থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন : জকিগঞ্জ উপজেলা গঙ্গাজল হাসানিয়া মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাসন ১৯০৫) শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। স্বীয় পীর ও মুরশিদ শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (১৯১৩-২০০৮) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি বিশ্বনাথ উপজেলার সৎপুর দারুল হাদীস (কামিল) মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাসন ১৯৪৮) মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতে তিনি জকিগন্জ উপজেলার ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাসন ১৯৪৭) ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের শেষ দিকে কমলগঞ্জ উপজেলার ভানুগাছ শফাত আলী সিনিয়র মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাসন ১৯৫২) প্রিন্সিপাল পদে যোগদান করেন। ১৯৯০ সালের মধ্যভাগে জকিগন্জ উপজেলার বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাসন ১৯২০) ভাইস প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ইনতিকালের আগের দিনও তিনি মাদরাসায় উপস্থিত থেকে হাদীস শরীফের দারস পেশ করেছেন।

আধ্যাত্মিক জীবন : ছাত্র জীবন শেষে তিনি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত হন। দীর্ঘ মেহনতের পর আপন মুরশিদের কাছে থেকে খিলাফত লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ তিনি যথারীতি ইলমে কিরাত ও ইলমে হাদীসেরও ইজাযত লাভ করেছিলেন।

মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা : নিজ এলাকায় ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে তিনি নিজ বাড়ির পার্শ্বে প্রতিষ্ঠা করেন গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া মাদরাসা। বর্তমানে এ মাদরাসায় দাখিল স্তর পর্যন্ত ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। মাদরাসার সুপার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা মহিউদ্দিন। একই সময়ে তিনি

মাদরাসার পাশে একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *ইসলামের দৃষ্টিতে সালাম ও কদমবুছির মাসআলা* শিরোনামে রিসালাখানি ১৩৮৭ হিজরীর ১৫ শাওওয়াল রচনা সম্পন্ন করেন। ১৯৮০ সালের ১৩ মার্চ *ইসলামের দৃষ্টিতে সালাম ও কদমবুছি* নামে বইখানির প্রথম সংস্করণ ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা মাশুক আহমদ ছাহেব প্রকাশ করেন। দীর্ঘ ১৯ বছর পর ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ সিলেটের রহমানিয়া বইঘর থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে তৃতীয় সংস্করণ পাঠকের হাতে। এ বইখানি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সালাম ও কদমবুছির পার্থক্য এবং সালাম আদান প্রদানের সুন্নত তরীকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে হাদীস শরীফ ও ফিকহের কিতাবাদীর বরাতে কদমবুছি যে শরীয়তসম্মত ও মুসতাহাব আমল সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পারিবারিক জীবন : পারিবারিক জীবনে শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাত পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর পুত্রগণ হলেন-

১. মাওলানা শেহাব উদ্দিন, মুহাদ্দিস- দারুল হাদীস লতিফিয়া, লন্ডন।
২. মাওলানা মহিউদ্দিন, সুপার- গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ।
৩. মাওলানা এমাদ উদ্দিন, প্রভাষক- জকিগন্জ ফাযিল সিনিয়র মাদরাসা, জকিগন্জ।
৪. মাওলানা জইন উদ্দিন, প্রভাষক- সুবহানীঘাট দারুস সুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা।
৫. মাওলানা ওয়াসি উদ্দিন, প্রভাষক- ব্রাহ্মণগ্রাম মাদরাসা, বালাগঞ্জ।
৬. মাওলানা হামিদ উদ্দিন, শিক্ষক- দারুল হাদীস লতিফিয়া, লন্ডন।
৭. মাওলানা ওলি উদ্দিন, শিক্ষক, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ।

ইন্তিকাল : ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর শুক্রবার জকিগন্জ উপজেলার হাতিডহর গ্রামের জামে মসজিদে জুমুআর নামাযপূর্ব বয়ানরত অবস্থায় তিনি অসুস্থ পড়েন। বয়ান অসমাপ্ত রেখে মুনাজাত শুরু করেন। *রাব্বানা* শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে মিম্বর থেকে পড়ে যাচ্ছেন দেখে মুসল্লীগণ তাঁকে যথাযথ শুইয়ে দেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন এ মহান মনীষী। সে দিন তাঁর বয়ানের বিষয় ছিল নেককার বান্দাগণের রূহ কিভাবে কবজ করা হবে। আর যে জবান দিয়ে আগের দিন বৃহস্পতিবার মাদরাসায় হাদীস শরীফ পড়িয়ে এসেছেন, সেই মুবারক জবানে ইহকালের শেষ উচ্চারিত শব্দ ছিলো *রাব্বানা*। ২ অক্টোবর শনিবার হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা শেহাব উদ্দিন। গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া মাদরাসা সম্মুখস্থ মাঠে তাঁকে দাফন কর করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. জালালাবাদের কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৩৮৭
দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
২. প্রসঙ্গ জকিগঞ্জ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃষ্ঠা ২৭০
মোঃ হান্নান মিয়া (সম্পাদক)
৩. জকিগন্জ মনীষা, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮
মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল ও অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম (যৌথ সম্পাদনা)
৪. শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার র. স্মৃতিস্মারক, ১৯৯৪



শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জব্বার গোটারগ্রামী রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা।

একুশের চেতনা ও একজন মতিন উদ্দীন আহমদ



১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিলো মহান ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির দিন। সে দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো। রক্ত দিয়ে আদায় হয়েছিলো ভাষার দাবি।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব যদিও তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রীক ছিলো, কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে সিলেটবাসীর অবদান ছিলো প্রাতঃস্মরণীয়। মতিন উদ্দীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪), জাতীয় অধ্যাপক দার্শনিক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ (১৯১৯-২০০৬) [তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা নওবেলাল] প্রমুখের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে এ কথা প্রস্ফুটিত হয়।

জকিগন্জবাসীর জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, আমাদের কৃতি সন্তান প্রখ্যাত রম্য সাহিত্যিক মতিন উদ্দীন আহমদ ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে জকিগঞ্জ দেশের প্রথম মুক্তাঞ্চল (জকিগনজ হানাদার মুক্ত হয় ২৩ নবেম্বর ১৯৭১) হলেও আজ পর্যন্ত যেমন সরকারি স্বীকৃতি মেলেনি, ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলনের রচিত ইতিহাসে মতিন উদ্দীন আহমদ'র আলোচনা চোখে পড়ে না। বর্তমান প্রজন্ম তাঁর জীবন-কর্ম ও অবদান সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছুই জানে না।

কে এই মতিন উদ্দীন আহমদ

প্রখ্যাত রম্য সাহিত্যিক মতিন উদ্দীন আহমদ সিলেটের জকিগনজ উপজেলার কাজলসার ইউনিয়নের আটগ্রামে (বড়বাড়ি) ১৯০০ সালের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী। মাতা মিসবাহুন নেসা। নি:সন্তান চাচা গউস উদ্দিন চৌধুরীর পরিবারে বাল্যকালে তিনি লালিত পালিত হন। চৌধুরী পরিবারের সন্তান মতিন উদ্দীন আহমদ নিজের নামে সাথে চৌধুরী লিখতেন না। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু। ১২ বছর বয়সে করিমগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে এখান থেকে প্রথম বিভাগ এন্ট্রান্স (প্রাবেশিকা) পাশ করেন। ১৯২০ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। ১৯২২ সালে কলকাতা রিপন কলেজ (বর্তমান-সুরেন্দ্র মোহন কলেজ) থেকে বিএ পাশ করেন। ১৯২৬ সালে রিপন ল'কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন।

সিলেট বার এ আইন ব্যবসা দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আসাম প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে মনোনয়ন পেয়ে আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন তিনি। ১৯২৭ সালের ৪ মে গোয়াইনঘাটে সাব ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ বিশ বছর কোনো পদোন্নতি ছাড়াই আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেন। দেশ বিভাগকালীন সময়ে পাকিস্তান সিনিয়র সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট সিলেটের এডিএম (এসিসট্যান্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) নিযুক্ত হন। এডিএম হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির (বর্তমান সিটি কর্পোরেশন) সরকার মনোনীত প্রশাসক ছিলেন। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেন। ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি রাজস্ব বোর্ডের স্পেশাল অফিসার পদে কর্মরত অবস্থায় সরকারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিআইটি গঠিত হলে সরকার তাঁকে উপদেষ্টা নিয়োগ করে। ইতোমধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ঢাকায় আমেরিকান প্রতিষ্ঠান ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস, তখনো নতুন দেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়নি। গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা মতিন উদ্দীন আহমদ আঁচ করতে পেরেছিলেন অচিরেই মাতৃভাষার উপর আঘাত আসছে। সিলেটে নিযুক্ত তখনকার এডিএম মতিন উদ্দীন আহমদ ৯ নভেম্বর (১৯৪৭) কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে এক সভা আহ্বান করেন। তাঁর সভাপতিত্বে সেদিন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা* শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা হলে মতিন উদ্দীন আহমদ সেমিনার আয়োজন করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পূর্ব *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা* শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সৈয়দ মুজতবা আলী (পরবর্তীতে একই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে)। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর ভূমিকার কারণে মতিন উদ্দীন আহমদ সরকারের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। সরকারি চাকরিতে থাকাকালীন এজন্য তাঁকে বহু হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১)।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে রম্যসাহিত্যিক মতিন উদদীন আহমদ'র গৌরবোজ্জল ভূমিকা আন্দোলনের রচিত ইতিহাসে স্থান পায়নি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্থান পেয়েছেন দায়সারাভাবে।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন এবং কার স্বার্থে এই অবজ্ঞা? ইতিহাস তো রচনা করার বিষয় না। ঘটে যাওয়া ঘটনার নিরেপক্ষ এবং নির্মোহ বর্ণনার নামই ইতিহাস। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও দলকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতায় আর কত ইতিহাস বলৎকারের শিকার হবে?

সাহিত্য জীবন

কিশোর বয়সে মতিন উদ্দীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত *মাসিক খোকা খুকু*

পত্রিকার গ্রাহক ও একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। তাঁর *আত্মজীবনী নয়* শীর্ষক রচনা থেকে জানা যায় পাঠশালা জীবনে তিনি কিছু দিন কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, *চৌদ্দ অক্ষর বজায় রাখতে গিয়ে কত শত শব্দের লেজ যে আমার হাতে কাটা পড়ল, সেগুলো যদি শব্দ না হয়ে কুকুর হত, তাহলে আপনারা অভিধানে বহু লেজকাটা কুকুর দেখতে পেতেন*। কবিতা চর্চায় ব্যর্থ হয়ে তিনি গল্পের দিকে মনযোগী হন। ১৯১৬ সালে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন *মাসিক খোকা খুকুতে* প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। কলেজ জীবনে *প্রকৃতি, মুকুল, সন্দেশ* প্রভৃতি বিখ্যাত শিশুতোষ পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। গত শতকের তিরিশের প্রথম দিকে *মাসিক মোহাম্মদিতে* তাঁর কিছু প্রবন্ধ ও বেশ কিছু ছোট গল্প ছাপা হয়। বস্তুত: হাস্যরসপূর্ণ এ ছোট গল্পগুলো তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

চাকুরী জীবনে কাজের ব্যস্থতা, ক্রমাগত বদলী ইত্যাদি কারণে তাঁর সাহিত্য চর্চা বাধাগ্রস্থ হয়। পাকিস্তান আমলে ঢাকায় অবস্থানকালে বন্ধু বান্ধবের উৎসাহে আবারো তিনি লেখায় মনযোগী হন। এ সময় *মাসিক সওগাত, মাসিক লেখক সংঘ পত্রিকা, মাহে নও, মাসিক আল ইসলাহ* ছাড়াও *দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক ইত্তেফাক* প্রভৃতি পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ব্যঙ্গাত্মক ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। সরকারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি অখণ্ড মনযোগে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। এ সময় মৌলিক রচনার পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

ক. মৌলিক রচনা

১. চেরাগ
এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত লেখকের প্রথম গ্রন্থ।

২. চালাক হওয়ার পয়লা কেতাব
এ গ্রন্থটি শিশুপাঠ্য উপদেশ ও মননশীল রচনা। মোট ষাটটি

রচনা সম্বলিত এ গ্রন্থখানা ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশ হয়।
প্রকাশক: পূর্বাচল প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. বুদ্ধুদ
সমকালীন প্রেক্ষাপটে রচিত একটি অনন্য উপন্যাস। ১৯৬১ সালে এ উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন লেখক নিজে। প্রকাশক: নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়, এ উপন্যাসখানি আরবি ভাষায় অনুদিত হয়ে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. তিন চেরাগ তিন শামাদান ফাউ
লেখকের ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনার অনন্য নজীর হচ্ছে এ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মোট সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে। রচনা শিরোনাম হচ্ছে *এজমালী উপন্যাস*, *এজমালী নাটক*, *এজমালী কবিতা*, *যে বই আমি লিখব*, *স্বামীক্লেশ নিবারনী সংঘ*, *পরলোক গতেষু*, *আত্মজীবনী নয়*। ১৯৬৪ সালে এ গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: আর্সিকো, ঢাকা।

৫. হৃদয় দিয়ে দেখা
ভ্রমণ কাহিনীর আদলে লেখা একটি অনন্য গ্রন্থ। ১৯৬৩ সালে লেখক প্রথমবারের মতো সস্ত্রীক হজ্জ পালন করেন। দেশে ফিরে হজ্জের অভিজ্ঞতা সম্বলিত ভ্রমনকাহিনী লেখেন। গ্রন্থটি মূলত ভ্রমন কাহিনী হলেও লেখক এতে হজ্ব পালনের নিয়মাবলী এবং আরবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যুক্ত করেছেন। এতে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে গ্রন্থটি। ১৯৬৫ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

৬. ছোট বেলায় শোনা
শিশুপাঠ্য ধর্মীয় গল্পের সংকলন। এতে মোট ছয়টি গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে উহা প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭. নেতা মামা
রাজনীতি বিষয়ক রম্যরচনা। এ গ্রন্থে সমকালীন রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

৮. চালাক হওয়ার দোসরা কেতাব
লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায় এ গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

খ. অনুবাদ

৯. শত জীবনের কথা
লেখক: আমেরিকার ইউলিয়াম এ.ডি. উইট ও শ্যামুয়েল লিসেনসন। ১৯৫৯ সালের জুন মাসে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৬২। প্রকাশক: বুক প্রমোশন, ঢাকা।

১০. জনসংখ্যা বাড়ছে
লেখক: কার্ল স্যাকস। ১৯৫৯ সালে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: পূর্বাচল প্রকাশনী, ঢাকা।

১১. অশান্ত পৃথিবী
লেখক: রোজ ওয়াইলার ও রিসা এমস। ১৯৬০ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: লিবার্টি, ঢাকা।

১২. বিজন বনের রূপকথা
লেখক: ন্যাথানিয়েন হু থর্ন। ১৯৬২ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

১৩. ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট
লেখক: ক্যাথারিন ওয়েজ পিয়ারে। ১৯৬৪ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: পপুলার পাবলিকেশন, ঢাকা।

১৪. অর্থনীতির গোড়ার কথা
লেখক: মার্শাল এ রবিন সন, হার্বাট সি মর্টন ও জেমস ডি ক্যান্ডার উড। ১৯৬৪ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: জীনাত প্রিন্টিং, সবুজ লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৫. এ তো বড় রঙ্গ যাদু
লেখক: ডি ভ্রাইজ। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: চয়নিকা প্রকাশনী, ঢাকা।

১৬. জগত জুড়ে মজার খেলা
লেখক: ফ্রান্সেস ডব্লিউ কীন। ১৯৬৪ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: প্রিমিয়ার বুকস, ঢাকা।

১৭. হাতের কাছে কল কব্জা
লেখক: হারমান শাইডার। গ্রন্থখানির প্রকাশনা তথ্য জানা যায়নি।

১৮. শিক্ষা দানের কায়দা কানুন
লেখক কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায় এ গ্রন্থের নাম রয়েছে। তবে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

মৃত্যুর কয়েক দিন আগে এ.এফ.এম আব্দুল ওয়াজেদ হাকী মতিন উদ্দীন আহমদ এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এ সাক্ষাৎকারটি তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পর (৬ জুলাই ১৯৮০) দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকার সূত্রে জানা যায়, তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা পনেরো। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই ১৫টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে মাত্র দুটি ছাড়া বাকীগুলোর নাম কিংবা আনুসাঙ্গিক তথ্য জানা যায় নি। যে দুটি সম্পর্কে জানা যায় তা হলো:

ক. সাধক কবি সিতালংশাহ'র কীর্তি ও জীবনী

নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে এটি মৌলিক গবেষণা। জানা যায়, দীর্ঘ ১২

বছরের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফসল এ পাণ্ডুলিপি। এ গ্রন্থখানা প্রকাশিত হলে জকিগঞ্জের এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব সূফি কবি শিতালংশাহ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানার সুযোগ হতো। সাধক কবি শিতালংশাহ শিরোনামে মতিন উদ্দীন আহমদ'র লেখা একটি প্রবন্ধ সিলট একাডেমী পত্রিকায় (এপ্রিল-মে ১৯৭৯) প্রকাশিত হয়। প্রফেসর নন্দলাল শর্মা সংকলিত ও বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত (ডিসেম্বর ২০০৫) মরমী কবি শিতালংশাহ গ্রন্থে তাঁর এ প্রবন্ধটি (সংক্ষেপিত) প্রকাশিত হয়েছে।

খ. আমি ও আমার ধর্ম

ব্যক্তিগত জীবনে আচরিত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ও আলোচনা স্থান পেয়েছে এ পাণ্ডুলিপিতে।

বিভিন্ন সংকলনে তাঁর গল্প

মতিন উদ্দীন আহমদের লেখা গল্পগুলো ছিলো ব্যাপক পাঠকপ্রিয় ও কালোত্তীর্ণ। এ কারণে বিভিন্ন গল্প সংকলনে তাঁর অনেক গল্প স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কটি সংকলন হলো-

ক. মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প
গবেষক আব্দুল কাদির এর সম্পাদনায় বিভাগ পূর্বকালে প্রকাশিত হয় এ গল্প সংকলন। এ গ্রন্থে মতিন উদ্দীন আহমদের *মালবিকা* শীর্ষক গল্প স্থান পেয়েছে।

খ. বাংলা একাডেমি প্রকাশিত গল্প সংকলনে তাঁর *হানিমুন* শীর্ষক গল্প স্থান পেয়েছে।

এছাড়া মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন সম্পাদিত *শতদল* এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৯৯৭-১৯৭৮) ও আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী (জ. ১৯৩৪) সম্পাদিত *সেকাল ও একালের সেরা গল্প* গ্রন্থে তাঁর গল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ইন্তিকাল

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ৩ জুলাই ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁর অসিয়ত মত সিলেটের দরগাহ গোস্থান তাঁকে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র

১। মতিন উদ্দীন আহমদ- আতোয়ার রহমান, বাংলা একাডেমি

২। শিলহটের ইতিহাস- আশরাফ হোসেন

৩। সিলেটের একশ একজন- ফজলুর রহমান

৪। ভাবনার বাতায়ন-সৈয়দ মোস্তফা কামাল

৫। সিলেটের সাহিত্যাঙ্গন- নন্দলাল শর্মা

৬। বাংলা সাহিত্যে সিলেট ২য় খণ্ড- শামসুল করিম কয়েস

৭। আলোকিত সন্তানদের স্মরণে- আব্দুল করীম চৌধুরী

৮। কালের ক্যানভাসে যারা- শামসাদ হুসাম, মাসুম রহমান আকাশ

৯। জকিগঞ্জ মনীষা- মো: আব্দুল আউয়াল হেলাল ও অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হাকিম।

১০। প্রসঙ্গ জকিগঞ্জ: ইতিহাস ঐতিহ্য- মো: হান্নান মিয়া (সম্পাদক)

১১। সিলেট বিভাগের লেখক অভিধান -মস্তফা সেলিম

জকিগনজের অহংকার

এম. এ. হক

১৯১৮-১৯৯৬



জকিগনজ থানার প্রতিষ্ঠাতা জনাব এম. এ. হক ছিলেন জকিগন্জবাসীর দরদী অভিভাবক। জনগণের কাছে *হক সাব* কিংবা *বাঘা হক* নামে খ্যাত এ মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন একাধারে চৌকস পুলিশ অফিসার, সফল ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ ও দেশদরদী চিন্তাবিদ।

জন্ম : ১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারি জকিগনজের কাজলসার ইউনিয়নের কামালপুর (মোগলেরচক) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এম. এ. হক। তাঁর পিতা সাহেবজান আলী। মাতা সকিনা খাতুন।

শিক্ষা : কামালপুর পাঠশালায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা। ১৯৩৮ সালে সিলেট গভর্ণমেন্ট হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৪০ সালে এমসি কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (অনার্স-ইংলিশ) ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি আসাম মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন (১৯৪০-৪২ সাল)।

কর্মজীবন : আসাম সরকারের পুলিশ বিভাগে ডিএসপি পদে যোগদানের মাধ্যমে এম. এ. হকের কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে দেশ বিভাগকালীন সময়ে তিনি করিমগনজ মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা (ডিএসপি) ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সিলেটে এডিশনাল এসপি হিসেবে যোগ দেন। এডিশনাল এসপি চট্টগ্রাম (১৯৪৯), এসপি

নোয়াখালী (১৯৫০-৫১), এসপি রংপুর (১৯৫২-৫৫), এসপি ময়মনসিংহ (১৯৫৫-৫৬), এসপি ঢাকা (১৯৫৭-৫৯)। এরপর ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি পেয়ে এডিশন্যাল ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (১৯৬০), ডি আইজি অব পুলিশ ঢাকা (১৯৬১), ডি আইজি অব পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ (১৯৬২-৬৪), চেয়ারম্যান সড়ক পরিহবহন সংস্থা (১৯৬৫-৬৯)। চাকুরী জীবনে এম এ হক বিভিন্ন দেশে পেশাগত বিশেষ ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন। যেমন বৃটিশ ইন্সটিটিউট অব পুলিশ মালয়েশিয়া (১৯৫৫), ইন্টারপোল-প্যারিস (১৯৬৪), স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-লন্ডন (১৯৬৪), ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমী ওয়াশিংটন ডিসি (১৯৬৪), পুলিশ এডমিনিস্ট্রেশন, হনলুলু (১৯৬৪), ফিলিপিনস আর্মি ইন্টেলিজেন্স (১৯৬৪) ও টোকিও পুলিশ (১৯৬৫)। সৎ সাহসী ও কর্মনিষ্ঠ অফিসার হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিলো ব্যাপক।

কর্মজীবনে যখন যেখানে গেছেন পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নে বহুমুখি অবদান রেখেছেন তিনি। নোয়াখালীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মাইজদি প্রাইমারী স্কুল, মসজিদ ও মক্তব। নোয়াখালী পুলিশ লাইন পার্ক, ফেনী পুলিশ ক্লাব। রংপুরে প্রতিষ্ঠা করেন প্রাইমারী স্কুল, পুলিশ লাইব্রেরী, ডেইরী ফার্ম, টাউন হল। ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠা করেন প্রাইমারী স্কুল ও পুলিশ ক্যান্টিন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন পুলিশ ক্লাব (১৯৫৭), রাজারবাগ পুলিশ ক্লাব (১৯৫৮), পুলিশ কো অপারেটিভ সোসাইটি (১৯৬০), সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদ ম্যাগাজিন *দ্য ডিটেকটিভ* (১৯৬০)। পুলিশ প্রশাসনের নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস (১৯৬২), পলওয়েল শপিং সেন্টার (১৯৬৩), জোনাকী সিনেমা হল (১৯৬২) ইত্যাদি।

সরকারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন দেশের প্রথম প্রাইভেট হাসপাতাল *আরোগ্য নিকেতন*। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠা করেন দিলকুশা লায়ন্স ক্লাব (১৯৭৪)। ১৯৭৪ সাল থেকে দীর্ঘ দিন তিনি *প্রবাসীর ডাক* নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। এম এ হক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর- পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি (১৯৬০-৭০), সভাপতি- জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকা (১৯৬১-৭৭), সহ সভাপতি ডায়েবেটিক সোসাইটি (১৯৬২-৮৬)।

রাজনীতি : ১৯৭৯ সালে জাতীয় নির্বাচনে তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে সিলেট-৫ (জকিগনজ-কানাইঘাট) আসনের এমপি নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সূচনা। তিনি ১৯৮৪-৮৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি (১৯৮৫-৮৬) এম এ হক ১৯৮৭ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তার সহধর্মিনী বেগম ফাহমিদা হক হলেন চট্টগ্রামের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর (১৯১৯-১৯৭৩) বোন।

ইন্তিকাল : ১৯৯৬ সালের ৬ এপ্রিল জনাব এম. এ. হক ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। পরদিন বনানী গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

জকিগনজে এম এ হকের অনন্য অবদান

১. **জকিগনজ থানা প্রতিষ্ঠা:** ১৯৪৬ সালের ৩ জুন বড়লাট লর্ড মাউন্টবেটেন (১৯০০-১৯৭৯) ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে তা কার্যকর হয়। সিলেট ও কাশ্মির অঞ্চলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, দুটি এলাকার জনগণ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে, তারা পাকিস্তানভুক্ত হবে, নাকি ভারতভুক্ত হবে। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই (সোম ও মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত গণভোটে সিলেটবাসী পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়। গণভোটের ফল প্রকাশ হয় ১৭ জুলাই'৪৭। এ ফলাফল অনুযায়ী সিলেট জেলার করিমগনজ মহকুমা পাকিস্তানভুক্ত হবার কথা। আসাম সরকার এম এ হককে করিমগনজ মহকুমা পুলিশ অফিসার করে পাঠায়। করিমগন্জ পৌছে হকসাব ১৪ আগস্ট

মহাধুমধামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উৎসব পালন করেন। ১৭ আগস্ট সন্ধ্যায় রেডিওতে ঘোষণা দেয়া হলো, রেডক্লীফ রোয়েদাদ (বাঁটোয়ারার বিবরণ) অনুযায়ী করিমগনজ শহরসহ দক্ষিণপূর্ব অর্ধেক এলাকা (সাড়ে তিন থানা) ভারতভুক্ত হবে। ষড়যন্ত্রমূলক এ ঘোষণায় নিমিষেই পাল্টে গেলো করিমগনজের অবস্থা। এর প্রতিবাদে মুসলমানগণ রাস্তায় নেমে আসে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার আশংকা প্রকট হয়ে উঠলো। ডিএসপি এম এ হক কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার সেন, রবীন্দ্র আদিত্য এবং মহকুমা মুসলিম লীগ সেক্রেটারী এডভোকেট শামছউদ্দীন আহমদ চৌধুরীকে (গনিপুর নিবাসী) সাথে নিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯ আগস্ট ১৯৪৭ যৌথ স্টিয়ারিং কমিটি থেকে বার্তা পাঠানো হলো- আসাম সরকার ডিএসপি আবদুল হককে পাকিস্তানে চলে যেতে ছেড়ে দিয়েছে। অবিলম্বে তাকে সিলেট গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। সংযুক্ত আদেশে বলা হলো করিমগনজ থেকে পাকিস্তান অংশের হেডকোয়ার্টার শেওলায় স্থাপন করতে হবে। কমিটির এ সিদ্ধান্তে এম এ হক দেখলেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি জকিগনজ বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। এছাড়া পাকিস্তানভুক্ত বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত শেওলার চেয়ে হেডকোয়ার্টার করিমগনজের পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য হাট জকিগনজে প্রতিষ্ঠাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ২৬ আগস্ট সিলেটের ডিসি ও এসপিকে জানিয়ে দিলেন, আপাতত শেওলার পরিবর্তে তিনি জকিগনজে থানা হেডকোয়ার্টার স্থাপন করছেন। জবাবের অপেক্ষা না করেই ২৭ আগস্ট তিনি স্বহস্তে করিমগনজ থানার রাইফেল, চেয়ারটেবিল, রেকর্ডপত্রসহ সবকিছু দুইভাগ করে একভাগ নৌকায় তুলে জকিগনজ পাড়ি জমান। স্থানীয় পরিত্যক্ত কাচারী ঘরে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন পূর্বক *জকিগনজ থানা* প্রতিষ্ঠা করেন। বিচক্ষণ এ পুলিশ অফিসার স্থানীয় রাজনীতিবিদগণের সহায়তায় জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্থাপন করে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

২. **জকিগনজ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা ঃ** ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারি গঙ্গাজল নিবাসী রেডিও ইঞ্জিনিয়ার জনাব

কুতুবউদ্দিনকে অবৈতনিক প্রধান শিক্ষক করে বেসরকারিভাবে যাত্রা শুরু হয় জকিগনজ উচ্চ বিদ্যালয়। এ বছরই পুলিশ কর্মকর্তা এম এ হকের প্রচেষ্টায় তৎকালীন ডিপিআই ড. কুদরত-ই-খুদা জকিগনজ এসে বিদ্যালয়টি ভিজিট করে যান। অল্পদিনের মধ্যে এ বিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৩. **জকিগনজ কলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ** ১৯৮৪ সালে এম এ হক জকিগনজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন জকিগনজ কলেজ। পূর্ণ সরকারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার নিয়মিত অনুদানে কলেজ পরিচালিত হয়।

৪. **ইছামতি মাদরাসার সরকারি মঞ্জুরী প্রাপ্তিতে ভূমিকা ঃ** ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এম এ হক এবং তাঁর ভাই শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক সাহেবের প্রচেষ্টায় ইছামতি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা একই সাথে দাখিল থেকে ফাযিল পর্যন্ত সরকারি মঞ্জরী লাভ করে।

৫. **ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান ঃ** ১৯৭৮ সালে ভারত সরকার জকিগনজ বাজারের পূর্ব দিক বরাবর কুশিয়ারা নদীতে গ্রোয়েন নির্মাণ শুরু করে। দরদী নেতা এম এ হক ভারতীয় সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন। জকিগনজবাসীকে সাথে নিয়ে তিনি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেন। এম এ হকের অব্যাহত চাপের মুখে তৎকালীন জিয়াউর রহমান সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ভারত সরকার গ্রোয়েন নির্মাণ প্রকল্প বাতিল করে। উল্লেখ্য যে, ১০ কোটি রুপী ব্যয়ে এ গ্রোয়েন বাস্তবায়িত হলে জকিগনজ বাজারসহ পার্শবর্তী এলাকা কুশিয়ারা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যেতো।

এ ছাড়া জনাব এম এ হকের প্রচেষ্টায় জকিগজে মহকুমা শিক্ষা অফিস, মহকুমা আনসার অফিস, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস, কাস্টমস অফিস ও পোস্ট অফিস স্থাপিত হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

শত ব্যস্ততার মধ্যেও জনাব এম এ হক কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ রেখে গেছেন। তাঁর এ গ্রন্থগুলো জাতীয় উন্নয়নে দিক নির্দেশনামূলক।

১. রাহুগ্রস্থ বাংলাদেশ-রাহুমুক্তির রূপরেখা
প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ প্রকাশক : রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।

২. সৃষ্টির সেরা শত মানুষ
প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ (প্রথম সংস্করণ) ফেব্রুয়ারি ২০০২ (তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশক : রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. দারিদ্র বিমোচন
প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৯ প্রকাশক : এম.এ. হক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা।

৪. Fate of Democracy in Bangladesh
প্রকাশ : এপ্রিল ২০০০ প্রকাশক : এম.এ. হক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা।

৫. দেশটা কি রসাতলে যাবে
প্রকাশকাল : ১৯৮৫

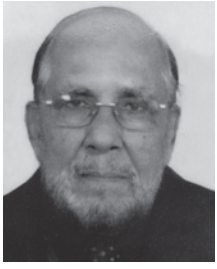
৬. Yahya's Master Plan
প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ প্রকাশক : রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।

তথ্যসূত্র

১. সিলেটের আরো একশ একজন- ফজলুর রহমান
২. জালালাবাদের কথা- দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
৩. সিলেটের রেফারেন্ডাম ও জন প্রতিনিধি- সৈয়দ মোস্তফা কামাল
৪. সিলেটের সাহিত্যাঙ্গন- নন্দলাল শর্মা
৫. সম্পূর্ণ মানুষ এম. এ. হক- রেহানা আশিকুর রহমান
৬. জকিগনজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি- মুহাম্মদ তবারক হোসাইন
৭. প্রসঙ্গ জকিগনজ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য- মোঃ হান্নান মিয়া
৮. জকিগনজ মনীষা- মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল, অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আবদুল হাকীম
৯. এম এ হক স্মৃতি পরিষদ স্মরণীকা- ১৯৯৭
১০. আলোকিত জকিগনজ- জকিগনজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে- ২০০৮

শিক্ষা দরদী কাজী আবদুল খালীক

১৯৩৫-২০১৬



নিভৃতচারী একজন শিক্ষা দরদী মানুষ ছিলেন কাজী আবদুল খালীক। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি প্রবাস জীবন-যাপন করেছেন। তাই বর্তমান প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না।

জন্ম

সিলেটের জকিগনজ উপজেলার বীরশ্রী ইউনিয়নের পীরনগর গ্রামে ১৯৩৫ সালের ২২ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন কাজী আবদুল খালীক। তাঁর পিতা মরহুম কাজী আবদুর রাহমান, মাতা মরহুমা তমিজুন্নেসা খানম।

শিক্ষা জীবন

বীরশ্রী এমই স্কুলে (বর্তমান গুরুসদয় দত্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ) তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের শুরু। ১৯৫২ সালে জকিগনজ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে সিলেটের এমসি কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি এবং ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন।

কর্ম জীবন

১৯৫৮ সালে বিএ পাশের পর বীরশ্রীস্থ গুরুসদয় দত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্ম জীবনের শুরু। ১৯৬০ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তিনি লন্ডন পাড়ি জমান। কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলে কালক্রমে লন্ডনে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

জকিগনজ কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান

১৯৮২ সালে জকিগনজ উপজেলা সদরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে জনাব কাজী আবদুল খালীক কলেজের ভূমি ক্রয়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন। নানা কারণে কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হলে কলেজের জন্য ক্রয়কৃত ভূমিতে বন্যার্তদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র (Flood Shelter) নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে সাবেক মন্ত্রী জনাব এম এ হক (১৯১৮-১৯৯৬) এলাকাবাসীর সহযোগিতায় উল্লিখিত ফ্লাড শেল্টারে জকিগনজ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্কুল প্রতিষ্ঠা

নিজ এলাকার অনুন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের অভিপ্রায়ে কাজী আবদুল খালীক ১৯৮৪ সালের শেষ দিকে পীরনগর, চিরপুর, জামডহর, লেনজিরগ্রাম ও বড় পাথর প্রভৃতি গ্রামের মুরব্বিগণকে নিয়ে পরামর্শ সভা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, *কাজী আবদুল খালীক উচ্চ বিদ্যালয়* নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

কাজী আবদুল খালীক প্রস্তাবিত স্কুলের জন্য প্রথমে ১০৫ শতক এবং পরবর্তীতে আরো ৮৬ শতক ভূমি দান করেন। সেই সাথে সেমি পাকা একটি বিল্ডিং তৈরি করে দেন। এলাকার শিক্ষানুরাগি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি কাজী আবদুল খালীক উচ্চ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

১৯৮৫ সালের ৩ জুন স্কুলটি নিম্ন মাধ্যমিক এবং ১৯৮৭ সালের ৭ মার্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।

এলাকার দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ করে দেন জনাব কাজী আবদুল খালীক। শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধার জন্য ২০০৯ সালে তিনি ২২টি রিক্সা দান করেন। ২০১১ সালে রিক্সার পরিবর্তে ৩১ সিট বিশিষ্ট একটি মিনিবাস দান করেন। এই মিনিবাস দিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা বিনা ভাড়ায় স্কুলে যাতায়াত করছে।

হাফিজি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

১৯৯৪ সালে কাজী আবদুল খালীক'র অর্থায়নে স্থানীয় পীরনগরে *বয়তুছছুন্নাহ রাহমানিয়া মাদরাসা* নামে একটি হাফিজি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসার ফ্রী বোর্ডিংয়ে অবস্থান করে ছাত্ররা কুরআন শরীফ হিফয করছে।

স্কুল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও কাজী আবদুল খালীক এলাকার দরিদ্র মানুষকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে এসেছেন।

সংসার জীবন

কাজী আবদুল খালীক'র সহধর্মিনি জহুরুননেসা খালীক। তাঁদের চার পুত্র সন্তান, যথাক্রমে কাজী হায়দার হোসেন খালীক বাদল , কাজী দেলওয়ার হোসেন খালীক বাবুল, কাজী জবলুল হোসেন খালীক জবলু ও কাজী আনোয়ার হোসেন খালীক শিপলু। তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

ইন্তিকাল

২০১৬ সালের ২৭ জুলাই লন্ডনে কাজী আবদুল খালীক ইন্তিকাল করেন। ৩০ জুলাই বুরিয়াল পার্ক সেমিট্রিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদউল্লাহ বলেছিলেন, *যে দেশে গুণীর সমাদর নেই সে দেশে গুণী জন্মায় না।* তাই আসুন আমরা গুণীজনের যথাযত সমাদরে এগিয়ে আসি।

২৯ আগস্ট ২০১৭

সূত্র : মরহুমের জ্যৈষ্ঠ পুত্র কাজী হায়দার হোসেন খালীক বাদল প্রদত্ত তথ্যের আলোকে।


মতামত

আহলে হাদীস প্রসঙ্গ

ভারত বর্ষে ব্রিটিশ পাদ্রী সূচিত এই ধর্মনাশা আন্দোলনটি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকারের এক বিশেষ আদেশ বলে তাদের হাদীস ওয়ালা বলে রেজিস্ট্রি করা হয়। মুসলমানের ধর্ম, ব্রিটিশের রেজিস্ট্রি করা! বিশ্বাস যোগ্যই বটে। তখনও ভারত বর্ষের রাজভাষা ছিল ফারসি। তাই এই হাদীস ওয়ালা নামটিকে ফারসিতে অনুবাদ করে প্রচার করা হয় আহলে হাদীস রূপে। [ড. আহমদ আনিসুর রহমান : মৌলবাদের বিশ্বায়ন, পৃষ্ঠা ৯০। সময় প্রকাশন, ঢাকা।]

আহলে হাদীস নামধারী লা মাযহাবী এই চক্র বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। এক সময় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল নিজেদের জনবল বৃদ্ধির জন্য এদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করে নিয়েছিলো। অবশ্য তাদের চিন্তা চেতনায় সাদৃশ্যও আছে বহুলাংশে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় সেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছেন তথাকথিত এই আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীরা তাদের জন্যও বহুমূখি বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যপ্রাচ্য কানেকশন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে এই চক্রটির কারণেই।

বর্তমান সময়ে ক্ষমতাসিন দলের কিছু রথি-মহারথি সরাসরি জড়িত আছেন নামধারী আহলে হাদীস'র সাথে। তাদের আশকারাতেই এরা নির্বিঘ্নে কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ইসলাম মনস্ক তরুণদের এবং আংশিকভাবে মাদরাসাসা ছাত্রদের তাদের মতবাদে দিক্ষিত করছে। ফলে তাদের উগ্র মতবাদে বিশ্বাসী তরুণরা দ্রুত জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। আহলে হাদীস নামধারী শায়খদের বিভিন্ন উগ্র বক্তব্য ছড়িয়ে আছে ইউটিউব জুড়ে। তাদের মতে বাংলাদেশের আশিভাগ মানুষ সরাসরি শিরক এ জড়িত। তারা মুশরিক। তরুণদের এই বলে কাজে লাগানো হয় যে, শিরক মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত

করতে হবে। যুক্তিতে না হলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এতে মরলেও জান্নাতের গ্যারান্টি,মারলেও ঠিক তাই।

উগ্রবাদী তথাকথিত আহলে হাদীসদের দক্ষতার সাথে প্রতিহত করতে না পারলে জঙ্গিবাদের ভয়াল থাবা প্রসারিত হতেই থাকবে। এক সময় এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন পথই খোলা থাকবে না।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গুপ্ত ঘাতক দল খারিজীদের উদ্ভব হয়েছিলো কুরআন কারীমের আয়াত *ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ* বা হুকুমাত হবে একমাত্র আল্লাহর এই মহান শ্লোগানকে সামনে রেখে। এটা শোনে চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াআল্লাহু আনহু বলেছিলেন - كلمة حق اريد بها الباطل কথাটা সত্য তবে এদের উদ্দেশ্য বাতিল। অর্থাৎ ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চমৎকার এবং প্রকৃত সত্য একটি শ্লোগানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলো তারা। ঠিক সেভাবেই নব্য খারিজী আহলে হাদীসরা সহীহ হাদীসের অনুসরণের শ্লোগান দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে। প্রকৃত অর্থে ব্যাপকভাবে কিতাব জালিয়াতি এবং কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। এ যাবতকালে বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারি বিভিন্ন বাহিনীর হাতে যত জঙ্গি ধরা পড়েছে তাদের সবাই মাযহাব অমান্যকারি কথিত আহলে হাদীস চক্রের সদস্য। নিরপরাধ মানুষ হত্যায় তারা কিভাবে প্ররোচনা দেয় এর একটি নমুনা দেখুন।

আমরা জানি, চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণ দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বিধি বিধান সঠিক এবং সহজভাবে অনুসরণের প্রয়োজনবোধকে সামনে রেখে কুরআন-হাদীস ঘেটে বিভিন্ন মাসআলা মাসাঈল উদ্ভাবন করে অধ্যায় ভিত্তিক সাজিয়ে রেখে গেছেন। সাধারণ মুসলমানের জন্যে মুজতাহিদ ইমামগণের কারো না কারো তাকলিদ বা অনুসরণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। কারণ তাদের পক্ষে কুরআন-হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝে মাসআলার সমাধান বের করা সম্ভব নয়। অথচ এই নামধারী আহলে হাদীস শায়খগণ তাদের গ্রন্থে লিখেছে নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ ওয়াজিব বা আবশ্যক মনে করা হত্যা যোগ্য অপরাধ।

তাদের একজন শায়খ মুহাম্মাদ সুলতান আল মাসুমী আল খুজান্দী আল মাক্কী'র আরবি ভাষায় লেখা গ্রন্থ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة *মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণে বাধ্য* শিরোনামে বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক বিন আবদুস সালাম। সম্পাদনা করেছেন আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম। এ দু'জনই বাংলাদেশে আহলে হাদীস'র পরিচিত নেতা ও বক্তা।

বইটিতে স্পষ্ট লেখা আছে, *যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ ওয়াজিব বলে, তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে। (তাওবাহ করলে তো প্রাণে বাঁচল) অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।* [মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণে বাধ্য, পৃষ্ঠা ৩২। তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।]

ভাবুন তো, এরা কতখানি উগ্র (Extreme)। কতখানি জঙ্গি মনোভাবাপন্ন। সহীহ হাদীসের অনুসরণের নামে এরাই তরুণ সমাজের মগজ ধোলাই (Brainwash) করে উগ্রবাদের (Extremism) দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং সাধু সাবধান।

৩ মার্চ ২০১৮

মুক্তবাক

প্রফেসর ড. জাফর ইকবাল একজন মুক্তমনা, প্রগতিপন্থী, জ্ঞানী মানুষ সন্দেহ নেই। তিনি আস্তিক নাকি নাস্তিক সেটি জানি না। তবে তিনি একজন চতুর ইসলাম বিদ্বেষী, এতে সন্দেহ পোষণ করি না। তিনি একজন চেতনাজীবি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফেরী করেন। যদিও উপযুক্ত বয়স থাকা সত্বেও তিনি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেননি (মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৯ বছর)। মুক্তমনা, বিজ্ঞান মনস্কতা ইত্যাদির ছদ্মাবরণে যুব সমাজকে ক্রমান্বয়ে ইসলাম বিদ্বেষী করে গড়ে তোলার মিশন নিয়ে কাজ করছেন তিনি। এ সব কিছুর পরও কিন্তু তাঁর উপর গুপ্ত ঘাতকের হামলা সমর্থন করি না। কারণ ইসলাম এ ধরণের আচরণকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। যে সকল তরুণ ইসলামের নামে উগ্র জঙ্গিবাদের দিকে ধাবিত তারা নব্য খারিজীদের দ্বারা মগজধোলাই'র শিকার। বুদ্ধির মোকাবেলা বুদ্ধি দিয়েই করতে হবে। গুপ্তঘাতকের চাপাতি কিংবা বুলেট দিয়ে নয়।

এ দেশে যেমন তথাকথিত মুক্তমনা, বিজ্ঞান মনস্ক (!) লেখক-ব্লগার গুপ্তঘাতকের ছুরা চাপাতির নির্দয় আঘাতে প্রাণ দিয়েছে, ঠিক তেমনি মাওলানা ফারুকীরাও প্রাণ দিয়েছে একই চক্রের হাতে। কিন্তু আমাদের একচোখা মিডিয়া এবং রাজনীতিজীবি ও সুশীলদের আচরণ সব সময়ই ছিলো একপেশে। এ ধরণের অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটার পরেই ক্ষমতাসীন (যখন যারা ক্ষমতায় থাকে) দলের কর্তারা বিরোধি পক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফলে কোন কালেই নির্মোহ তদন্ত হয় না। হুকুমের গোলাম তদন্তকারীর কি এমন বুকের পাঠা যে কর্তার অঙ্গুলি নির্দেশের বাইরে যায়। ফলাফল যা হবার তাই হচ্ছে। জঙ্গি সর্বকালেই ক্ষমতাসীনদের তুরুপের তাশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশে জঙ্গিবাদিদের উত্থান প্রতিহত করতে দরকার সমন্বিত উদ্যোগ। তা না করে জঙ্গিদের রাজনীতির দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার সাপ নিয়ে খেলার সামিল। বিষধর সাপ ছোবল মারার ক্ষেত্রে কিন্তু শত্রু-মিত্র পরখ

করে না। বিবেক বন্দক রাখা দলদাসরা কর্তা স্তুতি নিয়েই থাকুন। কিন্তু মুক্তবাক তরুণের বুক ঠান করে প্রতিরোধে এগিয়ে আসার এখনই সময়।

(ড. জাফর ইকবাল'র উপর গুপ্ত ঘাতকের হামলার প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিক লেখা। গ্রেফতারকৃত হামলাকারী যুবক দিরাই উপজেলার কালিয়ার কাপন গ্রামের ফয়জুল হাসান এবং তার চাচা আহলে হাদীসের অনুসারী, তারা এলাকায় আহলে হাদীস মতবাদ প্রচারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে।

সূত্র : অনলাইন নিউজ পোর্টাল দৈনিক সিলেট, ৪ মার্চ ২০১৮)

প্রতিক্রিয়া

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে নবীজি বসে আছেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, সেইসব লোকের প্রতি অভিশম্পাত যারা তাদের মা বাবাকে গালি দেয়। সাহাবিগণ তো অবাক; জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন মানুষ কি আছে যে তার মা বাবাকে গালি দেয়? এবার খুলাসা করলেন নবীজি। বললেন- হয়তোবা সরাসরি গালি দেয় না। কিন্তু সে যখন অন্যের মা বাবাকে গালি দেয় পক্ষান্তরে সে নিজের মা বাবাকেই গালি দিলো। কেননা নিজের মা বাবাকে গালি দিতে শুনলে মানুষ স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়। ক্ষিপ্ততা বশত: সে তখন গালাগালির জবাব গালাগালি দিয়েই দেয়। একজন যখন অন্যের মা বাবাকে গালি দেবে তখন সে গালি দাতার মা বাবাকে গালি দেবে। সুতরাং অন্যের মা বাবাকে গালি দেয়া পক্ষান্তরে নিজের মা বাবাকেই গালি দেয়া।

আমি যখনই অন্যের মান্যবর গুরুজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবো কিংবা গালি দেবো সে তখন আমার গুরুজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে, গালি দেবে। এটাই স্বাভাবিক। এমতবস্থায় নিজের গুরুজনকে গালি দেয়ার জন্য দায়ি আমি নিজে। তাই মা বাবা, গুরুজনকে প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে গালি দেয়ার কারণে নবীজির ফরমান মতে অভিশম্পাতের উপযুক্ত হয়ে গেলাম।

সম্প্রতি একটি হোয়াট্সআপ গ্রুপে শায়খ আহমদ শফী সাহেবকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও কুরুচিপূর্ণ একটি লেখা দেখে এটিই আমার প্রতিক্রিয়া।

শায়খ আহমদ শফী সাহেবের মানহাজের সাথে আমি একমত না, তাই বলে তাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবো? কুরুচিপূর্ণ বাক্যবানে জর্জিত করবো?

বিভিন্ন মাসলাক, মানহাজের অনুসারী যেসকল তরুণ আলিম বিভিন্ন ইখতেলাফি বিষয়ে বয়ান করতে কিংবা লেখতে বেশি আগ্রহী তাদেরকে অনুরোধ করবো বর্তমান সময়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস, কালজয়ী বহু কিতাব প্রণেতা শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ হাফিযাহুল্লাহর লেখা *আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাঈলিল ইলমি ওয়াদ্দীন* এবং *আছারুল হাদীসিশশরীফ ফী ইখতিলাফিল আইম্মাতিল ফুকাহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম* কিতাব দু'টি দয়া করে পড়ুন।

ইখতিলাফ ছিলো, ইখতিলাফ আছে, ইখতিলাফ থাকবে। কিন্তু কারো সাথে ইখতিলাফ বা মতানৈক্য হলেই তার সম্মানে আঘাত করা কিংবা তাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার অধিকার আমার নেই।

চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে তো ইখতিলাফ ছিলো। ইখতিলাফ ছিলো বলেই তো পৃথক মাযহাব হয়েছে। এমনকি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে তাঁর দুইজন বিখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বহু সংখ্যক মাসআলায় ইখতিলাফ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ কারো সম্মানহানিকর কোন মন্তব্য করেছেন এমন নজির ইতিহাসে নেই। আমরা সবাই সালফে সালিহীন'র অনুসরণের দাবিদার। কিন্তু এসব বিষয়ে কেনো তাঁদের অনুসরণ করছি না?


স্মৃতিচারণ

স্মৃতি অম্লান

মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকীর খিদমতে এক সন্ধ্যা

১৯৯৯ সালের ১৪ এপ্রিল, যদ্দুর মনে পড়ছে দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। মসজিদে হারামে আসর নামায আদায়ের পর আব্বা আমাদের নিয়ে রুসাইফায় যাবেন। মাগরিব নামায ওখানে গিয়েই আদায় করতে হবে। ইসমাঈল ভাই গাড়ির ব্যবস্থা করলেন। মূলত: আমি এবং হাফিয নাঈম উদ্দিন সাহেব আব্বার সাথে যাওয়ার কথা। জানাজানি হয়ে গেলে পরিচিত কয়েকজন সাথে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রায় দশ বারোজনের কাফেলা হয়ে গেলো। রুসাইফার শারে মালিকীতে شارع المالكي পৌঁছতে মাগরিবের সময় হয়ে এলো। স্থানীয় মসজিদে নামায আদায় করে মসজিদের ঠিক বিপরীতে কাঙ্খিত সে বাড়িতে প্রবেশ করলেন আব্বা। পিছু পিছু কাফেলার অন্যান্যরা। ততক্ষণে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে সে বাড়ির আঙিনা। কার্পেট মোড়ানো আঙিনায় বসে পড়েছেন সবাই। দারস শুরু হবে। নির্ধারিত আসনে বসেছেন ধবধবে সাদা পাগড়ি পরিহিত সুঠাম দেহের অধিকারী যুগের ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী। আহলে বাইত'র মহান এ বুযূর্গের চেহারায় যেনো নূরের ঝিলিক। সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র ছোট ভাই মক্কা শরীফের প্রখ্যাত মুনশিদ সায়্যিদ আব্বাস বিন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বে একদল কাসিদায়ে বুরদা সুর করে গাইলেন। জান্নাতি আবেশ যেনো ছড়িয়ে গেলো মজলিস জুড়ে। সে দিনের দারস খুব দীর্ঘ হলো না। আবু দাউদ শরীফ থেকে কিছু পড়া হলো। মুহাদ্দিসুল হারামাইন ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ পঠিত হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন। দারস শেষে আগত মেহমানদের আপ্যায়ন করা হলো। একে একে বিদায় নিয়ে আগতরা চলে যেতে লাগলেন। এবার আব্বা আমাদের নিয়ে উনার একান্ত কাছে গেলেন। একে একে সবার পরিচয় দিলেন। আমার পরিচয়

দেয়ার পর *মাশাআল্লাহ* বলে মাথায় মুবারক হাত বুলিয়ে কাছে টেনে নিলেন। আব্বা আমাদের জন্য মুসালসাল হাদীসের ইজাযত চাইলেন। সানন্দে রাজি হয়ে তিনি *মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাহ*, *মুসালসাল বিল মুহাব্বাহ*, *মুসালসাল বিল মুসাফাহা* ও *মুসালসাল বিল আসওয়াদাইন* এ চার মুবারক হাদীস বিস্তারিত সনদসহ শোনালেন। পরে নির্ধারিত কয়েকজনকে লিখিত ইজাযত স্বাক্ষর করে দিলেন।

হাদীসে মুসালসাল বিল আসওয়াদাইন'র ইজাযত দেয়ার সময় থাল থেকে একটি করে খেজুর নিয়ে সবার হাতে হাতে দিলেন। সবার শেষে একটি খেজুর হাতে নিয়ে অর্ধেক নিজে খেয়ে বাকীটুকু আমার মুখে পুরে দিলেন। আমি তাঁর কিতাবাদির বাংলা তরজমা করার ইজাযত চাইলাম। বললেন-ঝামেলার সময় লিখিত দিতে পারছি না। তবে মৌখিক ইজাত দিলাম। উম্মতে মুহাম্মাদির উপকারের নিয়তে সব বাংলা তরজমার ব্যবস্থা করবে।

সেই স্বর্ণালী সন্ধ্যার স্মৃতি চির জাগরুক থাকবে।

পুনশ্চ : ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে একদিন বিকেল বেলা ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত حول الاحتفال بذكرى المولد الشريف নামক রিসালাখানা নিয়ে হাজির হলাম ফেঞ্চুগঞ্জ মুহাম্মাদিয়া মাদরাসায়। উদ্দেশ্য উক্ত মাদরাসার তৎকালিন উপাধ্যক্ষ (বর্তমান অধ্যক্ষ) মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আতহার ভাইকে দিয়ে রিসালাখানি অনুবাদ করাবো। মাদরাসা বোর্ডিংয়ে অবস্থানরত মাওলানা ফরিদ ভাই সময় চাইলেন। আমি সময় দিতে নারাজ। একরাতে অনুবাদ করে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত বাদ মাগরিব থেকে শুরু হলো অনুবাদ। ইশার নামায ও রাতের খাবার শেষে মাওলানা ফরিদ ভাই ফজর পর্যন্ত একটানা অনুবাদ করলেন, সাথে সাথে আমি কপি করে নিলাম। পরবর্তীতে সে অনুবাদ প্রথম আব্বাকে দেখালাম, তিনি কিছু সংশোধন করে দিলেন। এক বৃহস্পতিবার রাতে সিলেট শহরের সুবহানীঘাটে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ'র খিদমতে হাজির হলাম। তিনি মূল রিসালা হাতে নিয়ে অনুবাদ পড়ে শুনাতে বললেন। পড়ে শুনালাম। খুশি হয়ে প্রকাশের অনুমতি দিলেন।

কিছু দিনের মধ্যে লন্ডন প্রবাসি মাওলানা আবদুল কাহহার সাহেবের অর্থায়নে বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হলো।

হাবীব জিলানী হাফিযহুল্লাহ'র দারসে বুখারী

আব্বার সাথে এবার (২০১৮ খ্রী.) হারামাইন শরীফাইনের সফরে হাবীব জিলানী হাফিযাহুল্লাহ'র খিদমতে যাবো, সময় সুযোগ হলে উনার দারসে বুখারীতে বসবো এমন পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিলো।

মক্কা শরীফের বাসিন্দা আহলে বাইতের এ বুযূর্গ আলিমের নাম সায়্যিদ আল হাবীব উমার বিন হামিদ জিলানী হাফিযাহুল্লাহ। তাঁর উস্তাদের তালিকায় আছেন স্বীয় পিতা সায়্যিদ হামিদ, মহাদ্দিসুল হিজায সায়্যিদ আলাওয়ী বিন আব্বাস, শায়খ হাসান আল মাসসাত রাহিমাহুমুল্লাহসহ হারামাইন শরীফাইনের আহলুসসুন্নাহ অনুসারী প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম।

টেলিফোনে কথা প্রসঙ্গে আব্বাকে জানালাম হাবীব জিলানী হাফিযাহুল্লাহ'র খিদমতে যাওয়ার কথা। তিনিও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বললেন,আহলে বাইতের একজন বুযূর্গ আলিমের সুহবত আমাদের জন্য নিয়ামত।

আব্বা দেশ থেকে মক্কা শরীফ পৌঁছলেন ১ এপ্রিল ২০১৮ রবিবার ফজরের সময়। লন্ডন থেকে আমি পৌঁছলাম ২ এপ্রিল সোমবার ফজরের সময়।

প্রতি সোমবার বাদ এশা হাবীব জিলানী বুখারী শরীফের দারস প্রদান করেন। সে মতে উনার সেক্রেটারির সাথে আমাদের যাবার বিষয়টি আগে থেকেই আলাপ করে রাখা। মাগরিবের নামায শেষে আমরা রওয়ানা দিলাম। আব্বাকে নিয়ে মক্কা শরীফে আমাদের মেযবান আলহাজ নূরুদ্দিনের গাড়িতে আমি, মাওলানা সেলিম আহমদ, হাফিয শামসুদ্দিন সাবেল এবং সৌদি নাগরিক আবু রাইয়্যান নাজী মুহাম্মাদ আল মাদানী। ভিন্ন গাড়িতে মাওলানা আবদুল কাহহার, মাওলানা মুখলিসুর রাহমান, মাওলানা বেলাল আহমদ প্রমূখ।

মসজিদে হারাম থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে আন নুযহা حي النزهة এলাকায় হাবীব উমার বিন হামিদ জিলানীর আবাসস্থলে পৌঁছে গেলাম সময়মত।

আমরা পৌঁছে দেখলাম দারসে আগতরা বাআলাওয়ী তরীকার ওযীফা পড়ছেন। কিছু সময়ের মধ্যে হাবীব জিলানী তাশরীফ আনলেন। ওযীফা পড়ায় শরীক হলেন, শেষে দোয়া করলেন। ইতোমধ্যে আব্বার সাথে তাঁর পরিচয় ও কতোপকথন হলো। তিনি খুবই আগ্রহ ও সম্মানের সাথে আব্বাকে বসালেন। উনার ঘরের পেছন দিকে দেয়াল বেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানে কার্পেট মুড়ানো দারসের স্থান তখন লোকারণ্য। চেহারা সুরত, পোষাক পরিচ্ছদে মনে হলো কেবল আমরাই বহিরাগত। বয়োবৃদ্ধ থেকে শুরু করে বারো তেরো বছর বয়সের কিশোর শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়েছেন। একজন কৃষ্ণ বর্ণের তরুণের সুললি কণ্ঠে আযান ধ্বণিত হলো। ইশার নামায আদায়ের পরই কাঙ্খিত দারস শুরু হলো। সেদিন সবক ছিলো বুখারী শরীফের কিতাবুল আম্বিয়া। যারা মতন পাঠে আগ্রহী প্রত্যেকের হাতে বুখারী শরীফের নুসখা দেয়া হলো। আমি ও মাওলানা আবদুল কাহহার দু'টি নুসখা পেলাম। বিভিন্ন বয়সের পাঠক ধারাবাহিকভাবে متن পাঠ করলেন। শায়খ জিলানী পঠিত হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন। শেষ হলো দারস। এবার বিদায়ের পালা। আব্বা বিদায় চাইলেন, উনি না খাইয়ে বিদায় দিলেন না। খাবার পর আব্বা সনদ ও ইজাযত চাইলেন। এবার কেবল আমাদের বসিয়ে *হাদীসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাহ* শুনালেন। সেক্রেটারিকে ডেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে নির্দেশ দিলেন। সনদ প্রার্থীদের তালিকা ওয়াটসআপে দিতে বলে সনদ পাঠানোর আশ্বাস দিলেন।

সায়্যিদ উমার বিন হামিদ জিলানী হলেন বর্তমান সময়ে মক্কা শরীফে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও শাফিঈ মাযহাবের মুফতি। কয়েক ঘণ্টা তাঁর সুহবতে কাটানো জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।





মক্কা শরীফে হাবিব জিলানী হাফিযাহুল্লাহ'র ঘরে।

আব্বার সান্নিধ্যে শায়খ ড. নাজী

চার বছর আগের কথা। দিনটি ছিলো শুক্রবার। প্রিয় মাওলানা মারূফ সকাল বেলা ফোন করলেন। বললেন- বাহরাইনের শায়খ ড. নাজী বিন রাশীদ ব্যক্তিগত সফরে লন্ডন এসেছেন। দেখা করতে চাইলে জুমুআর সময় সুযোগ আছে। জুমুআর সময় পূর্ব লন্ডনের কারি হাউস মসজিদে গেলাম। দেখা হলো শায়খের সাথে। নামায শেষে শায়খ দাওয়াত কবুল করলেন। মাওলানা আবদুল কাহহার, মাওলানা মারূফ এবং আমি শায়খকে নিয়ে গেলাম মাইলএণ্ড রোডে, একটি বিরিয়ানী হাউসে। খাওয়ার পর গেলাম মাওলানা মারূফ'র ঘরে। কথা প্রসঙ্গে শায়খ আমাদের উস্তাদগণ সম্পর্কে জানলেন। আব্বার ইলমে হাদীসের খিদমাত নিয়ে অনেক কথা হলো। শায়খ আব্বার সাথে টেলিফোনে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ফোন করে কথা বলিয়ে দিলাম। তিনি আব্বার কাছ থেকে *হাদীসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াহ* শুনলেন। বললেন- আপনার ছেলেকে বলুন আপনার পক্ষ থেকে এই হাদীসের ইজাযত লিখে দিতে। আব্বা আমাকে হুকুম করলেন যেনো ইজাযত লিখে দেই। হুকুম পালন করলাম।

২০১৫ সালে গ্র্যাণ্ড ঈদে মীলাদুন্নবী মাহফিলে শায়খ নাজী বিন রাশীদ আমাদের আমন্ত্রণে লন্ডন এলেন। সেবারও তিনি আব্বার সাথে টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ করলেন। আব্বার কাছ থেকে সিহাহ সিত্তাহ'র মৌখিক ইজাযত নিলেন। সে সময় উলামায়ে কিরামের কাছ থেকে ইলমে হাদীসের সনদ গ্রহণ এবং ইজাযতের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বললেন।

২০১৭ সালের মার্চ মাসে সিলেটে অনুষ্ঠিত শানে রিসালাত সম্মেলনে মাওলানা মারূফ'র মাধ্যমে শায়খ নাজীকে দাওয়াত করা হলো। সে সময় শায়খ আব্বার সান্নিধ্যে একান্ত কিছু সময় কাটানোর ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। আমি আব্বার সাথে কথা বলে রাখলাম। কিন্তু দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের ব্যস্ততায় তা আর হয়ে উঠলো না। বাহরাইন ফিরে

যাওয়ার পর টেলিফোনে শায়খ খুব হতাশ কণ্ঠে বলেন, বাংলাদেশে শায়খুল হাদীস সাহেবের সাথে দেখা হলো অথচ একান্তে তাঁর কাছে বসতে পারলাম না। সরাসরি তাঁর কাছে কিছু হাদীস পড়ে সনদ নিতে পারলাম না।

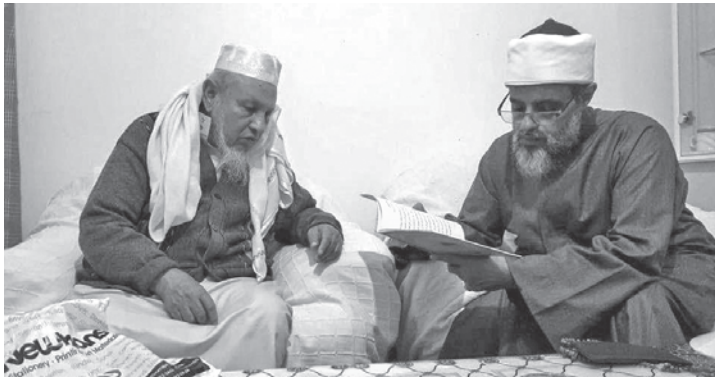
শায়খ নাজী'র আশা আল্লাহ পুরণ করে দিলেন। ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ সোমবার বিকেল ৬টায় তিনি ইস্ট লন্ডনের কল্টম্যান স্ট্রীটে কারী নুমান'র ঘরে শায়খ ড. নাজী এলেন। (আব্বা এবার লন্ডন সফরকালীন কারী নুমান'র ঘরে অবস্থান করছেন)। অনেক্ষণ ধরে শায়খ আব্বার কাছে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহসহ আব্বার অন্যান্য উস্তাদগণ সম্পর্কে জানলেন। দেওবন্দি ও বেরলবী উলামার ইখতিলাফের মৌলিক দিকগুলো সম্পর্কে জানলেন। আব্বার কাছে কিছু হাদীস পড়ে সনদ গ্রহণ করলেন।

মুবারক সে সময়ের নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি, কারী নুমান, মুফতি ইহসান, মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ ও মাহতাব আহমদ।

১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী শায়খ ড. নাজী বিন রাশীদ আল আরাবী আল মালিকী বাহরাইনের একজন বিখ্যাত আলিম। তিনি বাহরাইন ইউনিভার্সিটির আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। উচ্চতর লেখাপড়া করেছেন মিশরের আল আযহার ইউনিভার্সিটিতে। পিএইচডি করেছেন মরক্কোর রিবাত শহরে অবস্থিত মুহাম্মাদ আল খামিস ইউনিভার্সিটি থেকে।

কিছু দিন পূর্বে শায়খ ড. নাজী ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এক সপ্তাহের জন্য লন্ডন আসেন। যোগাযোগ হলে আব্বা লন্ডন আছেন জেনে দেখা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পশ্চিম লন্ডনে অবস্থিত হোটেল হিলটন থেকে ১৮ জুলাই (২০১৯) আমি তাঁকে নিয়ে এলাম পূর্ব লন্ডনের ওয়াপিংয়ে। আসার পথে গাড়িতে মুফতি সায়্যিদ আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ'র তাসনীফাত সম্পর্কে কথা হলো। সে মুহূর্তে আমার কাছে থাকা মুফতি সাহেবের লেখা *আদাবুল মুফতি* কিতাবের পিডিএফ ভার্সনে চোখ বুলিয়ে নিলেন। আব্বার সাথে কুশল বিনিময়ের পর *আদাবুল মুফতি* কিতাব

থেকে কিছু অংশ পড়লেন। পরে আমাকে বললেন, এই পর্যায়ের একজন আলিমের সান্নিধ্যে গেলে কিছু না কিছু পড়ার সুযোগ হাত ছাড়া করা উচিত নয়।



হাদীস পড়ছেন শায়খ নাজী।



আদাবুল মুফতি কিতাব পড়ছেন শায়খ নাজী।

প্রিন্সিপাল হাবীবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ
কিছু স্মৃতি, কিছু শ্রুতি

পরপারে পাড়ি জমালেন প্রিন্সপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ। আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস'র মেহমান করুন, সেই কামনা করি।

সন তারিখ মনে নেই, তবে তাঁকে প্রথম দেখি ইছামতি দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসায়। তিনি এসেছিলেন আব্বার সাথে দেখা করতে। সেদিনই প্রথম পরিচয়। নিয়মিত দেখা হবার সুযোগ ছিলো না। তবে সিলেটে কিংবা লন্ডনে কদাচিৎ দেখা হলে সালাম মুসাহাফার পরই জিজ্ঞেস করতেন, ভাই হুজুরের অবস্থা কেমন? একবার কোন এক সম্মিলিত আন্দোলন চলাকালীন জরুরি কিছু পরামর্শের জন্য আমরা কয়েকজন কাজির বাজার মাদরাসায় যাই। উনি তখন তাঁর অফিস কক্ষে বহু সংখ্যক আলিম পরিবেষ্টিত। আমরা পৌঁছা মাত্র প্রিন্সিপাল সাব নির্ধারিত আসন ছেড়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিজের পাশে নিয়ে বসালেন। খুবই সংকোচ বোধ করছিলাম। কিন্তু উনি নাছোড়, বাধ্য হয়ে বসলাম। সবার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই সাথে বললেন, *তাইন আমার হুজুরর বেটা, আমার লাগি ওয়াজিবুল এহতেরাম*। (তিনি আমার হুজুরের সন্তান, অবশ্যই আমার সম্মানের পাত্র।)

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে আব্বা সৎপুর দারুল হাদীস মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিশেবে যোগ দেন। এর পূর্বে প্রায় আট মাস ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদরাসায় ছিলেন। এসময় প্রিন্সিপার মাওলানা হাবীবুর রাহমান দাখিল চাহরমের (নবম শ্রেণি) ছাত্র। আব্বার কাছে শুনেছি, রুটিন মত দাখিল চাহরমে তাঁর ক্লাস ছিলো না। উনাদের ক্লাসে আরবি সাহিত্য যে শিক্ষক পড়াতেন তিনি অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। এসময় দাখিল চাহরমে আব্বা কিছু দিন আরবি সাহিত্য পড়িয়েছেন। সেই সময়ই প্রিন্সিপাল সাব আব্বার কাছে পড়েছেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আব্বা লন্ডন আসেন। একই ফ্লাইটে প্রিন্সিপাল সাবও ছিলেন। কিন্তু পথে তাঁদের দেখা হয়নি। হিথ্রোতে অবতরণের পর এয়ারপোর্ট'র আনুষ্ঠানিকতা শেষে আব্বা বেরিয়ে আসেন। আমরা তাঁকে নিয়ে এক জায়গায় বসাই। ইতোমধ্যে হুইল চেয়ারে করে প্রিন্সিপাল সাব বেরিয়ে আসেন। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখা করি। সালাম মুসাহাফার পর জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর কেমন আছেন? বললাম, এইমাত্র তিনিও লন্ডন এসেছেন। তাঁর ইসতেকবালে আসা লোকদের বললেন, আমাকে হুজুরের সাথে দেখা করাও। তাঁরা নিয়ে এলেন। আব্বা এগিয়ে গিয়ে কুশলাদি জানতে চাইলে বললেন, হুজুর আমি মাজুর হয়ে গেছি। বেআদবী মাফ করবেন, দাঁড়াতে পারছি না। সেদিনই উনার সাথে আমার শেষ দেখা।

প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান একজন আপোসহীন তেজস্বী আলিম ছিলেন। দেশ জাতি ও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁকে অগ্রণী ভূমিকায় পাওয়া যেতো। সিলেটে ভিন্ন মতের উলামার ঐক্য গড়তে তাঁকে নমনীয় এবং উদার হতে দেখা যেতো।

১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর সিলেট কেন্দ্রীক ইসলামী ঐক্যজোট গঠিত হয়। নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট মনোনীত প্রার্থী ছিলেন সিলেট পাঁচ (জকিগনজ-কানাইঘাট) মাওলানা উবায়দুল হক উজিরপুরী। সিলেট ছয় (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ) প্রিন্সপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান। সুনামগঞ্জ পাঁচ (ছাতক-দোয়ারাবাজ) মাওলানা আবদুস সালাম আল মাদানী।

সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফুরুঈ ইখতিলাফ পেছনে রেখে বিভিন্ন মতের উলামায়ে কিরামের ঐক্য আমরা তরুণদের উদ্বেলিত করেছিলো। বিশেষ করে বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ ও হাফিয মাওলানা আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহিমাহুল্লাহ যখন এক সাথে একই মঞ্চে পরস্পরকে পরম শ্রদ্ধায় সম্বোধন করতেন তখন তরুণরা উচ্ছসিত হতাম। স্পষ্ট মনে আছে, ছাতকের গোবিন্দগনজ পয়েন্টে ইসলামী ঐক্যজোট মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আবদুস সালাম আল মাদানীর নির্বাচনী জনসভায়

শ্লোগানে মুখরিত হাজারো মানুষ। মরহুম কবি কামাল আহমদ শরীফির উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় উভয় ধারার বহু আলিম বক্তব্য রাখলেন। মঞ্চে আছেন দুই দিকপাল। শেষ বক্তা হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহর ঠিক পূর্ববর্তী হযরত শায়খে কৌড়িয়ার নাম ঘোষণা হলো। তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এক দেড় মিনিটের এক চমৎকার বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, *সূরুজ উঠিগেলে দেলাইটর আর কোনু দরকার নাই, দেলাইট জ্বালাইলিলে মোমবাত্তির কোনু কাম নাই। যে যাগাত ফুলতলী ছাব কিবলা তশিব রাখছইন ইনো আমার আর আগলা কুচ্ছু কইবার নাই। তাইন যেতা কইবা অটাউ আমার কথা, তাইন যে মত দিবা অটাউ আমার মত।* (সূর্য উদিত হলে হ্যাজাক বাতির কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে দিলে মোমবাতির কোন প্রয়োজন নেই। যেখানে ফুলতলী ছাহেব কিবলা আছেন সেখানে আমার কোন বক্তব্য নেই। তিনি যে বক্তব্য দেবেন সেটাই আমার বক্তব্য, তিনি যে মত ব্যক্ত করবেন সেটিই আমার মত।) সেদিন মঞ্চে শায়খে কৌড়িয়ার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে শোনা সেই কথাগুলো বারবার কর্ণকূহরে প্রতিধ্বনিত হয়।

১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্রীক বহু স্মৃতি, বহু অভিজ্ঞতা অমলিন হয়ে আছে। একদিন বিকাল ৩টায় বিয়ানীবাজার প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ'র নির্বাচনী জনসভায় উনার ঠিক আগে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট বক্তব্য রাখলাম। বক্তব্য শেষে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিলেন। মুখে কেবল বললেন, ভাই আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। সেদিনই সন্ধ্যার পর জকিগনজের মুনশিবাজারে মাওলানা উবায়দুল হক উজিরপুরী রাহিমাহুল্লাহ'র জনসভায় প্রায় একঘণ্টা বক্তব্য রাখলাম। তিনদিন পর আব্বার সাথে দেখা করতে বাড়িতে এলেন আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার। আব্বার সামনে আমার হাত ধরে বললেন, *হিদিন মুনশিবাজার যে বকতিতা রাখছো ইলা আরো কয় জাগাত মাইকর লাগাল ফাইলে নৌকার ভরা ডুবাইলিবায়।* (সেদিন মুনশি বাজারে যে বক্তব্য রেখেছো এরকম আরো কিছু জায়গায় মাইক পেলে নৌকা ডুবিয়ে

দেবে।) আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, *আপনারে লইয়া বেআদবী কুচ্ছু মাতছেনি?* (আপনারে নিয়ে বেয়াদবীমূলক কিছু বলেছে?) বললেন, *জ্বি না, তাইন আমার নামউ লইছননা। খালি আওয়ামীলীগ লইয়া মাতিছইন।* (জি না, সে তো আমার নামই উচ্চারণ করেনি। কেবল আওয়ামীলীগ সম্পর্কে কথা বলেছে।)

উল্লেখ্য যে, সে নির্বাচনে সিলেট পাঁচ আসনে মাওলানা উবায়দুল হক উচিরপুরী বিজয়ী হয়েছিলেন।

সময় প্রমাণ করবে যুগে যুগে প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ'র মতো মানুষের সমাজে কত প্রয়োজন।

ইখতিলাফ ছিলো, ইখতিলাফ আছে, ইখতিলাফ থাকবে। সব কিছুর পর পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা বড় বেশি প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনবোধ সবার মাঝে জাগ্রত হোক সে কামনা করি।

আল্লাহপাক প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রাহমানকে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন।

(২০ অক্টোবর কায়রো যাবার পথে উড়োজাহাজে বসে নোটবুকে লিখাটি ড্রাফট করেছিলাম। কিছু সংশোধন পূর্বক আজ ২৬ অক্টোবর, ২০১৮ পোস্ট করলাম।)

কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া
একটি ব্যতিক্রমী ভ্রমন বৃত্তান্ত

বিগত ২১ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০১৮ জীবনের এক অনন্য সময়। এ সময়টা কাটিয়েছি প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরের রাজধানী শহর কায়রো এবং বন্দর নগরী আলেকজান্দ্রিয়ায়। দিন মোটে চারটি, কিন্তু প্রাপ্তি অফুরন্ত।

সফরের প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ দিন আমরা ছিলাম কায়রোতে। আর তৃতীয় দিন আলেকজান্দ্রিয়ায়। চলমান লেখাটি ভ্রমন কাহিনীর আদলে হবে না। বরং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও জীবনীর মিশেল থাকবে।

আব্বা মিশর সফরে যাবেন, সে মতে লন্ডন সফরে আসার পূর্বেই মিশরের ভিসা সংগ্রহ করা হয়। মিশর যাবার দিন নির্ধারণ হয় ২০ অক্টোবর ২০১৮ শনিবার। আব্বার সাথে আমি যাবো সে সিদ্ধান্ত আগেরই, তাই ইজিপ্ট এয়ার এর টিকেট করে রাখি। ২৪ আগস্ট আব্বা লন্ডন পৌঁছার পর থেকেই মিশর সফরের কথা জানাজানি হতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে সফরসঙ্গীর সংখ্যা বেড়েই চলে। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়ায় ঊনচল্লিশ। এর মধ্যে রয়েছেন মাওলানা ফখরুল ইসলাম, মাওলানা মুফতি ইলিয়াছ হোসেইন, মাওলানা শিহাব উদ্দিন, মাওলানা আবদুর রাহমান নিজামী, মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরী, মাওলানা আবদুল কাহহার, মাওলানা হোসাইন আহমদ আমিনী, হাফিয মাওলানা কয়েসুজ্জামান, মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, মাওলানা ফয়সল আহমদ হানাফী, মাওলানা রুহুল আমিন, হাফিয আবদুল হাকীম, হাফিয হাবীবুর রাহমান মিলাদ প্রমূখ।

২০ অক্টোবর লন্ডন সময় রাত দশটা দশ মিনিটে হিথ্রো বিমান বন্দর'র টার্মিনাল ২ থেকে কায়রোগামী ইজিপ্ট এয়ার'র ফ্লাইট ছেড়ে যায়। স্থানীয় সময় রাত তিনটা পয়তাল্লিশ মিনিটে কায়রো বিমান বন্দর'র টার্মিনাল ৩ এ অবতরণ করে। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে পূর্ব নির্ধারিত বাস যোগে আলেকজান্দ্রিয়া রোডে অবস্থিত পিরামিড পার্ক

রিসোর্ট এ পৌঁছি। ফজরের নামায, নাস্তা এবং ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম শেষে আমরা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মতে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন এবং ইমামগণের মাকাম যিয়ারতে বেরিয়ে পড়ি।

এ পর্যায়ে কেবল কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় আল্লাহর যে সকল মাকবুল বান্দার কবর যিয়ারত করেছি তাঁদের নাম উল্লেখ করবো। এছাড়া দু'টি শহরে যে কয়টি ঐতিহাসিক স্থান দেখার সুযোগ হয়েছে সেগুলোরও নাম উল্লেখ থাকবে। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে সেই মহান মানুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং পরে দর্শনীয় স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরবো।

কায়রোতে যাদের যিয়ারত করেছি

১. সায়্যিদিনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মস্তক মুবারকের কবর শরীফ।

২. সায়্যিদিনা আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার।

৩. সায়্যিদিনা উকবাহ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার।

৪. সায়্যিদিনা আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার।

৫. সায়্যিদা যাইনাব বিনতে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহার মাযার।

৬. সায়্যিদা নাফীসা বিনতে হাসান আল আনওয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহার মাযার।

৭. সায়্যিদা ফাতিমা বিনতে হাসান আল আনওয়ার রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

৮. হযরত মুহাম্মাদ বিন হানফিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

৯. হযরত রাবিয়া বাসরী আলাইহার রাহমাহ'র মাযার।

১০. হযরত যুননুন মিশরি রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

১১. ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

১২.ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

১৩. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

১৪. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

১৫. ইমাম লাইছ বিন সা'দ রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
১৬. ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
১৭. ইমাম শিহাবুদ্দিন কুস্তুলানি রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
১৮. ইমাম আহমাদ দারদীর রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
১৯. সুলতানুল আউলিয়া আবদুল্লাহ বিন আবু জামরা রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
২০. ইমাম ইবন সায়্যিদুন নাস রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
২১. ইমাম ইবন দাকীকুল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
২২. ইমামুল আউলিয়া ইবন আতাউল্লাহ সিকান্দারি রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
২৩. ইমাম কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।

কায়রোতে যে সকল ঐতিহাসিক স্থান দেখেছি

১. পিরামিড।
২. আমর ইবনুল আ'স মসজিদ।
৩. সালাহউদ্দিন আইউবির কেল্লা।
৪. মুহাম্মাদ আলী মসজিদ।
৫. কায়রো মিউজিয়াম।
৬. নীল নদী।
৭. আল আযহার ইউনিভার্সিটি।

আলেকজান্দ্রিয়া যাদের যিয়ারত করেছি

১. নবী দানিয়াল আলাইহিস সালাম'র রওযা।
২. হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম'র রওযা।
৩. ইমাম আবুল আব্বাস মুরসি রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
৪. ইমাম বুসিরী রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
৫. হযরত ইয়াকুত আল আরশ রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
৬. হযরত সায়্যিদ মাকীনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার।
৭. ইমাম যাইনুল আবিদীন রাহিমাহুল্লাহ'র তিনজন পুত্র সন্তান'র মাযার।

ঐতিহাসিক স্থান

১. ভূমধ্যসাগরের তীরে সুলতান কায়তাবাঈ'র কেল্লা।

২. রুমান থিয়েটার।

৩. আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি।

উল্লেখ্য যে, মিশরে মানব বসতির ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইমাম সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ পরিবেশিত তথ্য মতে হযরত শীস আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই কাবিল'র সন্তানদের সাথে নিয়ে প্রথম এই ভূখণ্ডে আগমন করেন। (সূত্রঃ হুসনুল মুহাদারাহ ফী তারীখি মিশর ওয়াল কাহিরাহ, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩০)।

মিশরের কথা কুরআনুল কারীমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ত্রিশ এরও অধিকবার উল্লেখ রয়েছে। মিশরের রাজধানী শহর কায়রোর আদি নাম ফুসতাত। ২১ হিজরিতে ফুসতাত নগরীর সূচনা করেন মিশর বিজয়ী সাহাবি সায়্যিদিনা আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর ভূমধ্যসাগরের তীর ঘেসে অবস্থিত বন্দর নগরী আলেকজান্দ্রিয়া খ্রীস্টপূর্ব হাজার বছরের পুরাতন শহর। সুতরাং এ দু'টি শহরের পরতে পরতে রয়েছে জানা অজানা ইতিহাসের অনেক উপাত্ত।

সায়্যিদিনা উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার যিয়ারত

সাহাবি সায়্যিদিনা উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর শরীফ আমরা দুইবার যিয়ারত করেছি। প্রথমবার ২১ অক্টোবর রবিবার। সেদিন পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মতে বিভিন্ন স্থান দেখা এবং যিয়ারত শেষ করে কাঙ্খিত সে স্থানটিতে পৌঁছিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মাগরিবের নামায শেষে মহান সাহাবির মাযার যিয়ারত করি। সফরজনিত ক্লান্তির কারণে আব্বা সেদিন যিয়ারতে যেতে পারেন নি। বাহ্যত এ কারণেই আমরা দ্বিতীয়বার প্রিয় নবীর মর্যাবান এ সাহাবির মাযার যিয়ারতের সুযোগ লাভ করি। ২৪ অক্টোবর বুধবার সকালে আব্বার সাথে হাজির হই মাযার শরীফে। মাযারের পাশে বসে আব্বা *মুসালসাল বিল আউয়ালিয়্যাত* হাদীসের দারস প্রদান করেন। একজন সাহাবির মাযারের পাশে বসে যুগশ্রেষ্ঠ এক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে প্রিয় নবীজির হাদীস শোনা সত্যিই বিরল সৌভাগ্যের বিষয়। মনপ্রাণ উজাড় করে বলতে হয়- هذا من فضل ربي এটা আমার রবের অনুগ্রহ।

মাযার শরীফে রক্ষিত লিখিত তথ্য মতে মাযারের উপর নির্মিত কারুকার্জ খচিত কুব্বা এবং সংযুক্ত মসজিদটি সুলতান সালাহুদ্দিন আইউবী রাহিমাহুল্লাহ নির্মাণ করেছেন। মাযারের দেয়ালে ছোট্ট একখণ্ড কালো পাথর প্রোথিত আছে। কথিত আছে যে, এই পাথর টুকরো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছিলেন।







সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সায়্যিদিনা উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা শরীফের বনু জুহানা গোত্রের লোক। হিজরতের আনুমানিক পনেরো বা ষোল বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হিজরত করে মদীনায় আসেন উকবা শহর থেকে দূরে একটি উপত্যকায় অন্যদের সাথে নিজের বকরি চরাচ্ছিলেন। নবীজির আগমনের সংবাদে শোনে উকবা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আসহাবে সুফফার অন্যতম সাহাবি উকবা বিন আমির তৃতীয় হিজরিতে সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধে প্রথম অংশ গ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় দেন। পরবর্তী প্রতিটি যুদ্ধে তিনি নবীজির সাথে ছিলেন। কালক্রমে একজন দক্ষ তীরন্দাজ হিশেবে তিনি খ্যাতিমান হন।

উকবা সবসময় সানন্দ চিত্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খিদমত করতে পছন্দ করতেন। নবীজি সফরে বের হলে উকবা তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে টেনে নেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ফকীহ, বাগ্মী এবং কবি ছিলেন। কণ্ঠস্বর ছিলো খুবই মধুর। তাঁর সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত শোনে সাহাবায়ে কিরাম আকুল হয়ে কাঁদতেন।

সায়্যিদিনা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব পরিচালিত সিরিয়া অভিযানে উকবা'র সাহসী ভূমিকা খুবই আলোচিত হয়। সিরিয়া বিজিত হলে সেনাপতির নির্দেশে আমীরুল মু'মিনীনকে দ্রুত বিজয় সংবাদ পৌঁছাতে মাত্র আট দিনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি মদীনা শরীফ আসেন।

২০ হিজরিতে সায়্যিদিনা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পরিচালিত মিশর বিজয় অভিযানে উকবা একজন অভিজ্ঞ এবং সাহসী সৈনিক হিশেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৪৪ হিজরিতে আমীর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উকবা বিন আমিরকে মিশরের প্রশাসক নিয়োগ করেন। ৪৭ হিজরির রবিউল মাসের দশ

তারিখে আমীর মুআবিয়া তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করেন। দুই বছর তিন মাস সময়কাল তিনি মিশরের প্রশাসক ছিলেন।

বর্তমান কায়রো শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মুকাত্তাম পাহাড়ের جبل المقطم। উপর তাঁর বাড়ি ছিলো।

৫৮ হিজরিতে উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন। মুকাত্তাম পাহাড়ের উপত্যকায় তাঁকে দাফন করা হয়।

উকবা বিন আমির আল জুহনী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৫। তন্মধ্যে বুখারী-মুসলিমে (متفق عليه) ১৭টি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে ১টি ও মুসলিম শরীফে ৪টি হাদীস উল্লিখিত আছে।

সায়্যিদিনা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার যিয়ারত

২৪ অক্টোবর বুধবার সকালে আব্বার সাথে আমরা মিশর বিজেতা সায়্যিদিনা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার যিয়ারত করি। কায়রো শহরের আল মুকাত্তাম নামক পাহাড়ের (جبل المقطم) পাদদেশে অবস্থিত সাহাবি হযরত উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার সংযুক্ত মসজিদে মূল গেট দিয়ে প্রবেশ করলে হাতের ডান পাশে সবুজ পেইন্ট করা চিহ্নিত স্থানটি হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন।

উল্লেখ্য যে, কায়রো শহরের প্রাচীন ইতিহাস ঘাটাঘাটি করলে দেখা যায় জাবাল আল মুকাত্তাম'র পাদদেশে নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে অবস্থিত গোরস্থানে সাতজন সাহাবির কবর রয়েছে। তন্মধ্যে একমাত্র উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত। হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর জাবাল মুকাত্তাম'র পাদদেশে অবস্থিত, এটি নিশ্চিত। তবে কবরের নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে ইতিহাসে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। যুক্তির নিরিখে দু'টি বর্ণনাকেই আমলে নেয়া যায়।

প্রথমত: ইন্তিকালের পূর্বে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওসিয়ত করেছিলেন দাফনের পর যেনো তাঁর কবর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। সেই ওসিয়ত সূত্রে তাঁর কবর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে কবরের সঠিক স্থানটি মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত: ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমী শাসকগণ মিশর জয় করে কায়রোতে রাজধানী স্থানান্তর করে। এসময় কায়রোর জাবাল আল মুকাত্তাম'র পাদদেশে অবস্থিত হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং হীনমন্যতার কারণে এরূপ করাটা অসম্ভব নয়।



সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক এবং দূরদর্শী কূটনীতিবিদ ও বিজ্ঞ বাগ্মী হিশেবে সায়্যিদিনা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপক পরিচিত নাম।

কুরাইশ বংশের বনু সাহম গোত্রের সন্তান আমর'র কুনিয়াত আবু আবদিল্লাহ ও আবু মুহাম্মাদ। তাঁর পিতা আস, মাতা নাবিগা। জাহিলিয়াতের সময় তিনি মক্কার একজন দুর্দান্ত সাহসী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন।

পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের পর তাঁর চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি ইসলামের বিরোধিতা থেকে সরে আসেন।

ইতিহাসের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে আমর ইবনুল আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং উসমান বিন তালহা পৃথক পৃথকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা তায়্যিবায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মুবারক হাতে বাইআত হন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা শরীফে ফিরে যান। কিছু দিন পর তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন। আমর ইবনুল আস ও খালিদ বিন ওয়ালিদ'র *বাইআত* পরবর্তীতে নবীজি সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, *মক্কা তার কলিজার দু'টি টুকরো তোমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে।*

মক্কা বিজয় অভিযানে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথেই ছিলেন। হুনাইন ও তায়েফ অভিযানেও তিনি বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের পর জাযিরাতুল আরবের সর্বত্র ইসলামের জয় জয়কার শুরু হয়। বিভিন্ন গোত্রের মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রিত হতে থাকে। ঠিক সেসময়ে বনু কুদাআ গোত্রের লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেয়ে

নবীজি আমর ইবনুল আস'র নেতৃত্বে তিন'শ মুজাহিদের বাহিনী প্রেরণ করেন। *যাতুস সালাসিল* নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে আমর সাহায্য চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে সংবাদ পাঠালেন। তাৎক্ষণিক নবীজি আবু উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নেতৃত্বে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বাধিন বাহিনীকে সাহায্যের জন্য দুই'শ সৈন্য প্রেরণ করেন। সাহায্যকারী বাহিনীতে সায়্যিদিনা আবু বাকর ও সায়্যিদিনা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র মতো মর্যাদাবান সাহাবি ছিলেন। কিন্তু সবাই আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে বনু কুদাআর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ *যাতুস সালাসিল যুদ্ধ* নামে প্রসিদ্ধ।

অষ্টম হিজরির শেষদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমান'র দুই সহোদর বাদশা জিফার ও আবদ এর কাছে ইসলামের দাওয়াতপত্র দিয়ে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। পত্রপাঠে তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজি আমর ইবনুল আসকে ওমানের আমীর নিয়োগ করেন।

সায়্যিদিনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে শাম অভিযানে আমর ইবনুল আস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফিলিস্তিন এলাকায় অভিযানে নেতৃত্ব দিতে খলীফা আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আসকে পত্র পাঠালেন। লিখলেন, *রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ওমানে যে পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন এর প্রতি সম্মান রেখেই জানাচ্ছি যে, বর্তমানে দ্বীনের স্বার্থে তোমাকে ফিলিস্তিন এলাকায় প্রেরিত বাহিনীর কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো। উত্তরে আমর ইবনুল আস লিখে পাঠালেন, আমি তো আল্লাহর রাহে নিবেদিত একটি তীর মাত্র। দক্ষ তীরন্দাজ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হিশেবে সে তীর যেদিকে ইচ্ছা ছুঁড়ে মারার অধিকার আপনার আছে।*

সায়্যিদিনা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে শাম (সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন ও ইসরাইল এই পূর্ণ এলাকা তখনকার শাম'র অন্তর্ভুক্তে ছিলো) পরিপূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসে। শামের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে খ্রীস্টিয় রোমান সাম্রাজ্যের

অধিপতি হিরাক্লিয়াস তিন লক্ষ সৈন্য সমবেত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইয়ারমুকে (ইয়ারমুক বর্তমান জর্দানের অন্তর্গত) সংঘটিত সে যুদ্ধে *সাইফুল্লাহ* বা আল্লাহর তরবারী খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কমাণ্ডার। তাঁর সহযোগি ছিলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, আমর ইবনুল আস, সুরাহবিল বিন হাসানাহ ও ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুম। ১৫ হিজরিতে (৬৩৬ খ্রীস্টাব্দ) সংঘটিত ইয়ারমুক যুদ্ধে তিন লক্ষ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ছেচল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের অভাবনীয় বিজয়ে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দূরদর্শী সমর নৈপুন্য বিশাল অবদান রাখে।

১৬ হিজরিতে আমর ইবনুল আস ফিলিস্তিনে ফিরে এসে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এবার তিনি প্রাচীন নগরী ইলিয়া (জেরুজালেম'র প্রাচীন নাম ইলিয়া) অবরোধে অগ্রসর হন। এ শহরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মি'রাজের স্মৃতি বিজড়িত মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস বা মসজিদে আকসা অবস্থিত। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বাধিন বাহিনীও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহায়তায় এগিয়ে এলো। দীর্ঘ অবরোধের পর শহরবাসী ইহুদীরা এই শর্তে আত্ম সমর্পণে সম্মত হলো যে, স্বয়ং খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে শহর ফটকের চাবী গ্রহণ করবেন।

১৮ হিজরিতে খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি নিয়ে মাত্র চার হাজার সৈন্যসহ আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর অভিযানে রওয়ান দেন। খলীফা আমর'র সাহায্যের জন্য উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আরো চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। পথে পথে কিছু খণ্ড যুদ্ধ করে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আমর ইবনুল আস ফুসতাত (কায়রো শহরের আদি নাম ফুসতাত) দখল করে নেন। বিজিত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ পোক্ত করে আমর ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) অভিযানে অগ্রসর হন। সুরক্ষিত প্রাচীর বেষ্ঠিত ইসকান্দারিয়া নগরী দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ করে রাখেন আমর। অবশেষে খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র মারফত পাঠানো

জোরালো নির্দেশে আমর ইবনুল আস সাঁড়াষি আক্রমণ চালিয়ে বাদশা মুকাওকিসকে পরাজিত করে নগরী দখল করে নেন। বিজিত নগরীর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে আমর ফুসতাত বা কায়রোতে ফিরে আসেন। ২১ হিজরিতে ফুসতাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে মসজিদটির নাম হয় *আমর ইবনুল আস মসজিদ*। ইতিহাসের প্রামান্য বর্ণনা মতে এটি গোটা আফ্রিকার মধ্যে নির্মিত প্রথম মসজিদ।

খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আসকে মিশরের প্রশাসক নিয়োগ করেন। ২৩ হিজরির ২৬ যিলহাজ্জ খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা মনোনীত হলে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিশরের গভর্ণর পদে বহাল রাখেন। ২৬ হিজরিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে গভর্ণর পদ থেকে অব্যাহতি দেন। আমর মদীনা তায়্যিবায় ফিরে এসে কিছু দিন অবস্থান করে ফিলিস্তিন গিয়ে বসত করেন। ইহুদী-খারিজীদের যোগপথ ষড়যন্ত্রের ফলে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণের পর মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা মনোনীত হন। দামেশকের গভর্ণর আমীর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাতে বাইআত না হয়ে উসমান হত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। মুআবিয়া বহু চেষ্টার পর ফিলিস্তিনে বসতরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের দলে টানতে সক্ষম হন। ৩৭ হিজরিতে মুআবিয়া কর্তৃক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে পরিচালিত সিফফিনের যুদ্ধে আমর মুআবিয়ার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিবাদমান উভয় পক্ষের বিরোধ মীমাংসায় আমর ইবনুল আস মুআবিয়ার পক্ষে এবং আবু মূসা আশআরী আলীর পক্ষে শালিস নিযুক্ত হন।

৪০ হিজরির ১৭ রামাদান ফজরের নামাযে যাওয়ার পথে খারিজী গুপ্তঘাতকের হাতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করলে ক্রমান্বয়ে মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র শাসক হয়ে যান আমীর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৪০ হিজরির শেষ দিকে মুআবিয়া আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আবারো মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করেন।

৪৩ হিজরির ঈদুল ফিতরের দিন ভোর বেলা মিশরের গভর্নর পদে

বহাল থাকা অবস্থায় কায়রো শহরের জাবাল আল মুকাত্তাম'র উপরিভাগে অবস্থিত নিজ ঘরে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন। সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে ইন্তিকালের পূর্বে আমর ইবনুল আস ওসিয়ত করেন, একটি পশু জবাই করে তা কেটে বন্টন করার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত যেনো তাঁকে দাফনের পর সবাই কবরের পাশে অবস্থান করেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব কাউনুল ইসলাম ইয়াহদিমু মা কাবলাহু)

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে ৩৯টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহি তিনটি। এবং এককভাবে বুখারী শরীফে একটি ও এককভাবে মুসলিম শরীফে দুইটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। [অসম্পূণ]

(কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি বইয়ের কাজ চলমান আছে।)

জীবন থেকে নেয়া

আমাদের সময়ে এসে কিতাব পড়ার যোগ্যতা এবং মানসিকতা দুটোই দুঃখজনকভাবে কমে যাচ্ছে।

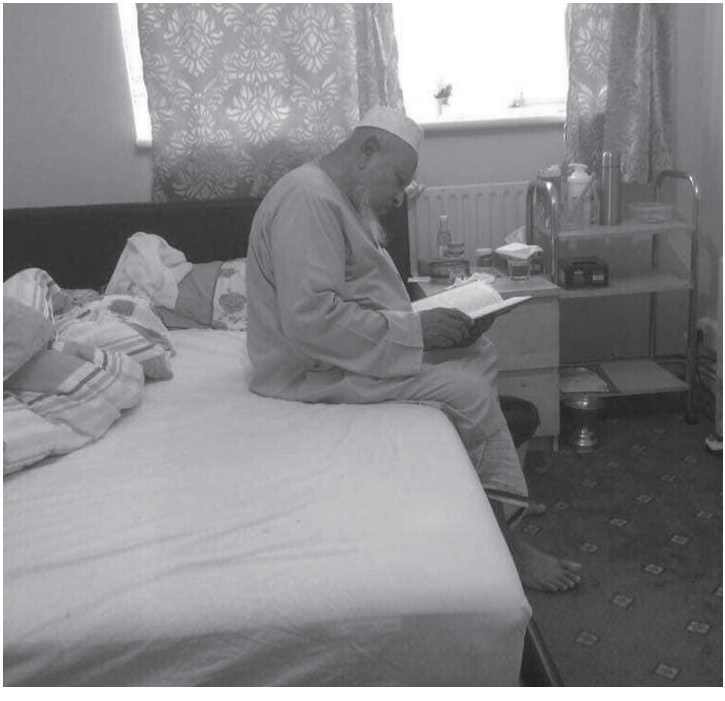
৮৫ বছর বয়সে সফররত অবস্থায় অসুস্থ শরীর নিয়ে আব্বাকে যখন রোজ তিন-চার ঘণ্টা পড়তে দেখি তখন নিজের এবং নিজের প্রজন্মের প্রতি ঘৃণা ধরে যায়।

আজও দেখলাম ফজরের পর তিলাওয়াত, ওযীফা শেষ করে একটি খেজুর খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়েন। ঠিক নয়টায় ঘুম থেকে উঠে নাস্তা সেরেই কিতাব নিয়ে বসেন। এগারোটায় দু'জন সাক্ষাৎপ্রার্থী এলে কিতাব হাত থেকে রাখেন। বারোটার দিকে ইস্টহাম এলাকায় পূর্ব নির্ধারিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম শেষ করে সেখানেই একটি ঘরে দুপুরের খাবার পর তিনটার দিকে ঘরে ফিরে আসেন। কাপড় পরিবর্তন করেই কিতাব নিয়ে বসেন। ঘণ্টাখানেক পড়ে কিতাব পাশে নিয়েই ঘুমিয়ে যান। মাত্র আধঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে আবারো কিতাব নিয়ে বসেন।

তখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। ১৯৮৮ সালের কোন এক সন্ধ্যা। আব্বা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,রোজ কয় ঘণ্টা পড়? সেরকম করে তো হিসেব করিনি কখনো। নিরুত্তর দাঁড়িয়ে আছি। বললেন, রোজ কম পক্ষে পাঁচ- ছয় ঘণ্টা যদি না পড়তে পারো তবে নিজেকে ছাত্র পরিচয় দেয়া ঠিক না। সেই সাথে বললেন, কেবল সিলেবাসের বই পড়লে হবে না; সিলেবাসের বাইরেও পড়বে। নিয়মিত পত্র পত্রিকা পড়বে। তবে ছাত্র জীবনে সিলেবাসের বইকে প্রাধান্য দিতে হবে।

একবার তাঁর ছাত্র জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, পুরো ছাত্র জীবন রোজ তিন ঘণ্টার বেশি খুব কমই ঘুমিয়েছি। চুরাবইর হুজুর (শায়খুল আল্লামা সাঈদ আলী {১৯০৭-১৯৬৪} রাহিমাহুল্লাহ) মাঝে মধ্যে একান্তে ডেকে নিয়ে বলতেন, ঘুমের পরিমাণ বাড়াও, শরীর নষ্ট করে ফেলবে।

১৯৯১ সালের কথা। আলিম ক্লাশে পড়ি। খুব সম্ভব গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়িতে অবস্থান করছি। পাঁচ দিনের সফর শেষে সন্ধ্যার সময় আব্বা বাড়িতে ফিরেছেন। এশার নামাযের পর ঘরের সবাই একসাথে রাতের খাবার সেরে যে যার রুমে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আব্বা ডাকলেন। তড়িঘড়ি গেলাম। বললেন, একটি কিতাব খুঁজে বের করবো, তুমি হারিকেন ধরতে হবে। (তখন আমাদের উপজেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিলো না।) কিতাবের রুমে ঢুকে আলমিরা খুলে কিতাবটি খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ একটি কিতাব বের করে পড়তে শুরু করলেন। দুই হাতে হারিকেন উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একেতো গরম তার উপর মশার উৎপাত। আব্বা নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে চলেছেন। এক সময় বিভিন্ন মসজিদ থেকে ফজরের আযান ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো। যেনো সম্বিত ফিরে পেলেন। আফসুসের সুরে বললেন, তোমাকে ঘুমাতে দিলাম না। যাও নামায সেরে ঘুমিয়ে পড়।



স্মৃতি রোমন্থন

জকিগনজে কবি আল মাহমুদ

২০০১ সালের ৩ আগস্ট জকিগনজ লেখক পরিষদ আয়োজন করে লেখক সম্মেলন। জকিগনজের ইতিহাসে প্রথম লেখক সম্মেলনে প্রধান অথিতি ছিলেন প্রফেসর কবি আফজাল চৌধুরী। প্রধান বক্তা ইতিহাসবিদ খ্যাত মনির উদ্দিন চৌধুরী । বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি কালাম আজাদ, প্রফেসর সুনির্মল কুমার দেব মীন, সৈয়দ মস্তফা কামাল, আবদুল হামিদ মানিক, কবি কিশওয়ার বিন দিলওয়ার, কবি শারিক শামসুল কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন কবি মাজেদ আহমেদ চঞ্চল, দেওয়ান মাহমুদ রাজা চৌধুরী, কবি লায়েক আহমদ নুমান, ছড়াশিল্পী মতিউল ইসলাম মতিন, কবি আবদুল কাইউম, গল্পকার শাহেদ আহমদসহ সিলেটের একঝাঁক তরুণ সাহিত্য কর্মী। নতুন সাহিত্য সংগঠন জকিগনজ লেখক পরিষদ'র বর্ণাঢ্য সে আয়োজন ব্যাপক প্রশংসিত হয়। *স্বদেশ ভালোবেসে সন্ত্রাস রুখো* শ্লোগান খচিত ব্যানার নিয়ে ডাকবাংলো প্রাঙ্গন থেকে উপজেলা অডিটরিয়াম পর্যন্ত লেখক শুভাযাত্রা বোদ্ধা মহলের নজর কাঁড়ে।

৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত লেখক সম্মেলনের রেশ কাটার আগেই ৭ আগস্ট পাড়ি জমাই লন্ডন। স্মৃতিময় দিনগুলো পেছনে পড়ে থাকে। পরিকল্পনা করলাম যখনি দেশে ফিরবো আবারো জকিগনজে আয়োজন করবো লেখক সম্মেলন। টার্গেট করলাম বর্তমান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ হবেন সে সম্মেলনে প্রধান অথিতি। ঢাকায় যোগাযোগ শুরু করলাম। কবির সাথে পূর্ব পরিচিতি নেই, তদুপরি কথা বললাম টেলিফোনে। কবি আশ্বাস দিয়ে বললেন- সময়মত যোগাযোগ করবেন, দেখা যাবে।

প্রবাস জীবনের বর্ষপুর্তির আগেই ২০০২ সালের জুলাই মাসের মধ্যভাগে দেশে ফিরলাম সস্ত্রীক। তিন দিন পর জকিগনজ লেখক পরিষদ'র বৈঠক হলো। দ্বিতীয় লেখক সম্মেলন আয়োজন বিষয়ে ব্যাপক

আলোচনা হলো। সম্ভাব্য তারিখ ঠিক হলো ৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। সপ্তাহ দুয়েক পর ঢাকায় গেলাম। দেখা করলাম দৈনিক ইনকিলাবের তৎকালিন সিনিয়র সহসম্পাদক শ্রদ্ধেয় ইউসুফ শরীফ'র সাথে। ইনকিলাব অফিসে তাঁর রুমে দীর্ঘ আলোচনা হলো। ইউসুফ ভাইকে নিয়ে গেলাম কবি আল মাহমুদের বাসায়। সব শোনে কবি জকিগনজ আসতে সম্মত হলেন। বিশেষ অথিতি হিসেবে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন কবি আবিদ আজাদ, গল্পকার ব্রিগেডিয়ার (অব:) আবুবকর সিদ্দিকী ও ইউসুফ শরীফ। ঢাকা থেকে ফিরে জকিগনজ লেখক পরিষদের জরুরী বৈঠকে প্রধান অতিথি কবি আল মাহমুদ ও অন্য অতিথিদের সম্মতির বিষয় জানালাম। সবাই উৎফুল্ল । শুরু হলো কর্ম তৎপরতা। ছুটে গেলাম প্রফেসর কবি আফজাল চৌধুরীর বাসায়। স্যার খুবই খুশি হলেন। তবে অসুস্থতার কারণে জকিগনজ পর্যন্ত দীর্ঘপথ গাড়িতে বসা সম্ভব হবে না জানালেন। সম্মেলন স্মারকে প্রকাশের জন্য নতুন লেখা একটি কবিতা দিলেন। পর্যায়ক্রমে যোগাযোগ হলো কবি কালাম আজাদ, আবদুল হামিদ মানিক ও মাজেদ আহমেদ চঞ্চল'র সাথে। সবাই সানন্দে অংশগ্রহণে রাজি হলেন।

জকিগনজ লেখক পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম, কবি মহিউদ্দিন হায়দার, মাওলানা ফদ্বলুর রাহমান, ছড়াশিল্পী মাওলানা পিয়ার মাহমুদ, এজেএম শিহাব, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, সেলিম আহমদ, মাহবুবুর রহীম, আহমদ ছিদ্দিক চৌধুরী হাসান, শাহীদ আহমদ, নুমানুর রাহমান চৌধুরী, গুলজার আহমদ, ইয়াহইয়া চৌধুরী প্রমুখের কর্মতৎপরতা লেখক সম্মেল সফলের মূল চালিকাশক্তি ছিলো। এ পর্যায়ে তিনজন মানুষের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই। জকিগনজ লেখক পরিষদের সদস্য না হয়েও তাঁরা যে সর্বাত্মক নির্দেশনা এবং শ্রম দিয়েছেন তা না হলে লেখক সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হতো কি না সন্দেহ। তাঁরা মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, মরহুম মাহতাব আহমদ ও মাওলানা জইন উদ্দিন।

সম্মেলনের দিন ঘনিয়ে এলো। ব্যাপক প্রচারণার ফলে জকিগনজের শিক্ষিত মহলে সাড়া পড়ে গেলো। বিশেষ করে তরুণদের মাঝে ব্যাপক

উৎসাহ পরিলক্ষিত হলো। সম্মেলন স্মারকের জন্য সংগৃহিত লেখা নিয়ে মহিউদ্দিন হায়দার, পিয়ার মাহমুদ ও আমি আবারো ঢাকা গেলাম। স্মারকের ডিজাইন, প্রুফ রিডিং, পরিপাটি ছাপা ইত্যাদিতে দু'জন মানুষের মেধা এবং শ্রম স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁরা হলেন মাসিক পরওয়ানার তৎকালীন সহসম্পাদক মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার বন্ধু ওবাইদুল হক।

সে যাত্রা ঢাকার অতিথিগণের সাথে আবারো যোগাযোগ করে সব ফাইন্যাল করা হলো। সিদ্ধান্ত মত কবি আল মাহমুদের যাতায়াতের বিমান টিকেট পৌঁছে দিলাম। ইউসুফ ভাই দায়িত্ব নিলেন কবি আবিদ আজাদ ও গল্পকার আবুবকর সিদ্দিকীকে নিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর রাতের ট্রেনে সিলেটের পথে রওয়ানা দেবেন।

৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলের ফ্লাইটে কবি আল মাহমুদ সিলেট পৌঁছেন। এয়ারপোর্ট থেকে কবিকে নিয়ে আসা হলো সুবহানীঘাট হোটেল ইস্টার্ন গেইটে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে কবি গেলেন সুলতানে সিলেট হযরত শাহজালাল রাহিমাহুল্লাহ'র মাযার যিয়ারতে। রাতে কবিসহ আমাদের দাওয়াত ছিলো বিশিষ্ট ব্যবসায়ি সৈয়দ খলিলুর রহমান (খলন মিয়া)-এর বাসায়। যথা সময়ে আমরা কবিকে নিয়ে গেলাম। খাবার পর খলন মিয়ার উপশহরের বাসায় দীর্ঘ আড্ডা হলো। কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ঢাকার অন্য অথিতিদের ট্রেন স্টেশন থেকে রিসিভ, সকালে ঢাকা এবং সিলেটের অথিতিদের জকিগনজ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলাম। সকালে যথা সময়ে অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের কাজ শুরু হলো। শুরু থেকেই উপচে পড়া ভীড় আমাদেরকে আশান্বিত করলো।

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি মত দুপুরের খাওয়ার জন্য অতিথিদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। খাওয়ার পর কবি আল মাহমুদ আব্বার (শায়খুল হাদীস আলামা মো. হবিবুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ) সাথে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলেন।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে বিকেল পাঁচটায় এমন সিদ্ধান্ত ছিলো। কিন্তু অতিথি

এবং শ্রোতাদের আগ্রহ বিবেচনায় সময় বর্ধিত করতে হলো। কবি আল মাহমুদ মাগরিব নামাযের পর বক্তব্য শুরু করলেন। দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় চললো তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য।

অনুষ্ঠান শেষ হলে কবি আল মাহমুদসহ অন্য অথিতিদের নিয়ে আমরা গেলাম ফুলতলী ছাহেব বাড়ি। রাতে কবি আল মাহমুদ এবং ঢাকা থেকে আগত কবি আবিদ আজাদ, কথা সাহিত্যিক ইউসুফ শরীফ, গল্পকার ব্রিগেডিয়ার (অব:) আবু বকর সিদ্দিকী শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ'র মেহমান। ছাহেব বাড়িতে মেহমানগণের রাত যাপন, ছাহেব কিবলার একান্ত সান্নিধ্য লাভ এসবের নেপথ্য আয়োজক ছাহেব কিবলার প্রিয় দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরী (বর্তমানে লন্ডস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল)। চা পর্বের পর কবি কালাম আজাদ ছাড়া সিলেটের অথিতিরা চলে গেলেন।

ইতোমধ্যে শ্রদ্ধেয় হাসান ভাই এসে জানালেন, ছাহেব কিবলা মেহমানগণকে ভেতর বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন। শ্রদ্ধেয় কবি কালাম আজাদ এবং আমি মেহমানগণকে নিয়ে গেলাম। ছাহেব কিবলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। কবি আল মাহমুদ তড়িৎ এগিয়ে গিয়ে কদমবুছি করলেন। আমি বিস্মিত। ভাবতেই পারিনি কবি ছাহেব কিবলাকে কদমবুছি করবেন। একে তো বয়োবৃদ্ধ মানুষ, তাছাড়া এসব বিশেষ বিষয়ে অভ্যস্ত না থাকারই কথা। কিন্তু নিজ চোখে দেখলাম বাস্তবতা।

কার্পেট মোড়ানো মেঝেতে ছাহেব কিবলা প্রথমে বসলেন। আমরাও বসে পড়লাম। কবি আল মাহমুদ ছাহেব কিবলার ঠিক সম্মুখে পা গুটিয়ে এমনভাবে বসলেন যেনো একটা বাচ্চা শিশু মক্তবে উস্তাদের সামনে বসে আছে। প্রথমেই ছাহেব কিবলা একে একে সবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। কবি আল মাহমুদ তাঁর চোখের অসুখের জন্য দোয়া চাইলেন। চোখের অসুখ বিস্তারিত জেনে নিয়ে ছাহেব কিবলা পরম মমতায় কবির চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে সূরা কুরাইশ পড়বেন।

ছাহেব কিবলা খুবই আগ্রহ সহকারে কবি আল মাহমুদের সাথে দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলেন। সে আলাপচারিতা আমি ভিডিও ধারণ করলাম। কবি তন্ময় হয়ে ছাহেব কিবলার চেহারার দিকে চেয়ে থাকলেন। রাতের খাবার প্রস্তুত। ছাহেবজাদগণের মধ্যে তৃতীয় মাওলানা শিহাব উদ্দিন চৌধুরী ও কনিষ্ঠ মাওলানা হুছামুদ্দিন চৌধুরী অতিথিদের নিয়ে খাবার টেবিলে বসলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাহেব কিবলার নাতিগণ অথিতি আপ্যায়নে ব্যস্ত সময় কাটালেন। খাবার পর কবি আল মাহমুদ আমায় কাছে ডেকে বললেন, *হেলাল ! তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তুমি আমাকে রাইট জায়গায় নিয়ে এসেছো। অনেকে আমাকে বাব্দা বকরি মনে করে, আসলে আমি কারো বাব্দা বকরি না। কবির সেই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতবাহি কথা আজো কানে বাজে।*

একসময় কমিউনিজমে বিশ্বাসী কবি কালক্রমে ইসলামের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করায় কত অপবাদ সইতে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হয়েও রাজাকার তকমা পেতে হয়েছে।

পরদিন সকাল এগারোটার দিকে অথিতিদের নিয়ে সিলেটের পথে ফুলতলী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কবি আল মাহমুদকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম আমরা। উৎসব মুখর একটি দিন জকিগনজের সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে স্মৃতি হয়ে রইলো।

কবি আল মাহমুদ ঢাকায় ফিরে ছাহেব কিবলার একান্ত সান্নিধ্যে কাটানো সে সময় নিয়ে একটি কবিতা লেখেন। পরবর্তীতে তাঁর বাসায় গেলে কবি নিজে আবৃত্তি করে শোনালেন সে কবিতা।

ছাহেব কিবলার ইন্তিকালের পর কবি তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন, সেটি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। *ফুলতলী হুজুর* শিরোনামের সে কবিতাটি পরবর্তীতে কোন কোন সংকলনেও স্থান পেয়েছে। কবিতাটি হলো-

ফুলতলী হুজুর আমার অন্ধ চোখের উপর হাত রেখে
বলেছিলেন, সূরা কুরাইশ পড়
আমি ধীরে ধীরে পাঠ শুরু করলাম
তিনি বললেন, এখন আকাশের দিকে তাকাও
আমি আকশের দিকে চেয়ে দেখি

বিশাল নীলিমা অন্তহীনতায় সাজানো

এই স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলতে পারি না
ফুলতলী হুজুরের চেহারাটা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে
এমন মানুষ আর হয় না কেনো ?
যে সব মানুষের কাছে গেলে
হৃদয়ের ধুকপুকানি শান্ত হয়
তিনি নেই আমার সালাম পড়ে আছে পথে প্রান্তরে
তিনি নেই আমাদের শ্রদ্ধা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শূন্য বিছানার উপর
ফুল হয়ে ঝরে যাক।

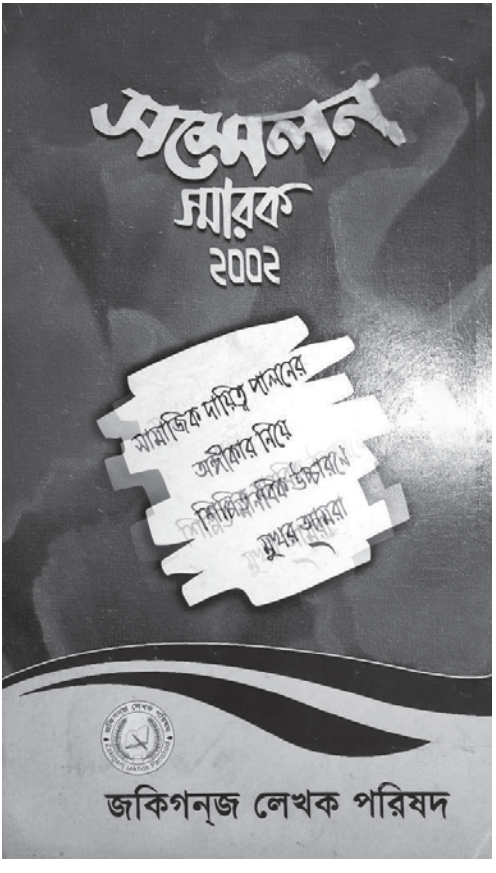
(লেখাটি স্মৃতি নির্ভর। তাই কারো নাম বা সম্মেলনে তাঁর ভূমিকার কথা বাদ পড়তে পারে। সে জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ।)

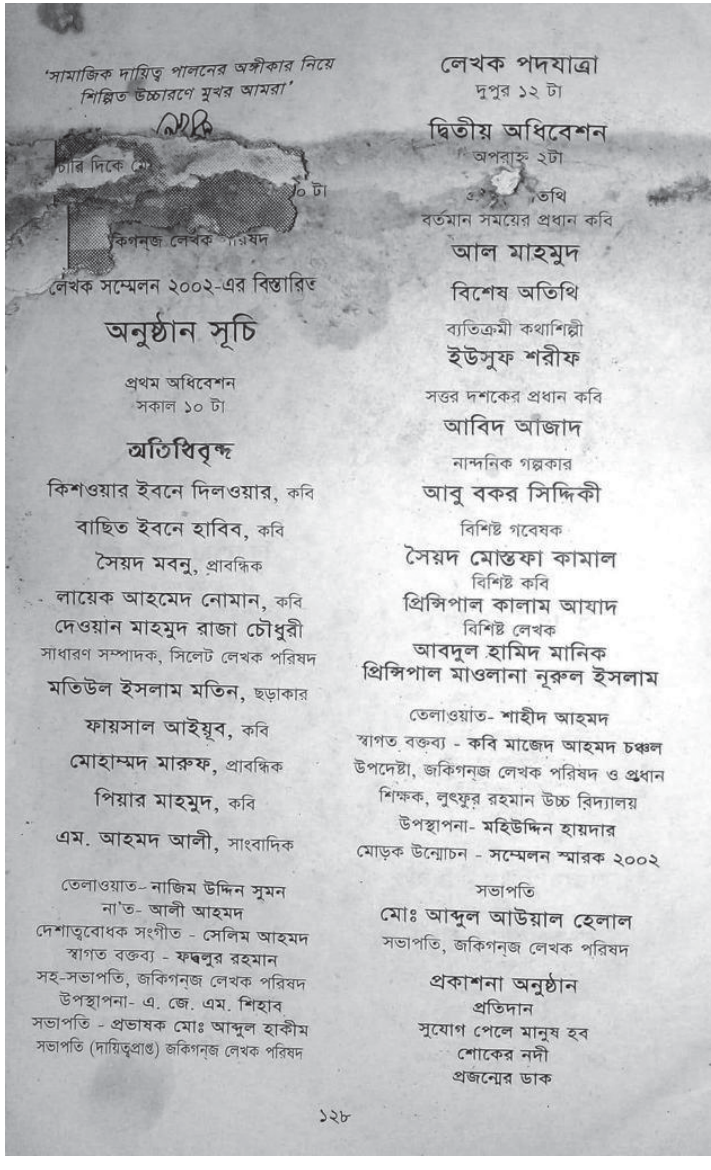
১১ জুলাই ২০১৮

পুনশ্চঃ সেবারই কবি আল মাহমুদ'র জীবন নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি রেকর্ড করেছিলাম। সে ডকুমেন্টারি আলোর মুখ দেখেনি। সেই বৃত্তান্ত পরবর্তী কোন এক সময় বলা হবে।




লেখক
সম্মেলন
জকিগনজ
লেখক
পরিষদ


সম্মেলন
স্মারক
২০০২
সামাজিক দায়িত্ব পালনের
অঙ্গীকার নিয়ে
শিক্ষিত বিবেক উচ্চারণে
মুখরে আমরা
জকিগনজ লেখক পরিষদ



'সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নিয়ে
শিল্পিত উচ্চারণে মুখর আমরা'

চার দিকে ...

...০ টা

কিশোরগঞ্জ লেখক পরিষদ

লেখক সম্মেলন ২০০২-এর বিস্তারিত

অনুষ্ঠান সূচি

প্রথম অধিবেশন
সকাল ১০ টা

অতিথিবৃন্দ

কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, কবি

বাছিত ইবনে হাবিব, কবি

সৈয়দ মবনু, প্রাবন্ধিক

লায়েক আহমেদ নোমান, কবি

দেওয়ান মাহমুদ রাজা চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, সিলেট লেখক পরিষদ

মতিউল ইসলাম মতিন, ছড়াকার

ফায়সাল আইয়ুব, কবি

মোহাম্মদ মারুফ, প্রাবন্ধিক

পিয়ার মাহমুদ, কবি

এম. আহমদ আলী, সাংবাদিক

তেলাওয়াত- নাজিম উদ্দিন সুমন
না'ত- আলী আহমদ
দেশাত্ববোধক সংগীত - সেলিম আহমদ
স্বাগত বক্তব্য - ফজলুর রহমান
সহ-সভাপতি, জকিগন্জ লেখক পরিষদ
উপস্থাপনা- এ. জে. এম. শিহাব
সভাপতি - প্রভাষক মোঃ আব্দুল হাকীম
সভাপতি (দায়িত্বপ্রাপ্ত) জকিগন্জ লেখক পরিষদ

লেখক পদযাত্রা
দুপুর ১২ টা

দ্বিতীয় অধিবেশন
অপরাহ্ন ২টা

...তিথি
বর্তমান সময়ের প্রধান কবি

আল মাহমুদ

বিশেষ অতিথি

ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী
ইউসুফ শরীফ

সত্তর দশকের প্রধান কবি
আবিদ আজাদ

নান্দনিক গল্পকার
আবু বকর সিদ্দিকী

বিশিষ্ট গবেষক
সৈয়দ মোস্তফা কামাল

বিশিষ্ট কবি
প্রিন্সিপাল কালাম আযাদ

বিশিষ্ট লেখক
আবদুল হামিদ মানিক
প্রিন্সিপাল মাওলানা নূরুল ইসলাম

তেলাওয়াত- শাহীদ আহমদ
স্বাগত বক্তব্য - কবি মাজেদ আহমদ চঞ্চল
উপদেষ্টা, জকিগন্জ লেখক পরিষদ ও প্রধান
শিক্ষক, লুৎফুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়
উপস্থাপনা- মহিউদ্দিন হায়দার
মোড়ক উন্মোচন - সম্মেলন স্মারক ২০০২

সভাপতি
মোঃ আব্দুল আউয়াল হেলাল
সভাপতি, জকিগন্জ লেখক পরিষদ

প্রকাশনা অনুষ্ঠান
প্রতিদান
সুযোগ পেলে মানুষ হব
শোকের নদী
প্রজন্মের ডাক

১২৮

জকিগনজ মনীষা প্রকাশ অভিজ্ঞতা ও কৈফিয়ত

জকিগনজ লেখক পরিষদ'র জন্ম ২০০১ সালের জুলাই মাসে। জকিগনজের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো লেখক সম্মেলনের আয়োজন করে সাহিত্যপ্রেমিদের দৃষ্টিতে আসে লেখক পরিষদ। আগস্টের তিন তারিখে অনুষ্ঠিত লেখক সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা সাহিত্যর শক্তিমান কবি মরহুম অধ্যাপক আফজাল চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন ইতিহাসবিদ মরহুম মনির চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি কালাম আজাদ, গবেষক মরহুম সৈয়দ মোস্তফা কামাল, মরহুম কবি শারিক সামসুল কিবরিয়া, মরহুম কবি কিশওয়ার বিন দিলওয়ার, গবেষক আবদুল হামিদ মানিক প্রমূখ।

২০০২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় লেখক সম্মেলন। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম কবি আল মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মরহুম কবি আবিদ আজাদ, কথা সাহিত্যিক ইউসুফ শরীফ, গল্পকার (অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার) আবু বকর সিদ্দিকী, কবি কালাম আজাদ, গবেষক আবদুল হামিদ মানিক প্রমূখ। উৎসবমুখর সে দিনটি জকিগনজের সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে জকিগনজ লেখক পরিষদ সিলেট শহরে ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সে অনুষ্ঠানে এ যাবতকালে জকিগনজের লেখকেদের বিভিন্ন ভাষায় লেখা প্রকাশিত বইয়ের প্রদর্শনী করা হয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ১৩৩ জন লেখকের প্রকাশিত বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধিকাংশ লেখকের বই প্রদর্শিত হয়। ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর শহরের হোটেল হলি সাইড'র কনফারেন্স হলে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রতি দিন সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বই প্রদর্শনী এবং সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আলোচনা সভা চলে। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্য রাখেন মাসিক পরওয়ানা সম্পাদক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা

মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী। শেষ দিন সমাপনী বক্তব্য রাখেন বহুগ্রন্থ প্রণেতা শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ। অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মুহিবুর রহমান, প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান, মরহুম কবি আবদুল গফফার দত্ত চৌধুরী পুত্র আলী মস্তফা চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব), জেলা শিক্ষা অফিসার (অব:) মরহুম আবদুর রহীম জকি, প্রফেসর ড. কামাল আহমদ চৌধুরী, কবি কালাম আজাদ, গুরুসদয় দত্ত গবেষক ব্রতচারী নরেশ ব্যানার্জি (কলকাতা),বহুগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী, গবেষক আবদুল হামিদ মানিক, অধ্যক্ষ মাওলানা হোসাইন আহমদ ভুঁইয়া, অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আলীম, অধ্যক্ষ কবি মাজেদ আহমদ চঞ্চল প্রমূখ।

প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান চলে। শেষ দিন একই সাথে জকিগনজের আটজন লেখকের বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা হয়। বিশেষ আকর্ষণ ছিলো সূফি কবি শাহ শিতালং রচিত তিন শতাধিক গান সিলেটি নাগরী হরফে হাতে লেখা দু'টি খাতা প্রদর্শন।

অভিজ্ঞতা

তিনদিন ব্যাপী বই প্রদর্শনী উপলক্ষে জকিগনজের লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁদের প্রকাশিত বইয়ের তথ্য সম্বলিত স্মারক গ্রন্থ *জকিগনজ মনীষা* প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো বছরের শুরুতেই। সে মতে জীবিত লেখকগণের সাথে যোগাযোগ শুরু হয়। বিভিন্ন সূত্রে তথ্য সংগ্রহ চলে। বেশিরভাগ লেখকের মোবাইল নাম্বার জোগাড় করে সরাসরি তাঁদের সাথে কথা বলি। এ পর্যায়ে নাম প্রকাশ না করেই সুলতানপুর ইউনিয়নের দুইজন লেখকের সাথে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। একজনের তিনটি বই বহু বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি চাকুরীর সুবাধে এলাকার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে বর্তমান প্রজন্মের জকিগনজের কোন লেখক তাঁকে চেনে না। অনুসন্ধিৎসু কোন কোন লেখক সাহিত্যিক তাঁর নামের সাথে পরিচিত আছেন। লেখক পরিষদের সহসভাপতি মাওলানা ফদ্বলুর রহমান'র মাধ্যমে সেই লেখকের গ্রামের বাড়িতে যোগাযোগ করে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের কাছ

থেকে মোবাইল নাম্বার জোগাড় করলাম। প্রথম দিন ফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্য জানালাম। কথার ধরণে তাঁকে তেমন একটা আগ্রহী মনে হলো না। অন্যদিন ফোন দিতে বলে রেখে দিলেন। তাঁর কথামত কয়েক দফা ফোন দেয়ার পর জানালেন, তিনি বইয়ের কপি সংগ্রহ করে রাখবেন; আমি যেনো তাঁর কর্মস্থলে কাউকে পাঠিয়ে সংগ্রহ করি। তারিখ মত লোক পাঠালাম, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেলো না। ফোনের পর ফোন দিয়েও তিনি নিরুত্তর থাকলেন। সে কারণেই জকিগনজ মনীষায় মহান সেই লেখকের পরিচিতি এবং তাঁর প্রকাশিত কোন বইয়ের তথ্য সংযুক্ত করা যায় নি।

অপরজন বয়সে তরুণ। অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা প্রণীত সিলেট বিভাগের লেখকদের পরিচিতি মূলক গ্রন্থে তাঁর তথ্য পাই। সুলতানপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আসদ্দর আলী ছই মিয়া'র পুত্র বন্ধু তাজুলের মাধ্যমে মোবাইল নাম্বার জোগাড় করে ফোন দিলাম। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও তিনি আমাকে চিনেন বলে জানালেন। এমনকি তাঁর চেনার স্বপক্ষে কিছু স্মৃতিচারণও করলেন। নন্দলাল শর্মা'র গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যানুযায়ি তাঁর প্রকাশিত বইয়ের একটি কপি এবং ব্যক্তিগত তথ্য তাজুল ভাইয়ের কাছে পৌঁছাতে অনুরোধ করলাম। তিনি সম্মতি জানালেন। অনেক দিন পর তাঁর বই কিংবা তথ্য না পেয়ে আবার ফোন দিলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, ভাই! আমি লেখক নই, আমার কোন বই প্রকাশিত হয়নি। বহুদিন পূর্বে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে কৌতুহল বশত: নন্দলাল শর্মা সাহেবের বরাবরে পোস্ট করে তথ্য পাঠিয়েছিলাম। সেখানে ব্যক্তিগত তথ্যাদি সঠিক হলেও প্রকাশিত উপন্যাস হিসেবে উল্লিখিত বইয়ের নাম ছিলো নিছক মনগড়া। শর্মা সাহেবের গ্রন্থে আমার দেয়া তথ্য যে হুবহু ছাপা হয়েছে তাও জানতাম না। আপনার কাছ থেকে জানার পর নিজেকে একজন প্রতারক মনে হয়েছে। কাজটি মোটেই উচিত হয়নি। আমাকে ক্ষমা করবেন। একনাগাড়ে বলে চলা ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে কিছু বলতেও পারিনি সেদিন। ফোন কেটে দিয়েছিলাম।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাদি লন্ডনে কম্পোজ করিয়ে ইউএসবিতে করে দেশে নিয়ে যাই। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দেশে গিয়ে দেখা গেলো পুরো লেখাই অকেজো। সৌভাগ্য বশত: পুরো লেখার একটি প্রিন্ট কপি সাথে ছিলো। হাতে সময় মোট তিন দিন। শুরু হলো কম্পোজ। রাতভর একদিকে কম্পোজ, অপরদিকে প্রুফ দেখা চললো। ২০৮ পৃষ্ঠার *জকিগনজ মনীষা* দাঁড় হলো দুই রাতে। সেই সময়েই নতুন কিছু লেখকের তথ্য কয়েকজনের মাধ্যমে এলো। কিন্তু তথ্যগুলোর সত্যাসত্য অনুসন্ধানের সময় এবং সুযোগ কোনটিই তখন আমাদের ছিলো না।

সেই দু'টি স্মরণীয় রাতে কাজে সহযোগিতা এবং সঙ্গ দিয়ে যারা প্রাণবন্ত রেখেছিলেন সবার প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে অধ্যক্ষ কবি মাজেদ আহমদ চঞ্চল, অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম, মাওলানা মনজুরে মাওলা, মরহুম কাজী বজলুর রশীদ ভাই, মাওলানা কবি পিয়ার মাহমুদ, সংবাদকর্মী রহমত আলী হেলালী, লেখক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এজেএম শিহাব, যুগ্ম সম্পাদক শাবি'র সহযোগি অধ্যাপক ইকবাল আহমদ চৌধুরী (বর্তমানে কানাডার হেলিফেক্সে পিএইচডি গবেষণারত), সহসম্পাদক সেলিম আহমদ, সদস্য এডভোকেট নুমানুর রাহমান চৌধুরী, মাওলানা আবদুস সবুর (বর্তমানে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান) প্রমুখের কথা প্রতি নিয়তই মনে পড়ে।

লেখক পরিষদের তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে কলকাতা থেকে আগত ব্রতচারী নরেশ ব্যানার্জি'র প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। জকিগনজের আলোকিত সন্তান গুরুসদয় দত্ত'র কয়েকটি বইয়ের খুবই পুরাতন কপি তিনি কলকাতা থেকে নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

কৈফিয়ত

জকিগনজ মনীষা স্মারক গ্রন্থটি যাদের সংগ্রহে আছে তাঁরা দেখবেন সেখানে মোট ১৩৭ জন লেখকের পরিচিতি এবং তাঁদের প্রকাশিত বইয়ের তথ্যাদি স্থান পেয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, ১৩৭ জনের মধ্যে বারহাল ইউনিয়ের দুইজন, খলাছড়া ইউনিয়নের একজন এবং মানিকপুর ইউনিয়ের একজন'র ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে একজন দীর্ঘ দিন নিয়মিত লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কোন

বই প্রকাশিত হয়নি। তবে যতদূর জানা যায় একটি পাণ্ডুলিপি লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে। অন্য তিনজন আদতেই লেখক নয়। সুতরাং বই প্রকাশের কথা অবান্তর। শেষ দুই দিন যাদের তথ্য আমাদের হাতে এসেছে সীমাহীন তাড়াহুড়োর ফাঁকে তা পরখ করে দেখার সুযোগ ছিলো না মোটেই। তবে সে চারজনের তথ্য যারা দিয়েছেন তন্মধ্যে তিনজনের সদাসয় চেহারা আমার স্মৃতিতে দীপ্যমান আছে। একজনের কথা মনে নেই। সঙ্গত কারণেই সেই কথিত লেখক এবং তাদের শুভাকাঙ্খি তথ্যদাতাগণের নাম ধাম প্রকাশ থেকে বিরত থাকলাম। খ্যাতির লোভে মানুষ কতখানি নীচ হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে জকিগনজ মনীষার পাতায় তারা থাকবেন।

পুনশ্চ: দেশের প্রান্তিক জনপদ জকিগনজ মনন চর্চার এক উর্বর ভূমি। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে জকিগনজের ১৩৩ জন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বেশিরভাগ মাতৃভাষা বাংলায় হলেও রয়েছে আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

২০১২ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমার জানা মতে আরো ১১ জন নতুন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের লেখকদের কারো কারো এক বা একাধিক নতুন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কোন এক উপজেলার এত বিপুল সংখ্যক মানুষের লেখা গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাস আমার জানা নেই।

২৭ জানুয়ারি ২০১৯
লন্ডন




জকিগন্‌জ মনীষা
জকিগন্‌জ লেখক পরিষদ

প্রসঙ্গ জকিগনজ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য
গ্রন্থখানি পুণঃপ্রকাশ হোক

প্রসঙ্গ জকিগনজ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য বইটি প্রনয়ণের কাজ শুরু হলে ইউএনও হান্নান সাহেব প্রায়ই টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, বৃটেনে জকিগনজবাসি শিরোনামে একটি লেখা পাঠাতে। বৃটেনে জকিগনজবাসির আগমন, অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী লেখা প্রস্তুত করে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু লেখাটি বইয়ে স্থান পায়নি। সম্পাদক হান্নান সাহেব পরবর্তীতে বহুবার কৈফিয়ত দিয়েছেন। যদিও আমি কৈফিয়ত চাইনি। বইটি ছাপার কাজ মাত্র শেষ হয়েছে, তখনো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়নি। সে সময় কিছু দিনের জন্য দেশে গিয়েছি। হান্নান সাহেব মরহুম মাহতাব আহমদ'র মাধ্যমে উপজেলা কমপ্লেক্সে তাঁর বাসায় চা'র দাওয়াত দিলেন। এক সন্ধ্যায় মাহতাব মিয়াকে নিয়ে গেলাম। চা পর্ব শেষে তিনি বইয়ের একটি কপি দিলেন। বললেন,আপনাকে প্রথম কপিটি দিলাম। এখনো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়নি। আমার লেখাটি কেনো বইয়ে স্থান পায়নি, প্রকাশ না করার শর্তে বিস্তারিত বললেন। ভদ্রলোকের সেদিনের কথাগুলো অফ দ্য রেকর্ডই থাক। কথাগুলোর একমাত্র সাক্ষী মাহতাব আহমদও আজ কবরবাসি।

লেখাটি বইয়ে অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় তখনো কষ্ট পাইনি, এখনো না। কিন্তু একটি আফসোস থেকেই যাবে, সে লেখার কোন কপি আমি রাখিনি। যতদূর মনে পড়ে, নয় পৃষ্ঠার সে লেখাটি অন্য কারো না হলেও আমার কাজে লাগতো।

তথ্য, তত্ত্ব ও ছাপাজনিত বহু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও জকিগনজের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার একমাত্র অবলম্বন এ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রনয়ণ ও প্রকাশ তৎকালিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হান্নান মিয়া'র সাহসী ও প্রসংশনীয় উদ্দোগ।

যাবতীয় ত্রুটি সংশোধনপূর্বক মূল্যবান এ গ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যথাযথ কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

আফসোস, তিনিও কবি হতে চান

জকিগনজ লেখক পরিষদ'র সাধারণ সম্পাদক ছড়াশিল্পী এজেএম শিহাব গতরাতে ম্যাসেনজারে একটি ছড়া দিয়ে জানতে চাইলো এটি ফেইসবুকে পোস্ট করবে কি না। একটি বানান ঠিক করে দিয়ে তাকে পোস্ট করতে বললাম। সে তার আইডিতে পোস্ট করলো। কিছু সময়ের মধ্যে দেখা গেলো *ভালোবাসা কাৎরায়* শিরোনামের ছড়াটি অন্য একজন নিজ আইডিতে পোস্ট করেছেন। তবে তিনি কষ্ট করে এজেএম শিহাব নাম বাদ দিয়ে নিজের নাম জুড়ে দিয়েছেন। এই কাণ্ড দেখে আমি কিন্তু মোটেও অবাক হই নি। কারণ আমার ঝুলিতে এ জাতীয় মজার কিছু অভিজ্ঞতা জমা আছে। মাত্র দু'টি উল্লেখ করতে চাই। বহু বছরের পুরাতন কথা হলেও ঘটনা দু'টির নায়কদের নাম ধাম স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ না করেই কেবল ঘটনা বর্ণনা করছি।

প্রথম ঘটনা : তখন আমি ইছামতি আলিয়া মাদরাসার আলিম জামাতের ছাত্র। সাহিত্যানুরাগি বন্ধুরা *মিলন্তিক সাহিত্য সংস্থা* নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলাম। বাল্য বন্ধু ও সহপাঠি আবদুল জলিল (বর্তমানে মুকিমপুর মাদরাসায় কর্মরত) সাধারণ সম্পাদক আর আমি সভাপতি। সংস্থার মূখপত্র হিশেবে আমরা *ষান্মাসিক বাঁশরী* প্রকাশ করতাম। কালিগনজ বাজারে রেজান আলী মার্কেটের তৃতীয় তলায় ভাড়া করা সংস্থার অফিসে প্রতিদিনই জমজমাট আড্ডা হতো। একদিন বসে আছি একাকী, তখনো অন্যেরা আসেনি। এক ভদ্রলোক এলেন। পকেট থেকে একটি খাম বের করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, একটি কবিতা লিখে নিয়ে এসেছি। আগ্রহভরে খাম খুলে পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে বললাম, এ কবিতা আপনার লেখা? তিনি বললেন, জ্বি নিজ হাতে লিখে নিয়ে এলাম। বললাম, কবিতাটি তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। বললেন, কবিতা রবীন্দ্রনাথের ঠিকই, কিন্তু আমি বই থেকে নিজ হাতে লিখেছি। তাই আমার নামেই ছাপতে হবে। বললাম, এটা তো সম্ভব না, বিশ্ব কবির কবিতা আপনার নামে ছাপানো যাবে না। তিনি নাছোড় বান্দা, কবিতাটি তার নামেই ছাপতে হবে। ভদ্রলোকের অভিনব আবদার আমাকে বিস্মিত করলো। এমন অভিজ্ঞতা আর কারো আছে কি না জানি

না। ভদ্রলোকের কবি হওয়ার স্বপ্ন পুরণ হয়েছিলো কি না সে খবরও রাখতে পারিনি।

দ্বিতীয় ঘটনা : একবার আমার একটি নোটবুক হারিয়ে গেলো। তখন প্রতিদিনই একটি দু'টি ছড়া লেখতাম। পুরো নোটবুকই ছড়া লেখা। অনেক খুঁজেও পাওয়া গেলো না। স্মৃতি থেকে যেটুকু পারলাম অন্যত্র কপি করে নিলাম। বেশিরভাগই চিরতরে হারিয়ে গেলো। বছর দুয়েক পর আমরা একটি ম্যাগাজিনের জন্য লেখা আহ্বান করলাম। কয়েকদিন পর এক ভদ্রলোক একটি ছড়া দিয়ে গেলেন। দেখলাম আমার হারিয়ে যাওয়া নোটবুকের একটি ছড়া। অবাক হলেও ভদ্রলোকের কবি হওয়ার চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে তার নামেই ছাপিয়ে দিলাম ছড়াটি। সেই ভদ্রলোকের মায়াবী চেহারাখানি জ্বলজ্বল করে স্মৃতিতে ভাসছে। জানি না তিনি কবি হতে পেরেছিলেন কি না।

৫ অক্টোবর ২০১৮



স্মৃতির পাতায় মিলন্তিক সাহিত্য সংস্থা।

ও বজলু ভাই! না বলেই চলে গেলে তুমি

বজলু ভাই! গত সোমবারেও তো দীর্ঘ কথা হলো, কই কিছুই বলোনি। তুমি যে চলে যাবে, চিরতরে চলে যাবে না ফেরার দেশে; একটু ইঙ্গিতই দিলে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সব কথাই তো বলতে। সব বিষয়েই তো পরামর্শ করতে। জীবনের খুটিনাটি সবই তো বলতে, কিছুই বাদ দিতে না। অথচ এ বিষয়ে কিছুই যে বললে না, আকার ইঙ্গিতেও না। তুমি না সব সময় বলতে আমার সাথে পরামর্শ না করলে তোমার কোন কাজ পূর্ণতা পায় না। সীমিত জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে অনন্ত জীবনে পাড়ি দিলে আজ, কিছু না বলেই, কোন পরামর্শ না করেই।

বজলু ভাই! হাজারো স্মৃতি ভাসছে মনের পর্দায়। ছাত্র জীবনে বিয়ানীবাজার তালামীযের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা। বর্তমান প্রজন্ম তো জানার কথা না, আমরা যারা সে সময় তোমার সহকর্মী-সহযোদ্ধা ছিলাম, ক'জনই আর মনে রেখেছি তোমার দুর্দান্ত সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অসীম ত্যাগের কথা। আমরা যে বড় একচোখা বজলু ভাই, তুমি তো সবই জানতে; তুমি তো প্রায়ই বলতে, ভাইরে! ছাহেব কিবলার চেহারাখানা চোখে ভাসলে দুঃখ,অবমূল্যায়ন সবই ভুলে যাই। কারো প্রতি কোন অভিযোগ অনুযোগ মনেই থাকেনা। হ্যাঁ বজলু ভাই, সেই একটিমাত্র নূরানী চেহারার অপার্থিব আকর্ষণই তোমার আমার ইহ পরকালীন একমাত্র সম্পদ। আল্লাহর মকবুল অলির মুহাব্বাত বৃথা যাবে না, বিশ্বাস করো বজলু ভাই। কাল বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টায় তোমার নিথর দেহখানি যখন কবরে রেখে আসা হবে তখনই তুমি প্রমাণ পেয়ে যাবে।

বজলু ভাই! তুমি সব সময় বলতে, আটগ্রাম এলাকার প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন। তোমার কথা শুনে মনে মনে ভাবতাম, হায়! প্রতিটি এলাকায় যদি দরদী মনের একেকজন কাজী বজলুর রশীদ থাকতো?

আমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সর্বস্থায় ভরসার একটা জায়গা ছিলো কাজী বজলুর রশীদ।

আল্লাহ! তোমার অপার রাহমাতের হাওয়ালা করে দিলাম।

(১৩ জুলাই ২০১৮ শুক্রবার নিজ মহল্লাহর মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করে বাড়িতে ফিরে কিছু সময়ের মধ্যে ইন্তিকাল করেন কাজী বজলুর রশীদ। তাঁর ইন্তিকাল সংবাদ শুনে তাৎক্ষণিক লেখা)



(বাম থেকে) মরহুম কাজী বজলুর রশীদ, লেখক, ছড়াশিল্পী এজেএম শিহাব, ব্রতচারী নরেস ব্যানার্জী (কলকাতা), অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম ও অধ্যক্ষ কবি মাজেদ আহমদ চঞ্চল।

ছুঁয়ে গেলো মনটা আমার

আজ শুক্রবার, ২৯ জুন ২০১৮। শারীরিক কিছু সমস্যায় গত রাত রয়েল লন্ডন হসপিটালে ছিলাম। সঙ্গত কারণেই মাদরাসায় গেলাম বিলম্বে। ক্লাস নিতে পারিনি। জুমুআর নামায সেরে অফিসে বসে কিছু জরুরি কাজ শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছি; গেটে আটকে দিলো কামিল ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র।

-আমাদের একটু সময় দিতে হবে।

-খুব বেশি জরুরি, জিজ্ঞেস করলাম।

-মাত্র কয়েক মিনিট, বলেই ওরা চলে গেলো।

দাঁড়িয়ে রইলাম গেটের পাশেই। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফিরে এলো সদলবলে। একজনের হাতে দু'টি প্যাকেট। আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো-আজ আমাদের শেষ ক্লাস ছিলো, আগামী সপ্তাহ থেকে ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরু হবে। প্যাকেট দু'টি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলাম। ওদের মধ্যে একজন (নাম: আরিফ আহমাদ) বলতে শুরু করলো-

সব হুজুরকে আজ আমাদের পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র গিফট দিয়েছি, আপনারটা বাকি ছিলো। অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এই মুহূর্তে কী বলবো, কী বলা যায় ছেলেগুলোকে? আরিফ বলে চললো-সেই ছোট কাল থেকে এতোটি বছর আপনাদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। কতশত ভুল বেয়াদবি করেছি। ক্ষমা করে দেবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আরিফসহ কয়েকজনের চোখের কোণায় চিক চিক করছে অশ্রুবিন্দু। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো হৃদয় মাঝে। অনুভব করলাম বাঁধ ভাঙা জোয়ার আসন্ন। ক্ষণিকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। মনে রেখো, কেবল বৃটেন নয় গোটা ইউরোপ ব্যাপী একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের দাঈ হিসেবে কাজ করতে হবে। নিজেদের সেভাবে প্রস্তুত করে তুলো। আজ কামিল জামাতে শেষ ক্লাস

ছিলো, মনে করোনা দ্বীনী শিক্ষা সমাপ্ত করে ফেলেছো। মাত্র শুরু হলো। এদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন কলেজে ভর্তির আবেদন করেছে। কে কোন বিষয় নিয়ে পড়তে চাচ্ছে, ভবিষ্যতে কার কী পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কথা বলে প্রত্যেকের সাথে মুসাফাহা করে ফী আমানিল্লাহ বলে বেরিয়ে এলাম।

আরিফ একাকী তার সাম্প্রতিক করা একটি কাজ নিয়ে কিছু কথা বলে নিলো। সে গত কয়েক মাস ধরে আমার *ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইলমে হাদীস* শীর্ষক বইটি ইংলিশ অনুবাদ করছে। মূল গ্রন্থ অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে। তথ্যসূত্রে উল্লিখিত কিতাবাদির তালিকা অনুবাদ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা চাইলে বলে দিলাম।

প্রসঙ্গত: মুশিদে বরহক, মুজাদ্দিদে যামান, শামসুল উলামা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত দারুল হাদীস লাতিফিয়ায় চলমান শিক্ষা বর্ষে (২০১৭-২০১৮) বারোজন ছাত্র কামিল জামাতে অধ্যয়ণ সম্পন্ন করলো। এদের মধ্যে আরিফ আহমাদ ও সিদ্দিক খান পার্ট টাইম ক্লাস করে কুরআনুল কারীম হিফয সমাপ্ত করেছে। গত দুই রামাদান আমরা মাদরাসা মসজিদে আরিফের পেছনে তারাবীহ নামায আদায় করেছি। ইতোমধ্যে তাদের প্রত্যেকেই দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট'র অধীনে ছাদিছ উত্তীর্ণ হয়ে কোয়ালিফাইড কারী হিসেবে সামারকালীন ছুটির সময়ে এদেশে চলা দারুল কিরাতের বিভিন্ন সেন্টারে শিক্ষকতা করছে।

দোয়া করি আল্লাহপাক যেনো এই ছেলেদের ইউরোপের বুকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত'র অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কবুল করেন।

পুনশ্চ: তাদের দেয়া গিফট বক্সে ছিলো একটি চাদর ও একটি আতর।

দেশ থেকে ফিরে

১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ আব্বার সাথে দেশের পথে রওয়ানা দিই। স্থানীয় সময় বিকেল ৬:১৫টায় বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট হিথ্রো বিমান বন্দর থেকে ছেড়ে যায়। ১৪ তারিখ সকাল ৯:৪৫ টায় সিলেট পৌঁছার কথা ছিলো, কিন্তু বিশেষ কারণে সকাল ৯:১৫ টায় ঢাকায় অবতরণ করে। প্রায় চার ঘণ্টা পর সিলেটের পথে ফ্লাইট ছেড়ে যায়। আব্বাকে বাড়ির পথে বিদায় দিয়ে জরুরি প্রয়োজনে সিলেট থামি। সন্ধ্যায় বাড়ির পথে রওয়ানা দিই। গাড়িতেই প্রচণ্ড জ্বর আসে। বাড়ি পৌঁছার আগেই ডাক্তারের দারস্থ হলাম।১০৩ ডিগ্রি জ্বর। ঔষধ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। পূর্ব নির্ধারিত পরদিনের প্রোগ্রাম নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি। আল্লাহর দয়া, রাতেই জ্বর ছাড়লো।

১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমুআ আদায়ের কথা বড়লেখার শাহবাজপুর বাজার মসজিদে। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে বিলম্বিত যাত্রায় তা সম্ভব হলো না। পথেই একটি মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করতে হলো। শাহবাজপুর বাজারে পৌঁছার পর সফরসঙ্গী মাওলানা আবদুল হামিদ লাল ভাই ছোট সাইজের কমলালেবু কিনে খাওয়ালেন। এটি নাকি চাইনিজ কমলা। সদ্য জ্বরে ভোগা শরীরে খুবই উপাদেয় মনে হলো। ১৫ তারিখ বড়লেখা সফরের মূল আয়োজক এলাকার মানুষের কাছে *নাজিম স্যার* খ্যাত প্রিয় নাজিম উদ্দিন এবার যোগ দিলো। চলে গেলাম করমপুরী ছাহেবের যিয়ারতে। মহান বুযূর্গ হাফিয মাওলানা আবদুর রউফ করমপুরী রাহিমাহুল্লাহ হলেন মুরশিদে বরহক হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহর ইলমে কিরাতের তিন উস্তাদের একজন। দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিলো তাঁর যিয়ারত করবো। আলহামদুলিল্লাহ! স্বপ্ন পূরণ হলো। এখান থেকে সরাসরি চলে যাবার কথা গাজিটেকা। কিন্তু করিৎকর্মা নাজিমের কল্যাণে করমপুরী ছাহেবের বাড়িতে যেতে হলো। করমপুরী ছাহেবের দু'জন নাতি এবং এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো। করমপুরী ছাহেবের মাযার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার উন্নয়ন বিষয়ে কিছু জরুরি কথা হলো। তারপর মাদরাসায় সমবেত ছাত্র শিক্ষক ও এলাকাবসীর উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে হলো।





এবার আমরা চলে গেলাম বড়লেখা পৌর এলাকার গাজিটেকা গ্রামে। আমাদের সাথে যোগ দিলো আরেক প্রিয় মুখ ছড়াশিল্পী আপ্তাব আহমদ

সুইট। চা পর্ব এবং আসর নামাজ সারা হলো নাজিমের বাড়িতে। নাজিমের পরলোকগত বাবার কবর যিয়ারত করে চলে গেলাম তালিমপুর। দুপুরে খাবার কথা বিলেত প্রবাসি প্রিয় আবদুল জব্বার'র বাড়িতে। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা আসন্ন। খাওয়া শুরু হলো। বিশাল টেবিল জুড়ে সাজানো হরেকপদের খাবার। জব্বারের মমতাময়ী বৃদ্ধা মা পাশে বসে তাঁর ছেলে এবং নাতিদের নির্দেশনা দিয়ে চলেছেন- এটা দাও, ওটা দাও। মাগরিবের আযান অবদি খাওয়া চললো। মাগরিবের নামায আদায় করে অল্প সময় বসে যাত্রা শুরু হলো তালিমপুর বড় মসজিদের পাশে বিশাল কবরস্থানের পথে।এখানে শায়িত আছেন প্রিয় জব্বারের শ্রদ্ধেয় বাবা। তাঁর কবর যিয়ারত করলাম। পূর্ব থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষারত মসজিদের ইমাম, প্রিয় বাকের'র বাবা এবং অন্যান্য কয়েকজনের সাথে কথা হলো।



এবার আমাদের গন্তব্য সুজানগর। পথে হাকালুকি হাওর পাড়ের কানুনগড় বাজারে থামতে হলো। উপলক্ষটা চমৎকার। একজন কবির সাথে নাজিম দেখা করাবেন। দেখা হলো পেশায় শিক্ষক তরুণ কবি মৃনালকান্তি দাস'র সাথে। চা পর্ব শেষে কবি মৃনালকান্তি দাস কিছুদিন

আগে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগ্রন্থ *যুদ্ধ এবার শুদ্ধ হবার* তুলে দিলেন। কবির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম।



এবার শুজানগর পৌঁছলাম। ইচ্ছে ছিলো আগর ফ্যাক্টরি দেখবো। রাত হয়ে যাওয়ায় তা আর হলো না। তবে একেবারে নিরাশ হতে হয়নি। যে বাড়িতে গেলাম সেখানে ছোটখাটো ফ্যাক্টরি। বাড়ির মালিক ঘুরে ঘুরে দেখালেন। একজন মুরব্বির সাথে দেখা হলো। তিনি আব্বার কাছে ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে দারুল কিরাতে পড়েছেন। ১৯৭০ সালে আব্বার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। সে সময়ের কিছু স্মৃতিচারণ করলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে দাসের বাজারে নাজিম ও সুইটকে ছেড়ে আমরা বিয়ানীবাজার হয়ে সিলেটের পথে রওয়ানা দিলাম।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ শুক্রবার, বড়লেখা থেকে ফেরার পথে বিয়ানীবাজার সুপাতলা গ্রামে নানীর কবর যিয়ারতে যাই। কয়েক মাস হলো নানী আমাদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। প্রসঙ্গত: বিগত রামাদান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আব্বা অসুস্থ হয়ে ওয়েসিস হাসপাতালে চিকিত্সাধীন ছিলেন। তখন দেশে গিয়েছিলাম। একদিন গেলাম অসুস্থ নানীকে দেখতে। তখন নানীর অবস্থা দিনকে দিন অবনতি হচ্ছে। সব সময় আসপাশের লোকজন চিনতে পারেন না। আমি পাশে বসলাম। ছোট মামী জিজ্ঞেস করলেন, চিনতে পারছেন কে এসেছে?

- *কিতা মাতো গো, আমার অত মায়ার নাত্তি চিনতাম না খেনে*। (কি যে বলো, আমার এতো আদরের নাতি চিনবো না কেন?)

নানীর জবাবে ধুক করে উঠেছিলো আমার বুক। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। নানী রোযা রাখতে পারছেন না বলে আফসুস করছিলেন বারবার। সেদিন যতক্ষণ বসেছিলাম নানী একটু পরপর আমার মাথা, বুক ও গালে মায়াবী হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। কেন জানি সেদিন মনে হয়েছিলো এটিই নানীকে আমার শেষ দেখা। হলও তাই।

নানীর যিয়ারত শেষে বিয়ানীবাজার তাফসীরুল কুরআন পরিষদের অফিসে কিছু সময় বসতে হলো। তাফসীরুল কুরআন পরিষদের অন্যতম কর্ণধার ছোট মামা মাওলানা লুৎফুর রাহমানসহ অন্যান্য কয়েকজনের সাথে জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিল সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা হলো। চা পর্ব শেষে রাত প্রায় দশটায় সিলেটের পথে রওয়ানা হলাম।

রাতে অবস্থান করার কথা ছড়াশিল্পী এজেএম শিহাব'র বাসায়। সেখানেই গেলাম আমরা। ঢাকা থেকে রাতে সর্বশেষ ছেড়ে আসা গ্রীনলাইনের বাসে ড. আহমদ আনিসুর রহমান আসছেন। হুমায়ূন রশীদ চত্তরে ফজরের সাথে সাথে তাঁকে রিসিভ করার কথা। যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। বাস প্রায় ঘণ্টাখানেক বিলম্বে পৌঁছলো। বলে রাখা ভালো, প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান ক্ষণজন্মা এক বিরল প্রতিভা। তিনি আমাদের জকিগনজের মানুষ। খুব সম্ভব ১৯৭৫/৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সে সময়ই উচ্চতর পড়াশুনার জন্যে অষ্ট্রেলিয়া পাড়ি জমিয়েছিলেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ণ- অধ্যাপনা করেছেন। আক্ষরিক অর্থেই ক্ষণজন্মা এক মানুষ তিনি। তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থ ইংলিশ এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত। জকিগনজের বর্তমান প্রজন্মের কাছে অপরিচিতপ্রায় এই গুণী মানুষের সাথে সৌভাগ্যক্রমে বিগত প্রায় কুড়ি বছর ধরে জানাশুনা- যোগাযোগ আছে। পরিচয়সূত্র আরেক গুণী মানুষ শ্রদ্ধেয় কবি কালাম আজাদ।



ড. আহমদ আনিসুর রহমানকে নিয়ে সোজা রারাই। উনি আব্বার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাতে চান। কয়েক বছর আগে তিনি আমাদের বাড়িতে দিন দুয়েক অবস্থান করে আব্বার কাছে বুখারী শরীফ আংশিক পড়ে সনদ গ্রহণ করেছেন। এবার তাঁর আসার কথা আব্বাকে পূর্ব থেকেই জানানো ছিলো। তাই দীর্ঘ সময় দিলেন তাঁকে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মতে বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আমরা বাড়ি থেকে বের হলাম। প্রথম গন্তব্য গঙ্গাজল। সেখানে শাহ শাহাবুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ'র যিয়ারত করলাম। কোন কোন গবেষকের মতে ইনি হযরত শাহ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গীয় তিনশ ষাট আউলিয়ার একজন। সেখান থেকে ড. আহমদ আনিসুর রহমান গেলেন গঙ্গাজল গ্রামে তাঁর দাদা পীর আবদুস সামাদ রাহিমাহুল্লাহ'র যিয়ারতে। মাগরিবের ঘণ্টাখানেক পর ফুলতলীর পথে রওয়ানা হলাম। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহিমাহুল্লাহর যিয়ারত শেষে আমাদের গন্তব্য সিলেট শহর। শ্রদ্ধেয় কবি কালাম আজাদ'র বাসায় পূর্ব থেকে অপেক্ষমান ছিলেন কবি মুকুল চৌধুরী ও যিননুরাইন চৌধুরী প্রমুখ। এখানে খাওয়া শেষে রাত এগারোটার পর দরগা শরীফ যিয়ারত করে ড. আহমদ আনিসুর রহমানকে কুমিল্লার পথে বিদায় দিলাম। পরদিন কুমিল্লায় একটি সেমিনারে মুখ্য আলোচক তিনি।

৫ জানুয়ারি দেশ থেকে ফিরে আসি। কেনো জানি সিদ্ধান্ত নিই এবার দেশে অবস্থানকালীন সময়ের বিভিন্ন বিষয় লিখবো। দুই কিস্তি লিখেও ফেলি। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। কারণ এই লেখার উপযোগিতা বা প্রয়োজনিয়তা নিয়ে আমি সন্দিহান। কেন জানি মনে হতে থাকে লেখাটি আত্মপ্রচারের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং এখানেই লেখা বন্ধ। এরই মাঝে কিছু শুভাকাংখি ম্যাসেঞ্জারে, আর বেশি সংখ্যক টেলিফোনে জোরালোভাবে তাগিদ দিতে শুরু করলেন লেখাটি যেনো চালিয়ে যাই। মূলত: তাঁদের আন্তরিকতার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়েই আবার লেখতে শুরু করি।

দিন তারিখের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করেই লিখতে হবে। শুরু করা যাক তাহলে।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ফুস্কা বা টক জাতিয় মুখরুচক খাবারের প্রতি আমার আমার দুর্বলতা পুরণো। তাই এখনো দেশে গেলে সময় সুযোগে দাঁড়িয়ে যাই।

এবারও দুইদিন খেয়েছি। প্রথম দিন সাথী ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ লাল ভাই। দ্বিতীয় দিন ছড়াশিল্পী এজেএম শিহাব। প্রথম দিনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বয়ান করতে চাই। যদিও এটি অভিনব বা কারো অজানা এমন নয়। সিলেট শহরের জিন্দাবাজার সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখার সন্মুখভাগের ফুটপাত ঘেসে একজন আচার বিক্রেতা দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ভ্রাম্যমান দোকানের খদ্দের আমরা দুজন। পাঁচমিশালী আচার খেতে খেতে দোকানী সিরাজ মিয়ার সাথে আলাপচারিতা শুরু হলো। অনেক কথাই জানা গেলো তাঁর কাছ থেকে। ঠিক উত্তরপাশেই যুব বয়সের একজন ভিক্ষুক উচ্চ স্বরে একই তালে *ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ* বলে চলেছে। সামনে একটি থালায় কিছু টাকা ছড়িয়ে আছে। সিরাজ মিয়া জানালেন, শহরতলিতে এই ভিক্ষুকের নিজস্ব বাড়ি আছে। আছে অনেক সহায় সম্পদ। লোকটি পেটের দায়ে ভিক্ষা করছে না। এটি তার পেশা। প্রসঙ্গক্রমে সিরাজ মিয়া সিলেট শহরে এ পেশায় নিয়োজিতদের সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন। কিভাবে একটি প্রভাশালীচক্র এ কদর্য পেশাকে নিয়ন্ত্রণ করে কোটি

কোটি টাকার মালিক বনে যাচ্ছে তাও জানা হলো। বিষয়টি কমবেশি সবার জানা। আমার জন্যও নতুন নয়। তবু জানা বিষয় নতুন করে জানা ও দেখার সুযোগ পেলাম।

২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আল হাবীব ফাউণ্ডেশন'র আয়োজনে *ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইলমে হাদীস* শীর্ষক গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠান ছিলো। থানাবাজার হাবিবিয়া হিফযুল কুরআন মাদরাসা হলে পূর্ব নির্ধারিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন আল হাবীব ফাউণ্ডেশন'র প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম। মো. জিল্লুর রাহমান'র সাবলিল উপস্থাপনায় হাফিয আবদুল হালীম জুনেদ'র



তিলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত অনুষ্ঠানে গ্রন্থের লেখক হিসেবে সূচনা বক্তব্য রাখি। গ্রন্থপাঠে অংশ নেয় যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, প্রাবন্ধিক ও অনলাইন এক্টিভিস্ট মিফতাহুল ইসলাম তালহা। দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার দুই কৃতি ছাত্র হাফিয নিয়াজ উদ্দিন ও আবু সাদাত মুহাম্মাদ আফহাম। (বর্তমানে দু'জনই মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত।) বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসার ছাত্র হাফিয শামসুদ্দিন সাবেল। অনুষ্ঠানের মধ্যখানে চা বিরতির সময় সঙ্গীত পরিবেশন করে হাবীবিয়া শিল্পীগোষ্ঠি। উদিয়মান সঙ্গীত শিল্পী রেদওয়ান মাহমুদ চৌধুরী ও তাঁর সহযোগিদের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত না'ত'র মনোমুগ্ধকর সুরে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। গ্রন্থপাঠ শেষে আলোচনায় অংশ নেন মিয়ারবাজার মাদরাসার ভাইস

প্রিন্সিপাল প্রখ্যাত ছড়াশিল্পী মাওলানা পিয়ার মাহমুদ, ডা. তফজ্জুল আলী বালিকা দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা মুহিবুর রাহমান, জকিগনজ লেখক পরিষদ'র সহসভাপতি, অনলাইন নিউজপোর্টাল জকিগনজ ভিউ সম্পাদক মাওলানা ফদ্বলুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক কৃতিছাত্র আবদুল্লাহ যোবায়ের। শেষ পর্যায়ে আব্বা অনুষ্ঠানে আসেন। আহলে হাদীস নামধারী মাযহাব বিরোধিদের বহুমূখি ফিতনা মুকাবেলায় দিক নির্দেশনামূলক সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলে শেষ দোয়া করেন।

প্রসঙ্গক্রমে, আবদুল্লাহ যোবায়ের'র সাথে এই আমার প্রথম দেখা। লেখালেখির সুবাদে তাঁর সাথে পরিচয় ও যোগাযোগ আগে থেকেই। তাঁর বাবা প্রফেসর ড. এবিএম সিদ্দিকুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ বাংলাদেশের জ্ঞানাকাশে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র ছিলেন। ২০০৬ সালে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। প্রকাশিত অপ্রকাশিত (বাংলা ও আরবি) অর্ধশতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রেখে গেছেন। কীর্তিমান বাবার সন্তান আবদুল্লাহ যোবায়ের ইতোমধ্যে একজন সফল অনুবাদক হিসেবে নিজের অবস্থান জানান দিতে সক্ষম হয়েছেন। এখন থেকে নয় শতাধিক বছর পূর্বে ইমাম আবুল কাসিম আল কুশাইরী (৩৪৬-৪৬৫ হিজরি) রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আরবি ভাষায় রচিত হয়েছিলো *আররিসালাতুল কুশাইরিয়্যা*। ইলমে তাসাউফর বুনিয়াদি এ গ্রন্থখানি আবদুল্লাহ যোবায়ের বাংলা অনুবাদ করেছেন। অনুদিত গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন অনুবাদকের শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ। দেশের খ্যাতিমান প্রকাশনী ঐতিহ্য মূল্যবান এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষাভাষী যে সকল মানুষ ইলমে তাসাউফকে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ইসলাম বহির্ভূত মনে করেন, অপর দিকে যারা তাসাউফকে ইসলামের অনুসঙ্গ মনে করেন এবং সূফিয়ায়ে কিরাম প্রবর্তিত বিভিন্ন তরীকার অনুসরণ করেন উভয় পক্ষের জন্য এ গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা ছিলো ভিন্ন মাত্রার একটি

অনুষ্ঠান। সাধারণত: নতুন প্রকাশিত কোন বই'র প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়। আমাদের এ অনুষ্ঠান সে রকম ছিলো না। *ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইলমে হাদীস* বইটি প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১১। পরিমার্জিত দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৭ সালের মে মাসে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলো শতাধিক। পরীক্ষামূলক নতুন ধারার অনুষ্ঠানে উপস্থিতি আমাদের জন্য আশাপ্রদ। যারা অংশ নিয়েছেন সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

যারা সেদিন পাঠ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উপজেলা আল ইসলাহ'র বর্তমান সহসভাপতি, কাজলসার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুর রশীদ বাহাদুর। ভুল বশত: গত কিস্তির লেখায় তাঁর নাম উল্লেখ করিনি। উপস্থিত ছিলেন ইছামতি কামিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুল খালিক, গাজিরমোকাম দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুল মালিক, ফুলতলী কামিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা হারুণ রশীদ, পূর্ব রেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাওলানা আহমদ আল কবির চৌধুরী, সাজ্জাদ মজুমদার উচ্চ বিদ্যলয়ের শিক্ষক মাওলানা আবদুশ শহীদ তাপাদার ও মাস্টার গিয়াস উদ্দিন, উপজেলা আল ইসলাহ সেক্রেটারী কাজী বজলুর রশীদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সচিব কবি মহিউদ্দিন হায়দার, উপজেলা তালামীযে ইসলামিয়ার সেক্রেটারী আহমদ আল মনজুর, লতিফিয়া সাংস্কৃতিক ফোরাম'র সভাপতি সরওয়ার হোসেন চৌধুরী রাজা, সাধারণ সম্পাদ আহমদ হোসাইন আইমান, জকিগনজ লেখক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছড়াশিল্পী এজেএম শিহাব, সহসম্পাদক ছড়াশিল্পী- গল্পকার মাহবুবুর রহীম, আলোর প্রহর সম্পাদক মাওলানা কয়েস মাহমুদ চৌধুরী সিপার, জকিগনজ প্রেসক্লাব যুগ্মসম্পাদক রহমত আলী হেলালী, সাহিত্যকর্মী ডা. হাবীবুল্লাহ মিসবাহ, কবি এম এ ফাত্তাহ, কবি মিছবাহ আজাদ, ছড়াশিল্পী আহমদ সিদ্দীক চৌধুরী হাছান, সাপ্তাহিক সবুজপ্রান্ত সম্পাদক জুবায়ের আহমদ, প্রবাসী জকিগনজবাসির সংগঠন জকিগনজ এসোসিয়েশন সভাপতি মাওলানা আবদুল বাছিত চৌধুরী প্রমূখ।

২২ ডিসেম্বর শুক্রবার *আররিসালাতুল কুশাইরিয়্যা* অনুবাদক আবদুল্লাহ

যোবায়ের ও তাঁর বন্ধু সাহিত্যকর্মী ইয়াসির আরাফাতসহ প্রথমে যাই সূফি কবি শিতালং শাহ রাহিমাহুল্লাহ'র (১৮০০-১৮৯৯) মাযার যিয়ারতে।

সিলেট ও কাছাড় অঞ্চলে মরমী ধারার সাহিত্য চর্চায় অনন্য এক প্রতিভা শিতালং শাহ। তাঁর নাম মাওলানা সলিমউল্লাহ। শিতালং ছিলো মুরশিদ প্রদত্ব তখল্লুস। তিনি সিলেটী নাগরী ভাষায় লেখা তিনটি পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন। সেগুলো হলো- মশকিল তরান, কিয়ামত নামা ও রাগ বাউল। তাঁর রচনা ছিলো ধর্মীয়- আধ্যাত্মিক চেতনায় শানিত। যেমন-

ধুড়িলে বন্ধুরে পাইবায়
আছইন বন্ধু ছিরিপুর
আগে চিনো মুহাম্মদী নূর ॥
কিংবা
অনেক লোকেতে করে মযব ইনকার
শফাআত না পাইবে তারা নবী মস্তফার ॥
ইত্যাদি।

সেখান থেকে আমরা যাই সুরমা- কুশিয়ারা নদীর উৎসমুখে। ভারত থেকে বয়ে আসা বরাক নদী জকিগনজ উপজেলার বারঠাকুরী ইউনিয়নের ওলিগড় গ্রামে এসে সুরমা ও কুশিয়ারা নাম ধারণ করে



বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করেছে (গ্রামটি এখন নদীগর্ভে বিলীন)। স্থানীয়ভাবে তিগাঙ্গার মুখ খ্যাত এ স্থানটির নয়ন জুড়ানো দৃশ্য সতত কাছে টানে। এক সময় এ স্থান ছিলো আমাদের বৈকালিক আড্ডার আদর্শ জায়গা। আমাদের মধ্যে যাদের ছড়া- কবিতা চর্চার বাতিক ছিলো তাদের নোটবুকে পাতায় কত ছড়া - কবিতার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে স্থানটি। দেশে গেলে প্রতিবারই কোন না কোন বাহানায় সেখানে যাই। যেতে হয়।

জুমুআর নামাযের সময় আসন্ন। এবার আমরা সোজা চলে যাই ফুলতলীতে। ছাহেব বাড়ির মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করি। নামায শেষে ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যিয়ারত করি। ঘুরে ঘুরে দেখি ফুলতলী কামিল মাদরাসা, এতিমখানা, খানকা বিল্ডিং ইত্যাদি।





এবার গন্তব্য সিলেট শহর। শহরে পৌঁছলে আমাদের সাথে যোগ দিলো এজেএম শিহাব। দরগা শরীফ যিয়ারত শেষে ঢাকার মেহমানদের বাসের টিকেট সংগ্রহ করা হলো। বাস ছাড়বে রাত বারোটায়। তখন বাজে আটটা। চলে গেলাম কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। সেখানে একটি অনুষ্ঠান ছিলো। আগে জানতাম না। কারতালীয়ভাবে দেখা গেলো কবি বাছিত ইবনে হাবীব, গল্পকার সেলিম আউয়ালসহ অনেকের সাথে। বাছিত ভাই প্রস্তাব করলেন চলুন দেখা করে আসি কবি আল মুজাহিদীর সাথে। অনুষ্ঠান শেষে কবি অবস্থান করছেন হোটেল হলি ভিউ'তে। চলে গেলাম সেখানে। বহু বছর পর কবি আল মুজাহিদীর সাথে দেখা। রাতের খাবারের জন্য কবি অন্যত্র যাবেন।তারপরও আমাদেরে সময় দিলেন। কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ আলাপ হলো বাছিত ভাই, সেলিম আউয়াল ভাই প্রমূখের সাথে।

ঢাকার মেহমানদের বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে গেলাম শিহাব'র বাসায়। [অসম্পূর্ণ]



ভাঙছে আমার গ্রাম

৩ জানুয়ারি ২০১৮ অপরাহ্ন আড়াইটার দিকে সাহিত্য ও সমাজকর্মী হাবীবুল্লাহ মিসবাহ ফোন দিয়ে জানালেন, চ্যানেল আই'র সিলেট প্রতিনিধি কুশিয়ারা নদীর সাম্প্রতিক ভাঙন নিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন করতে আসছেন। তাঁদের সঙ্গ দিতে পারলে ভালো হয়। দেশ থেকে ফিরে আসার ঠিক আগের দিন। চরম ব্যস্থতা সত্বেও নিজ গ্রামের প্রতি দায়বোধ থেকেই তাঁদের সময় দিলাম। সাম্প্রতিক কুশিয়ারা নদী ভাঙ্গনের শিকার রারাই গ্রামের ভুক্তভোগি মানুষের পক্ষ থেকে আমার কিছু কথা তাঁরা ধারণ করলেন। জানিনা সে প্রতিবেদন সম্প্রচারিত হয়েছে কি না। হলেও কবে হয়েছে, কতটুকু হয়েছে।

কুশিয়ারা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনের ফলে দ্রুত বদলে যাচ্ছে দেশের মানচিত্র। রারাই গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে চলা কুশিয়ারা ইতোমধ্যে একরের পর একর কৃষি জমি কেঁড়ে নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বসতভিটা ভাঙ্গতে শুরু করেছে। রোজ রোজ দর্শনার্থি যাচ্ছেন। নেতা, উপনেতা- পাতি নেতারা যাচ্ছেন। ছবি তুলছেন, সংবাদ শিরোণাম হচ্ছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। রারাই গ্রামবাসির আতংকের প্রহর বিলম্বিত হচ্ছে কেবলই। মানিকপুর ও শষ্যকুড়ি গ্রামের দৃশ্যপটও একই। আমাদের যেনো দেখার কেউ নেই। আমরা রাজনৈতিক অভিভাবক শুন্যতায় ভোগছি।

স্থানীয় সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে জানলাম, সম্প্রতি জকিগনজের পল্লীশ্রী হাইস্কুলে এসেছিলেন অর্থপ্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান (বর্তমান পরিকল্পনা মন্ত্রী)। উপজেলা অডিটরিয়ামে তাঁর সামনে এক বক্তব্যে জনাবা রওশন এরশাদ মনোনীত এবং জনাবা শেখ হাসিনা সমর্থিত জকিগনজ-কানাইঘাটের সাংসদ সেলিম উদ্দিন বলেছেন- তিনি নাকি কুশিয়ারা নদীর ভাঙন সম্পর্কে মহান জাতীয় সংসদে বহুবার কথা তুলেছেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ গুরুত্বের সাথে শুনতে চায় না। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে সামনে রেখে এমপি মহোদয় প্রদত্ত বক্তব্যের অর্থ কী

দাঁড়ালো? এই এলাকার মানুষ চরমভাবে রাজনৈতিক অভিভাবকহীনতায় ভোগছে। সাবেক এমপি জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার (বর্তমানেও এমপি), সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মাসুক উদ্দিন আহমদ এবং আগামী দিনে এই এলাকারর মানুষের ভোট প্রত্যাশি জনাব ড. আহমদ আল কবির প্রমূখদের কি কোন করণীয় নেই? আপনাদের হাতে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও যদি এই এলাকার মানুষের পাশে না দাঁড়ান তবে আগামী দিনে এই হতভাগ্য মানুষদের কাছে ভোট চাইতে আপনাদের লজ্জা করবে না?

৮ জানুয়ারি ২০১৮





পুনশ্চ : পরবর্তীতে শুনেছি সরকারিভাবে আমাদের গ্রামের পাশে কুশিয়ারা নদী ভাঙন রোধে কিছু কাজ শুরু হয়েছে।



সংসার ঃ তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

ভ্রমণ ঃ সৌদিআরব, জর্দান, কুয়েত, আরব আমিরাত, সিরিয়া, মরক্কো, তুরস্ক, ফ্রান্স, মিশর ও ইন্ডিয়া।

অন্যান্য গ্রন্থ

১. লুকমান হাকীমের উপদেশ
২. কুরআন হাদীসের আলোকে শবেবরাত
৩. ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইলমে হাদীস
৪. সীরাতে হাবীবে খোদা (অনুবাদ)
৫. বারাকাতে মুস্তাফা (অনুবাদ)
৬. আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎকার (যৌথ)
৭. জকিগন্জ মনীষা (যৌথ সম্পাদনা)
৮. কষ্টে কাটে অষ্ট প্রহর (কবিতা)

প্রকাশিতব্য

১. হায়াতুস সালিহীন, প্রথম খণ্ড
২. জকিগন্জ: শতবছরের মনন চর্চা
৩. সূফি কবি শাহ শিতালং ও তাঁর মশকিল তরাণ
৪. খারিজী মতবাদ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

প্রচ্ছদ : দীনার মিনহাজ
আলোকচিত্র : নাবীলা আল হাবীব





Al Habib Foundation

www.alhabibfoundation.com

ISBN 978-984-34-7450-6

